আলোলিকা মুখোপাধ্যায়

আরোহন

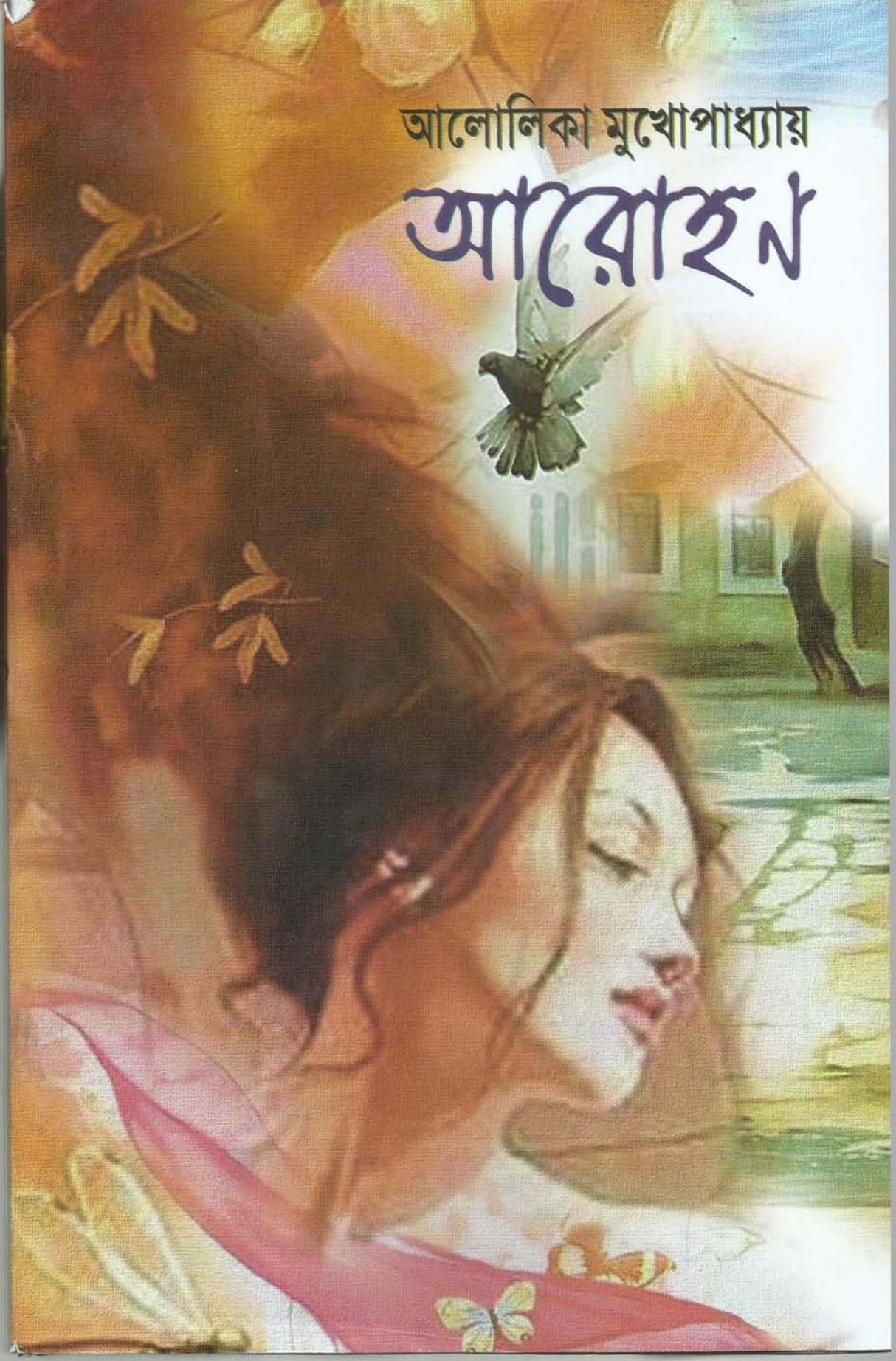

দীর্ঘকাল আমেরিকা প্রবাসী আলোলিকা মুখোপাধ্যায়ের লেখালেখির সূচনা কলকাতার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্বে। "বসুমতী" ও "কৃত্তিবাস"-এ কবিতা লিখেছেন। আমেরিকায় নিউজার্সির প্রথম বাংলা পত্রিকা "কল্লোল"-এর সম্পাদনা করেছেন দশ বছর। পরবর্তী সময়ে নিয়মিত লিখেছেন স্থানীয় পত্রিকা "অত-লান্তিক" ও "আন্তরিক"-এ। '৮২ সালে পেশাদারী লেখার শুরু কোলকাতার সাপ্তাহিক পত্রিকা "পরিবর্তন"-এর মার্কিন করেস-পন্ডেন্ট হিসাবে। আট বছর "প্রবাসীর চিঠি"-র কলাম লিখেছেন। সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক 'দেশ' এবং 'আনন্দমেলায়' গল্প লিখেছেন। কলকাতার "বর্তমান" পত্রিকায় যোগ দেন '৯১ সালে। গত আঠার বছর ধরে "সাপ্তাহিক বর্তমান"-এ "প্রবাসের চিঠি"র কলাম লিখেছেন। শারদীয়া বর্তমানে বড় গল্প লিখেছেন। প্রকাশিত গল্প সংকলনগুলির নাম "পরবাস", "এই জীবনের সত্য" ও "মেঘবালিকার জন্য"। ইতিমধ্যে "প্রবাসীর চিঠি"র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। আমেরিকার বাংলা ও ইংরেজি ওয়েব ম্যাগাজিন "উড়াল পুল"-এ গল্প ও রম্যরচনা লিখেছেন। বাংলা সংস্কৃতির প্রসার ও প্রচারের জন্য নিউইয়র্কের "বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘ" থেকে ডিস্‌টিংগুইশড্ সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। কলকাতা বইমেলায় প্রবাসী লেখিকা হিসাবে পেয়েছেন "উৎসব" পুরস্কার। দীর্ঘ প্রবাস জীবনে সংসার ও লেখালেখি ছাড়াও নিউ জার্সির সাংস্কৃতিক সংগঠন "কল্লোলের" স্থাপক সদস্য হিসাবে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। বাঙালী দ্বিতীয় প্রজন্মের জন্যে বাংলা গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য পরিচালনা এবং স্থানীয় নাট্যগোষ্ঠীর নাটকে নিয়মিত অভিনয় করেছেন। আলোলিকা ভৌগলিক অর্থে মাতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে যোগসূত্র হারাতে চাননি।

আরোহণ

আলোলিকা মুখোপাধ্যায়

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

AROHANN

by : Alolika Mukhopadhyay

Code No : N72 A26

নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রা. লি. ৬৮ কলেজ স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০৭৩
থেকে শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত
১১ ঝামাপুকুর লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে পি. পি. গ্রাফিক্স কর্তৃক বর্ণসংস্থাপিত
নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রা. লি. কলকাতা ৭০০ ০৭৩ থেকে শ্রীবরুণচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত
প্রথম সংস্করণঃ বইমেলা, জানুয়ারি ২০১১

© প্রকাশক

প্রচ্ছদ ঃ ইন্দ্রনীল ঘোষ

মূল্য ঃ একশো পঁচাত্তর টাকা

উপহার

স্নেহের সোনালী, আশীষ, সুদীপ্ত ও মিঠুকে

ভূমিকা

সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের জন্যে, ভাষার প্রতি ভালোবাসার জন্যে প্রবাসী বাঙালি সমঅনুভবের একত্মতায় আপন বৃত্ত রচনা করে। পেশার জগতে, মিশ্র সামাজিক পরিবেশে, প্রজন্মগত দূরত্ব হেতু পারিবারিক ভূমিকার বিবর্তনে সে আন্তর্জাতিক। শুধু তার আপন গোষ্ঠী সামাজিক বৃত্তে দেশজ অনুভূতির পরিমণ্ডলে ভাষার স্বাচ্ছন্দ্যে সে পরবাসে নিজ ভূমি খোঁজে।

প্রবাসী বাঙালির সাহিত্যচর্চাও এক সময় ছিল সামাজিক বৃত্তকেন্দ্রিক। তবে গত দু দশকে তার পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। বাংলাদেশের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় আনিসুজ্জামানের ভাষায়—সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে প্রবাসী বাঙালির জীবনধারা একটা বিষয় হিসেবে দেখা দিচ্ছে। বাংলা কথা সাহিত্যে ও গদ্যে আগে যে কখনো প্রবাস জীবন ঠাঁই পায়নি তা নয়, কিন্তু সে জীবন অভিবাসের ছিল না। পরবাসীর জীবনই ছিল। এখন অভিবাসী জীবনের গভীরতা নিয়ে লেখার সংখ্যা যথেষ্ট। এদিক দিয়ে একটা নতুন বিষয় উন্মোচিত হয়েছে।

আমরা যারা বিদেশে নিজের ভাষায় কিছু লেখালেখি করি, তাদের জন্যে অনুপ্রাণিত হওয়ার মতো কথা। ষাটের দশক থেকে বাঙালির বিদেশ যাত্রা শুরু হয়েছিল। নতুন দেশে, অজানা পরিবেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা কঠিন জেনেও এঁরা উচ্চশিক্ষা আর সমৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষায় ভাগ্য অন্বেষণে এসেছিলেন। মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন নবাগত সেই সংখ্যালঘু সমাজের বিবর্তন, সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনার কাহিনী আমার লেখায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। অভিবাসী জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, অনুসঙ্গ আর কল্পনার ডানায় নির্ভর এই গল্পগুলি 'শারদীয় বর্তমান' ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। নিউ বেঙ্গল প্রেস এগুলি নির্বাচন করে বড় গল্প সংকলনের দায়িত্ব নিয়েছে। প্রকাশক শ্রী প্রবীরকুমার মজুমদারকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

ওয়েন, নিউ জার্সি

সূচীপত্র

- আরোহণ ১
- পাপপুণ্য ১[illegible]
- খোঁজ ৪৫
- অন্বেষা ৬৭
- আমেরিকায় সেজমেসো ৯৩
- দেখা ১০৫
- এ জন্মের ভূমিকার খোঁজে ১২৭
- অবসর ১৫১
- পূর্ণ অপূর্ণ ১৬১

আরোহণ

শেষ বিকেলের ম্লান আলোয় দূর থেকে বাড়িগুলো দেখে অনিশার মনে হল এখানে নয়। নিশ্চয়ই আরও কিছুটা যেতে হবে এই জীর্ণ শহর, চারপাশের বাড়িঘর, লোকজন, রাস্তার ধারে ড্যান্সিং-বারএর দরজায় বুকখোলা মেয়ের ছবি—এ সবই সে পার হয়ে যেতে চাইছিল। আশা করছিল একটু ভদ্র এলাকায় পোছে মিলটনদের বাড়িটা খুঁজে পাবে। ওর বন্ধু শ্যারণ গাড়ি চালাচ্ছে। ওয়াশিংটন থেকে ক্যাম্‌ডেনে আসতে তিনঘণ্টার ওপর লেগে গেল।

একটা বড় রাস্তার শেষ প্রান্তে কবরখানা। আর এগোনো যাবে না। ট্র্যাফিক লাইটে বাঁদিকে ঘুরতেই একটু পরে মাল্‌বেরি স্ট্রিট। শ্যারণ জিজ্ঞেস করল—"এই রাস্তাই তো? নম্বরটা কত?"

ঠিকানা লেখা কাগজ দেখে অনিশা বলল—"টোয়েন্টি সেভেন।" গাড়ির জানলা দিয়ে নম্বরটা খোঁজার চেষ্টা করল।

রাস্তার দু' পাশে গায়ে গায়ে লাগা রো-হাউসগুলোর সিঁড়িতে লোকজন বসে আছে। সামনে কাঠের ছোট্ট বারান্দায় টুপি মাথায় কালো বুড়ি। পেভমেন্টে ছোট ছোট বাইক নিয়ে কালো ছেলে মেয়েদের জটলা। সন্ধের মুখে বাড়ি ফেরার আগে একদল শেষবারের মতো হুটোপাটি সেরে নিচ্ছে। দুটো ছেলে গাড়িতে প্রচণ্ড জোরে গান চালিয়ে স্টিয়ারিং-এ তাল ঠুকতে ঠুকতে চলে গেল।

অনিশা তখনও ভাবছে হয়তো এখানে নয়। বাড়িটা আর একটু দূরে হবে। এই দীনহীন পরিবেশের বাইরে হবে। হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে শ্যারণ বলল—"ওই তো, বাঁদিকে টোয়েন্টি সেভেন। তুমি নেমে যাও। আমি পার্কিং খুঁজি।"

শ্যারণ কাছেই পার্কিং পেয়ে গেল। অনিশা অপেক্ষা করছিল। দুজনে একসঙ্গে সাতাশ নম্বরের দিকে এগোল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে বেল বাজানোর সময় অনিশা ঠিক বোতাম খুঁজে পাচ্ছিল না। মাথার ভেতর কিছু যেন কাজ করছে না। একটা সংঘাতের মুখোমুখি এসে ভয় হচ্ছে। এতখানি পথ পার হয়ে এসে এই শেষ দরজাটাই দুলঙ্ঘ্য মনে হচ্ছে। অথচ ঈশার ভয় হয়নি। আজন্মের স্মৃতি বিজড়িত ঘর ছেড়ে, সেই জীবনের নিরাপত্তা, স্বপ্ন, সংকল্প, সম্ভাবনাকে তুচ্ছ করে ঈশা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে।

মিলটন দরজা খুলে দিল। অনিশার সঙ্গে তার এই প্রথম দেখা। দুজনেই দুজনকে যেন জরিপ করার ভঙ্গিতে এক ঝলক দেখে নিল। পরমুহূর্তেই সহজ হওয়ার চেষ্টা করে কালো ছেলেটি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল—"আমি মিলটন। মিলটন উইলিয়াম্‌স। তোমরা ভেতরে এসো।"

অনিশা হাত বাড়াল না। প্রায় স্বগতোক্তির মতো শোনাল তার কণ্ঠস্বর—"আমি অনিশা। ঈশার বড় বোন।"

মিলটন ওদের ছোট একটা ঘরে এনে বসাল। ফুল ফুল ছাপ দেওয়া মস্ত সোফায় বসতে গিয়ে শ্যারণ প্রায় তলিয়ে গেল। স্প্রিংটা একেবারেই গেছে। মিলটন রসিকতার চেষ্টা করল—"আমার ল্যাণ্ডলেডির জিনিস। ফার্নিশড অ্যাপার্টমেন্ট বলে কাগজে অ্যাড দিয়েছিল। ফেলে দেবার উপায় নেই। এ বাড়ি ছেড়ে দিলে সোফা শুদ্ধ ফেরত চাইবে।"

মিলটনের হাসিতে শ্যারণ যোগ দিল। অনিশার কিছু ভালো লাগছিল না। ভেতরে ভেতরে রাগ, দুঃখ, অভিমানে কী যে যন্ত্রণা ভোগ করছে, একমাত্র মা, বাবা ছাড়া কেউ বুঝবে না। শুধু নিজের নয়, বাবা, মার মনোকষ্টই তাকে আরও অশান্তি দিচ্ছে। আর সমস্ত কিছুর জন্যে যে দায়ী সেই ঈশা এখনও তার সামনে আসছে না। কেন? মিলটনকে ওরা মেনে নিতে পারছে না বলে?

মিলটন ওদের কোক কিংবা কফি দেবে কিনা জিজ্ঞেস করায় অনিশা জানতে চাইল—"ঈশা কোথায়? আমরা এসেছি জানে না?"

মিলটন মাথা নাড়ল—"না। ও চান করছে। তোমাদের দেরি হচ্ছে দেখে একটু আগে বাথরুমে গেল। আমি বলে আসছি।"

কোকের ট্রে নিয়ে ফিরে এসে মিলটন আবার কথা শুরু করল—"আসার সময় খুব ট্র্যাফিক ছিল?" শ্যারণ উত্তর দিল—"মোটামুটি। শুক্রবারের বিকেলে ওয়াশিংটন থেকে আসা। তাও অফিস থেকে বেশ আগেই উঠেছিলাম।"

মিলটন বুঝতে পারছিল অনিশা ওর সঙ্গে তেমন কথাবার্তা বলতে চাইছে না। শুধু ঈশার জন্যে দেড়শো-দুশো মাইল গাড়ি চালিয়ে এই অচেনা শহরে এসেছে। নইলে ওদের মতো গরিব কালোদের ওরা পছন্দই করে না। সত্যি বলতে কি একরকম ঘেন্নাই করে। রেসিয়াল হেট্রেড যে কতখানি, মিলটন অনেকবার অনেক ঘটনায় তা বুঝে গেছে। যেমন এ মুহূর্তে অনিশা তাকে নিঃশব্দে অপমান করছে। তার বাড়িতে এসে সামান্য দুটো ভদ্রতার কথা বলারও প্রয়োজন মনে করছে না। অথচ ঈশার ব্যাপারটা তো শুধু তার ইচ্ছেতেই ঘটেনি। ঈশা নিজে থেকে চলে এসেছে। অনিশার এই নিস্পৃহভাব, উপেক্ষার চেষ্টা মিলটনকে নতুন করে আঘাত করছিল। সে কিচেনে কফি বানানোর জন্যে উঠে গেল।

কাছাকাছি চেনা পারফিউমের গন্ধ। দরজার ফ্রেম জুড়ে ঈশা এসে দাঁড়িয়েছে। ভারী শরীর, ক্লান্ত দৃষ্টি। গায়ে ঢিলেঢালা মেটারনিটির পোশাক। অনিশার বিস্মিত, ব্যথাহত মুখের দিকে কয়েক পলক চেয়ে থেকে নিজেই তাকে জড়িয়ে ধরল।

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে অনিশা বলল—"কেমন আছ?" ঈশা লজ্জা পাওয়ার ভঙ্গিতে হাসল—"ঠিকই আছি। অ্যানি, খবরটা তোমাকে ফোনে জানাতে চাইনি সে জন্যে আসতে বলেছিলাম।"

অনিশা বুঝতে পারছিল সে হেরে যাচ্ছে। ঘটনাচক্রের কাছে আবারও সেই অসহায় আত্মসমর্পণ। ভেবেছিল ঈশা তাকে কোনও সমস্যায় পড়ে ডেকেছে। তার কাছে সাহায্য চাইছে। এই সময় ওকে যদি আর একবার বোঝানো যায়, কিছুটা এরকম ভেবে নিয়েই অনিশা এসেছিল। কিন্তু এখন আর সে সময় নেই। অনেক দেরি হয়ে গেছে।

শ্যারণ বোধহয় ভদ্রতা করেই ঈশাকে কনগ্র্যাচুলেট করল। যতই হোক মেয়েটা দুদিন পরে মা হতে চলেছে। দেখে শুনে চুপ করে থাকা যায় না। ঈশার সঙ্গে তার বাড়ির লোকের যেমনই সম্পর্ক হোক, শ্যারণের কাছে এই স্বাভাবিক ব্যবহারটুকু সে আশা করতে পারে।

ঈশা খুশি হল। দু-চার কথার পরে মিলটন কফি নিয়ে এল। ঘরের মধ্যে অসোয়াস্তির ভাবটা কেটে গেছে ভেবে ঈশার কাছাকাছি এসে বসল। বাইরে অন্ধকার হয়ে গেছে। দূরের আকাশে একরাশ উজ্জ্বল তারা। জানলা দিয়ে নীচের রাস্তাঘাট দেখতে দেখতে শ্যারণ বলল— "আমাদের কিন্তু এবার যেতে হবে। অ্যানিশা, তুমি বোনের সঙ্গে আর একটু থাকো। আমি গাড়িতে গিয়ে বসছি।"

শ্যারণ কী বলতে চাইল মিলটন ঠিকই বুঝেছে। ওদের দুই বোনকে একটু প্রাইভেসি দেওয়া দরকার। ঈশার নতুন খবরে ওর দিদি যে কোনও উচ্ছ্বাস দেখাচ্ছে না মিলটন তাতে অবাক হয়নি। এরকম যে হবে ও জানত। তাও ঈশা যখন বলল অ্যানিকে জানাতে চায়, মিলটন কিছু বলেনি। কিন্তু যা ভেবেছিল ঠিক তাই। অনিশার মুখে ক্ষোভ, দুঃখ, দুশ্চিন্তার কালো ছায়া। নিজের ঘরে বসে তার নিজেকেই বড় অবাঞ্ছিত মনে হল। মিলটন সিগারেট খাওয়ার জন্যে নীচে নেমে গেল।

ভাঙা সোফাটার একপ্রান্তে বসে ঈশা তার বড় বোনকে দেখছিল। একদম ডাক্তার ডাক্তার চেহারা হয়ে গেছে। মুখে মেক আপ নেই। চুল আরও ছোট করে ফেলেছে। চশমাটাও অন্যরকম। ঈশার সঙ্গে আগে যেটুকু বা চেহারার মিল ছিল, এখন যেন তাও লাগছে না। এরকমই হয়। জীবনযাত্রার ধারা চেহারা পালটে দেয়। কতদিন থেকে ওরা দু'বোনে দু'ভাবে চলেছে....।

অনিশাই কথা শুরু করল—" তোমার বেবি কবে হবে? কোন হসপিট্যালে?"

—"লিংকন হসপিটালে। অক্টোবরের মাঝামাঝি ডেট্ দিয়েছে। বারো থেকে কুড়ির মধ্যে।"

—"তাহলে আর ছ-সাত সপ্তাহ। এখনও কাজে যাচ্ছ তো?"

—"হ্যাঁ। দু' সপ্তাহ আগে থেকে ছুটি নেবো।"

—"শরীর ভাল আছে? ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া করছ?"

—"যতটা পারা যায়। মিলটন খুব টেক কেয়ার করছে।"

—"তোমরা কি এ বাড়িতেই থাকবে? জায়গাটা থাকার মতো নয় ঈশা!"

—"জানি। হয়তো মুভ করতে হবে। দেখা যাক।"

চলে আসার আগে ঈশা বলল—"তোমাদের খবর দিলে না। হস্‌পিটালে খুব ব্যস্ত থাকো জানি। তাই বেশি ফোন করি না। বাবা মা কেমন আছেন?"

অনিশা উত্তর দিল—"সেই রকমই। যেমন দেখে এসেছিলে। আমি আজকাল বেশি যাওয়ারও সময় পাই না। খারাপ লাগে।" এতক্ষণ পর্যন্ত যে প্রশ্নটা অনিশা করতে চায়নি, হঠাৎ মিলটনকেই সে কথা জিজ্ঞেস করল—" তোমরা কী বিয়ের কথা ভাবছ?"

মিলটন ঈশার দিকে তাকাল। তারপর মাথা নাড়ল— "না। এখনও ডিসিশন নিইনি।"

—"তাহলে হঠাৎ বাচ্চার ডিসিশন নিলে কেন? ঈশার কী বয়স? কলেজে গেল না। ওর ভবিষ্যৎই বা কী?" ক্ষোভে উত্তেজনায় অনিশার গলার স্বর কাঁপছিল।

মিলটন ধৈর্য হারাল—"এটা ডিসিশনের ব্যাপার নয়। ঘটনাটা ঘটে গেছে। ওকে অ্যাবরশনের কথা বলেছিলাম। রাজি হল না। আমি ওকে ফোর্স করতে পারি না।"

মিলটনের স্পষ্ট জবাবে অনিশা কেমন থিতিয়ে গেল। হয়তো আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল।

ঈশা তার একটা হাত নিজের পেটের ওপর রেখে অনাকাঙ্খিত ভাবী সন্তানকে স্পর্শ করল। অনুনয়ের মতো শোনাল তার কণ্ঠস্বর—"প্লিজ্। আর কোনো কথা বোলো না। আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও।"

ঈশার গলার স্বরে কী যে ছিল কথাগুলো অনিশার বুকে গিয়ে বাজল। সে যেন তার কুড়ি বছরের বোনের জীবনে এক অবিশ্রাম যুদ্ধের সংকেত শুনতে পেল। কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে বলল—"মাঝে হয়তো আর ছুটি পাবো না। লেবার শুরু হলে ফোন কোরো। হসপিটালে চলে আসব।"

সে রাতে ওরা আর ওয়াশিংটনে ফিরল না। ফিলাডেলফিয়ায় শ্যারণের মায়ের বাড়িতে থেকে গেল। অনিশা ইচ্ছে করেই মা, বাবাকে ফোন করল না। ঈশার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা এখনই ও জানাতে চায় না। শুধু শুধু অশান্তি বাড়িয়ে কী হবে? প্রায় একবছর হতে চলল ঈশা মিলটনের সঙ্গে আছে। এই আঘাতই ওঁদের মন ভেঙে দিয়েছে। এরপর ঈশার প্রেগ্‌নেন্সির কথা অনিশা কীভাবে জানাবে? যা বলার দেড়-দু'মাস পরে তো বলতেই হবে। ততদিন অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। অথচ অনিশা মাকে কোনো কথা না বলে পারে না। আজ ঈশার জন্যে তাকে কত কিছু লুকোতে হচ্ছে।

হাসপাতালে অনিশার রেসিডেন্সির প্রথম বছর চলছে। ছুটিছাটা বেশি নেই। উইক এন্ডে ও মাঝে মাঝে এত ক্লান্ত থাকে যে বেশি ড্রাইভ করতে ইচ্ছে করে না। ওয়াশিংটন থেকে ওদের বাড়ি প্রায় তিনঘণ্টার পথ। অনিশা একেক সময় ট্রেনেও চলে যায়। এবার গাড়ি নিয়ে যাবে ঠিক করল। শনিবারে কার্লটন দুর্গাপুজো। মা আগে থেকে তারিখটা বলে রেখেছিল। অনিশারা ছোটবেলা থেকে ওই পুজোতে যায়। বছরে একবার পুরোনো চেনাশোনা লোকেদের সঙ্গে দেখা হয়। অনিশার বাঙালি বন্ধুরা নানা জায়গা থেকে আসে। পুজোর দিনটা ও হাসপাতালে কাটাতে চায় না।

কিন্তু এবার মনে বড় উৎকণ্ঠা রয়েছে। ঈশার জন্যে নানা চিন্তা। মিলটনের সঙ্গে ওর সম্পর্কটা ঠিক বোঝা যায় না। বাচ্চা যে চায়নি সে তো একরকম বলেই দিল। এর পরে ঈশাকে সে কতটা সাপোর্ট দেবে কে জানে? ঈশা দোকানে কাজ করে। মিলটন হোটেল-ক্লার্ক। রোজগার যাই হোক, এত তাড়াতাড়ি বাচ্চা হবার মতো অবস্থা নয়। ঈশাকে কে বোঝাবে? নিজের জেদ নিয়ে আছে। ভালমন্দ বোঝার ক্ষমতাই যদি থাকত উনিশ বছর বয়সে কলেজ ছেড়ে দিত না। বাড়ির ওপর রাগ করে মিলটনের সঙ্গে মুভ্-আউট্ করে আসত না।

অনিশা ভাবে এ সময় ওর ঈশার পাশে দাঁড়ানো দরকার। ঈশা হয়তো কিছুই প্রত্যাশা করে না। তবু বড় বোন হিসেবে, ডাক্তার হিসেবে যতটুকু সাহায্য করা যায়। অনিশা সপ্তাহে কয়েকবার ফোন করে। মেইল করে ফলের বাস্কেট আর খাবার দাবার পাঠিয়ে দেয়। এবার পুজোর আগে বাড়ি যাওয়ার পথে ঈশার কাছে এল।

মাল্‌বেরি স্ট্রিটের সাতাশ নম্বরে ডোর-বেল বাজাতেই এক কালো বৃদ্ধা দরজা খুলে দিলেন। হেসে বললেন—"ভেতরে এসো। আমি রোজা জোন্‌স। মিলটনের গ্র্যান্ড মাদার।"

অনিশা দু'হাত ভর্তি জিনিস নিয়ে তখনও দরজায় দাঁড়িয়ে। একটু অবাক হয়ে গেছে। মাঝে আর একদিন এসেছিল। মিলটনের আত্মীয়স্বজন কাউকেই দেখেনি। আজ আবার দিদিমা কোথা থেকে এল?

রোজা ওর হাত থেকে একটা শপিং ব্যাগ নিয়ে দরজার পাশে রাখতে রাখতে বললেন—"পাঁচ মিনিট বোসো। কফি নয়তো সফ্‌ট ড্রিংক্স কিছু খাও। তারপর হসপিটালে যাবো।"

—"কেন? ঈশা কি হসপিটালে গেছে? সকালেই ফোনে কথা হল.....।"

রোজা মাথা নাড়লেন—'তখনও বুঝতে পারেনি। হঠাৎ ওয়াটার ব্রেক করে গেল। ডাক্তার বলল অ্যাডমিট করতে। ঈশা তোমাকে ফোন করেছিল। পেল না। ওরা চলে গেল। আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। একসঙ্গেই যাব।"

অনিশা উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করল—"কতদূরে হসপিটাল? আপনি চেনেন?"

—"মিনিট পনেরোর ড্রাইভ। এদিকের পুরনো মেডিকেল সেন্টার। মিলটনও ওখানে জন্মেছিল।"

অনিশা আর বসতে রাজি হল না। রোজাকে নিয়ে হসপিটালের পথে রওনা দিল। আগে ঈশার কাছে পৌঁছতে হবে। হয়তো ওর ব্যথা শুরু হয়ে গেছে। এ সময় নিজের লোক বলতে কেউ ওর পাশে নেই। মা নেই। বাবা নেই। মিলটনের সঙ্গেই বা কতদিনের সম্পর্ক? ভাবতে ভাবতে অনিশার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল। স্টিয়ারিং-এ এক হাত রেখে চশমা খুলে চোখ মুছল।

রোজা আশ্বস্ত করতে চাইলেন—"ভয়ের কী আছে? রোজ হাজার হাজার মেয়ের বাচ্চা হচ্ছে।"

অনিশা হঠাৎ রূঢ়ভাবে উত্তর দিল— "জানি। কিন্তু ঈশার পক্ষে সিচুয়েশনটা খুব আইডিয়্যাল নয়। শি ইজ্ নট্ ম্যাচিওরড এনাফ্..."

অনিশা কথা শেষ না করেই থেমে গেল। রোজা বুঝতে পারছিলেন মেয়েটি বেশ টেন্‌শনে আছে। ডাক্তার হোক, যাই হোক, নিজের ছোটবোনের ব্যাপার তো। আসলে পুরো পরিস্থিতিটাই যেন অন্যরকম। মিলটনকে এরা অ্যাকসেপ্ট করেনি। লিভ টুগেদার ব্যাপারটা রোজা নিজেও অপছন্দ করেন। কিন্তু মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কী? ঈশা মা হবে। তাতেও এরা বিরক্ত। আশ্চর্য! বাচ্চাকেও মেনে নেবে না?

রোজা জিজ্ঞেস করলেন—"তোমার বাবা, মা তো একবারও ফোন করলেন না? তাঁরা তো জানেন তুমি আজ ঈশার বাড়িতে আসছ?"

অনিশা মাথা নাড়ল—"না। ওঁদের জানিয়ে আসিনি। ঈশার ব্যাপারে ওঁরা কিছুই জানেন না।"

রোজা আশ্চর্য হলেন। এত গোপনতার কী আছে? এই মেয়েটিও কি মিলটনকে অপছন্দ করে? এরা সাদা আমেরিকান নয়। এদের বাবা, মায়েরা এদেশের লোকও নয়। লেখাপড়া আর পয়সার জোরে সমাজের ওপরতলায় থাকে। সেই অহমিকা হয়তো এর মধ্যেও আছে। তাই নিজে থেকে একটা কথাও বলছে না। তাঁর সঙ্গে প্রথম থেকেই দূরত্ব বজায় রাখছে। যাক! রোজার এখন আর অত মান অপমান বোধ নেই। চিরকাল এই তো দেখে আসছেন। ঘৃণা আর উপেক্ষা সহ্য করে জীবন কেটে গেল।

বুকের কাছে নিজের ঢাউস ব্যাগটা পুঁটলির মতো করে চেপে ধরে রোজা বসে রইলেন। মিলটনের জন্যে একটু খাবার দাবার নিয়ে যাচ্ছেন। আজ কতক্ষণ থাকতে হবে কে জানে? খানিকক্ষণ পরে অনিশাকে বললেন—'সামনের ট্রাফিক লাইট পার হলেই ডানদিকে

হসপিটাল। আমাকে সামনে নামিয়ে দিতে পারো। নয়তো তোমার সঙ্গে পার্কিং গ্যারেজে গিয়েও নামতে পারি।"

অনিশা ওঁকে সামনে নামিয়ে দিয়ে পার্কিং গ্যারেজে গাড়ি রেখে এল। লবিতে এসে দেখল রোজা সোফায় বসে আছেন। দুজনে মেটারনিটি ফ্লোরের এলিভেটরে ওঠার পর অনিশার খেয়াল হল বাড়িতে ফোন করা হয়নি। আজ দুপুরের মধ্যে ওর পৌঁছনোর কথা ছিল। তারপর পুজোয় যাওয়ার কথা। এদিকে কী যে ঘটে যাচ্ছে ওঁরা ভাবতেও পারছেন না। একটা খবর দেওয়া দরকার। নয়তো অনিশার দেরি দেখে বাবার চিন্তা শুরু হবে। ওয়াশিংটনে ফোন করেও তো পাবেন না। কিন্তু একবার ঈশাকে না দেখে অনিশা নীচে যাবে না। মাকে ফোন করার জন্যে হাতে এখনও সময় আছে।

ডেলিভারি রুমে ঈশা আচ্ছন্নের মতো শুয়ে আছে। ব্যথায় বিবর্ণ মুখ। লেবার ইনডিউস্ করার পর ক্রমশই যন্ত্রণা বাড়ছে। অনিশা কাছে গিয়ে মাথায় হাত রাখতে ঈশা যেন ঘোর থেকে জেগে উঠল।

অনিশার হাতখানা নিজের বুকের ওপর এনে ঈশা কাঁদছিল। তার যন্ত্রণাক্লিষ্ট অসহায় মুখের দিকে চেয়ে অনিশা বলল—"আর বেশি দেরি নেই ঈশা। আর একটু সহ্য করো। তারপরই বেবিকে দেখবে।"

ঈশার মনে হল যেন মা কথা বলছে। পরিশ্রান্ত স্বরে সে বলল—"মা, মাকে দেখতে ইচ্ছে করছে অ্যানি। তুমি ডাকলে ওরা আসবে না?"

অনিশা ভরসা দিল—"খবর পেলেই চলে আসবেন। আমি ফোন করতে সময় পাইনি। এবার করে দিচ্ছি।"

দুই বোনের বাংলা কথাবার্তার মাঝখানে মিলটন চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। দূরে চেয়ারে রোজা বসে আছেন। অনিশা ডাকল—"মিসেস জোনস, ঈশার কাছে এসে বসুন। মিলটন, তুমি একবার নার্সদের সঙ্গে কথা বলো। আমি ফোন করে আসছি।"

হাসপাতালের ওয়েটিং রুমে বসে অনিশা সেল্‌ফোনের নম্বর টিপল। বাবা ফোন ধরলেন। এর মধ্যেই চিন্তা শুরু করেছেন। অনিশা সময়মতো ওয়াশিংটন থেকে বেরিয়েছে কিনা জানার জন্যে অ্যাপার্টমেন্টেও ফোন করা হয়ে গেছে। অনিশা সব ফিরিস্তি শুনতে শুনতে জবাব দিল—"শোনো, আমি আজ যেতে পারছি না। এখন ক্যামডেন থেকে ফোন করছি। ঈশার কাছে এসেছি।" ওপাশে কোনও সাড়া নেই। অনিশা হ্যালো হ্যালো করতেই বাবার গলা শুনল—"হ্যালো, অনু, তুমি ঈশার কাছে মানে? ওর বাড়ি থেকে ফোন করছ?"

—"বাড়ি নয়। ক্যামডেনের লিংকন হস্‌পিটাল থেকে। ঈশাকে এখানে অ্যাডমিট করেছে বাবা...."

—"ঈশা হাসপাতালে? কেন? কী হল ওর? অনু, অনু ক্যান ইউ হিয়ার মি?"

কথার মাঝখানে লাইন কেটে গেল। অনিশা আবার ফোন করতেই বাবার চিন্তিত গলা শুনে বলল—"ভয়ের কিছু নেই বাবা। ঈশা ভাল আছে। লিংকন হসপিটালের নাম্বারটা লিখে নাও। মাকে নিয়ে চলে এসো।" ফোন নম্বর নিতে গিয়ে বাবা আবার জানতে চাইলেন—

"—ঈশার কী হয়েছে অনু? অ্যাক্‌সিডেন্ট নয় তো?" ফোন রাখার আগে অনিশা উত্তর দিল "না। শি ইজ্ ইন্ লেবার। তোমাদের দেখতে চাইছে।"

রিকভারি রুম থেকে নিজের বিছানায় আসার পরে ঈশার তখনও প্রায় ঘুমঘুম ভাব। পাশের চেয়ারে মিলটন বসে আছে। কোলে সাদা কম্বলে জড়ানো ঘুমন্ত শিশু। রোজা ঝুঁকে পড়ে দেখছেন। নাতিকে হেসে বলছেন—"হি লুকস জাস্ট লাইক ইউ মাই ডিয়ার। লুক অ্যাট হিজ্ কার্লি হেয়ার! লুক অ্যাট হিজ্ বি...ই...ই...গ আইজ।"

দিদিমার উচ্ছ্বাস দেখে মিলটন হাসছে। বাচ্চাটা চোখই খুলছে না। দিদিমা ওর বিরাট বিরাট চোখ দেখে ফেলেছে। বুড়ি কিন্তু ভুল বলছে না। মিলটন সত্যিই বাচ্চাটার সঙ্গে নিজের মিল খুঁজে পাচ্ছে। ডেলিভারির পর ঈশাও তো বলেছে বেবিকে দেখতে মিলটনের মতো হয়েছে। মিলটন বেশ অভিভূত হয়ে পড়েছে।

ওদের এই নিজস্ব মুহূর্তে ঘরের বাইরে কথার আওয়াজ শোনা গেল। ঈশার তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব কেটে যাচ্ছে। কতদিন পরে চেনা গলার স্বর। কতদিন পরে বিছানার ধার ঘেঁষে মা, বাবার উৎকণ্ঠিত মুখ। ঈশার মনে হল মাঝে কোথাও কিছু ঘটেনি। সে যেন এক দীর্ঘ দুঃস্বপ্নের শেষে জেগে উঠেছে। চারদিকে নিরাপত্তা। সামনে নিশ্চিন্ত দিনের আশ্বাস।

মিলটন উঠে দাঁড়িয়েছিল। দু' হাতে ছেলেকে ধরে রেখে মৃদু হাসল—"আমি মিলটন। আগে একবার দেখা হয়েছিল।"

ধ্রুবজ্যোতি সহজ, স্বাভাবিক ব্যবহার করলেন। মনের মধ্যে যত রাগ, দুঃখই থাক, ঈশার জন্যে সবই ভুলে থাকতে হবে। ধ্রুবজ্যোতির ইচ্ছে হচ্ছিল বাচ্চাটাকে একটু ছুঁয়ে দেখবেন। কোলে নিতে ভরসা পাচ্ছিলেন না। দেখলেন তার আগেই সুস্মিতা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

ঘরের কোণ থেকে বৃদ্ধার ভাঙা গলা শোনা গেল—"আমি রোজা জোন্স। মিলটনের দিদিমা। আপনাদের দেখে খুশি হলাম।"

গোলাপি টুপি পরা কালো, রোগা মানুষটাকে ওঁরা এতক্ষণ লক্ষ্যই করেননি। ঈশার পাশের বেডেও কালো রুগী শুয়ে আছে। সুস্মিতা ভেবেছিলেন ওদেরই কেউ কোণের চেয়ারে বসে আছে। রোজা নিজে থেকে আলাপ করাতে দুজনেই ভদ্রতা করে হাসলেন।

ঈশা বলল—"তুমি বাড়ি যাবে না? সেই সকাল থেকে হসপিটালে এসেছ? ইউ মাস্ট্ বি ভেরি টায়ার্ড।"

রোজা ব্যাগ তুলে নিয়ে বাইরে যেতে যেতে বললেন—"এবার যাবো। এখন একটু ওয়েটিং রুমে গিয়ে বসি। মিলটনের সঙ্গেই ফিরে যাব।"

ওয়েটিং রুমে রোজার সঙ্গে অনিশার দেখা হল। রুগীর ঘরে একসঙ্গে বেশি লোক থাকতে দেয় না। অনিশা কফি খেতে খেতে টিভির খবর শুনছিল। রোজাকে দেখে বলল—'ইউ লুক ভেরি টায়ার্ড। বাড়ি যাবেন না?"

রোজার খুবই ক্লান্ত লাগছিল। বুড়ো বয়সে বেশি ঘোরাঘুরি আর পেরে ওঠেন না। মিলটনের জন্যে সকাল থেকে বেরিয়ে পড়েছেন। সারাদিন হাসপাতালে কাটল। এখন আবার কতক্ষণ বসে থাকতে হবে কে জানে? পাড়ায় কাউকে ফোন করলে হয়তো গাড়ি নিয়ে চলে আসত। রোজা বসে বসে সাত-পাঁচ ভাবছিলেন।

অনিশা জিজ্ঞেস করল—"আপনি কত দূরে থাকেন?"

"মিলটনের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে তিন ব্লক দূরে। ওই কবরখানার দিকে।"

অনিশার কৌতূহল হল—"আর আপনার মেয়ে? মিলটনের মা কোথায় থাকে?"

—"চেষ্টারে। মিলটনের স্টেপ্-ফাদারের সঙ্গে।"

—"মিলটন মার কাছে যায় না?"

—"নাঃ। স্টেপ-ফাদারকে পছন্দ করে না। ছোটবেলায় খুব মারধর করত। সেই থেকে রাগ। আমার কাছে চলে এসেছিল। এখানেই হাইস্কুলে পড়েছে।"

—"কলেজে যাওয়ার চেষ্টা করলে পারত।"

—"কমিউনিটি কলেজে তো ঢুকেছিল। হোটেলের কাজটা পেয়ে যেতে ছেড়ে দিল। ফুল টাইম কলেজে পড়ার মতো পয়সাও ছিল না। সময়ও ছিল না। আমার ক্ষমতা নেই যে মিলটনকে কিছু দিতে পারি।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রোজা মাটির দিকে চেয়ে থাকলেন। অনিশা ভাবছিল এই সব মানুষের জীবনের ওপর দিয়ে নদীর স্রোতের মতো বহমান সুখ-দুঃখ, আনন্দ, বেদনার কথা। কত অভাব। কত সমস্যা। তবু কী অশেষ পার্থিব তৃষ্ণা নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকে।

ঈশা তার ছেলের নাম রেখেছে রোহন। ইন্টারনেট থেকে বেছে নিয়েছে। ক্যামডেনের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে প্রথমেই তার মনে হল বাড়ি বদলানো দরকার। নিজে এতদিন যেভাবে হোক থেকেছে। মিলটনের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পেরে ওঠেনি। গত এক বছর ধরে মিলটনকে কতবার বলেছে অন্য পাড়ায় বাড়ি দেখতে। আর একটু বড় অ্যাপার্টমেন্টে থাকার মতো ক্ষমতাও ওদের আছে। মিলটন রাজি হয়নি। আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে চেয়েছে। ঈশা বোঝে মিলটন এখনও ওর কমিট্‌মেন্ট -এর ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারে না। ঈশা যে বিয়ে করতে চায়নি, ভেবে দেখার জন্যে সময় নিচ্ছে, সেটাই হয়তো মিলটনের দুঃখ পাওয়ার কারণ। যেখানে সম্পর্কেরই স্থায়িত্ব নেই, সেখানে নতুন করে বাড়িঘর খুঁজে কী লাভ? মিলটনের কথা থেকে ঈশার এরকমই মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন আর এভাবে থাকা যায় না।

সেদিন মিলটনের হোটেলে রাতের ডিউটি পড়েছে। সন্ধেবেলা ঈশা বাড়িতে একা থাকবে বলে রোজা আসতে চাইছিলেন। রোহনকে চান করানোর জন্যে প্রায়ই চলে আসেন। আজ ঈশা ওঁকে আসতে বারণ করল। সকাল থেকে অনেকরকম চিন্তা ওর মাথায় ঘোরাফেরা করছে। আজ বাবার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

সন্ধেবেলা মিলটন বেরিয়ে যাওয়ার পরে ঈশা বাবাকে ফোন করল। এমনিতে ওঁরা রোজই এবেলা ওবেলা খবর নিচ্ছেন। রোহন আর ঈশাকে কিছুদিনের জন্যে নিয়ে যেতে চাইছেন। দু' সপ্তাহের বাচ্চা নিয়ে এখনই গাড়িতে অতদূর যাওয়া ঠিক হবে কিনা ঈশা বুঝতে পারছিল না।

আজ নিজেই বাবাকে বলল—"এবার মনে হচ্ছে রোহনকে নিয়ে গাড়িতে অতটা যেতে পারব। তোমরা কবে আসতে পারবে বলো? নয়তো মিলটনও পৌঁছে দিতে পারে।"

ধ্রুবজ্যোতি খুশি হয়ে বললেন—"আমরাই যাবো। এই উইক-এন্ডে আসবে? তাহলে শুক্রবার গিয়ে নিয়ে আসব।"

ফোনের অন্য লাইনে সুস্মিতার গলা—"না, ঈশা, শুক্রবার নয়। বাচ্চার পক্ষে বড্ড রাত হয়ে যাবে। শনিবার সকালে যাবো।

ঈশা লক্ষ্য করল মিলটনের যাওয়ার কথা ওঁরা এড়িয়ে গেলেন। সূক্ষ্ম অপমানবোধে

নিজের গলার স্বর নিজের কানেই কঠিন শোনাল—"আমরা কিন্তু বেশিদিন থাকব না। জাস্ট দু-তিন উইক।"

সুস্মিতা অবাক—"কেন? তোর তাড়া কিসের? ক্রিসমাসের আগে তো জয়েন করছিস না?"

ঈশা হাসল—"রোহনকে ছেড়ে মিলটন অতদিন থাকতে চাইবে না। ইন ফ্যাক্ট ওকে তো এখনও বলিইনি যে তোমাদের কাছে যাচ্ছি।"

ধ্রুবজ্যোতি বললেন—"কেন? আমরা তো হসপিটালেই ওকে বলে এসেছিলাম..."

সুস্মিতা ওঁর কথা থামিয়ে দিয়ে বললেন—"ঈশা, ছেলেটা কি ক্রিবে শোবে? তাহলে তোর ছোটবেলার ক্রিবটা বেসমেন্ট থেকে ওপরে নিয়ে আসব।"

ঈশা বলল—"ওটাই ফিক্স করে দাও। তোমাকে একটা লিস্ট করে দিচ্ছি মা। জিনিসগুলো কিনে রেখো।"

পরদিন দুপুরে মিলটন বাড়িতে ছিল। রোহনকে সারাক্ষণ কাঁধে নিয়ে ঘুরছে। ঈশা রান্নাঘরের কাজকর্ম সেরে বিছানায় এসে শুয়েছিল। মিলটন ওর পাশে এসে বসল। রোহনকে ছোট্ট ব্যাসিনেটে শুইয়ে দিয়েছে। একটু আগে পর্যন্ত ঘুমের জন্যে কান্নাকাটি করছিল। এখন আর সাড়াশব্দ নেই। মিলটন ওকে ভাল করে ঢেকে দিয়ে বিছানায় ফিরে এল।

ঈশাকে জড়িয়ে ধরে আদর করছিল মিলটন। ঈশা বলল—"আজও তো রাতে থাকবে না।"

—"জানি। কাজে যেতে ইচ্ছে করে না। অফিসে গিয়ে মনে হয় কখন বাড়ি আসব। কাল রাতে তোমাকে ফোন করতে গিয়েও করলাম না। রণ জেগে উঠবে।"

মিলটনের বুকের কাছে মাথা রেখে ঈশা বলল—"দু'মাস বাদে আমারও তাই হবে। ওকে ছেড়ে কী করে যে কাজে যাব। অথচ উপায়ও তো নেই।"

বাচ্চাটা কেঁদে উঠল। ঈশা উঠে গিয়ে কোলে নিয়ে বিছানায় এসে বসল। মিলটন কিছু ভাবছিল। ঈশার হঠাৎ মনে পড়ল কাল ক্যাথি নামে একজন মিলটনকে ফোন করেছিল। সে কথা বলতেই মিলটন বলল—"হুঁ। রিয়েল এস্টেট এজেন্ট। কয়েকটা অ্যাপার্টমেন্ট দেখাবে।"

ঈশা অবাক—"তুমি অ্যাপার্টমেন্ট দেখছো? আমাকে বলোনি তো?"

মিলটন বিছানায় উঠে বসল। মাথার একরাশ কোঁকড়ানো চুলের ভেতর আঙুল রেখে ঈশার দিকে চেয়ে আছে। ঈশার কেমন ভয় ভয় করছিল। মিলটন এরকম গম্ভীর হয়ে গেল কেন?

মিলটন বলল—"আমি অ্যাপার্টমেন্ট দেখছি। এখানে আর থাকব না।"

—"তার মানে?"

—"মুভ করে যাবো।"

ঈশা স্তম্ভিত—"আর আমরা?"

মিলটন কাঁধ ঝাঁকাল—"এ বাড়িতে নিশ্চয়ই থাকবে না? তোমার বাবা, মার কাছে ফিরে যাবে।"

—"মিলটন। হাউ কুড ইউ সে দ্যাট্ টু মি?"

রোহনকে আঁকড়ে ধরে উদভ্রান্তের মতো ঈশা উঠে দাঁড়িয়েছে। অপ্রত্যাশিত আঘাতে তার

বুক ভেঙে যাচ্ছে। মিলটনের জন্যে উনিশ বছর বয়সে সব কিছু ছেড়ে চলে এসেছে। মা, বাবা, আত্মীয়স্বজন, নিজেদের সমাজ থেকেই কত দূরে সরে আছে। এতদিন ধরে মিলটনের সঙ্গে রয়েছে। তার সন্তানের জন্ম দিয়েছে। এই দৈন্যদশার মধ্যেও রোহনকে নিয়ে ভালোভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখেছে। আর এখন, এই অবস্থায় মিলটন তাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ঈশার বোধশক্তি হারিয়ে যাচ্ছিল।

হঠাৎ মিলটন ঈশার কাছে এসে হাসতে শুরু করল। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলল—"সরি! ঈশা। আই ওয়াজ্ জাস্ট জোকিং উইথ্ ইউ। দেখছিলাম তুমি কী রি-অ্যাক্ট করো। আ অ্যাম্ রিয়েলি সরি।"

ঈশা ফুঁসে উঠল—"এরকম রসিকতা আমি হেট করি। সত্যি বলছি মিলটন এরকম ক্রুয়েল্ জোকস আমার ভালো লাগে না। কেন তুমি এতক্ষণ ধরে আমাকে কষ্ট দিলে?" ঈশা তখনও কাঁদছিল।

মিলটন অনেকবার ক্ষমা চেয়ে ওকে শান্ত করল। ওর সেদিন কাজে যেতে ইচ্ছে করছিল না। বাইরে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। ভাঙা বাড়ির ছোট্ট ঘরে শুয়ে শুয়ে মিলটন ছাদের ওপর জল পড়ার শব্দ শুনছিল। ওর বিশাল চওড়া বুকের ওপর ছোট্ট এতটুকু রোহন। ঈশা আজ আর বাবা, মার কাছে যাওয়ার কথা বলল না।

রাত আটটা নাগাদ মিলটন হোটেলে চলে গেল। দশটার পরে রিসেপশন কাউন্টারে বসে ঈশার সঙ্গে ফোনে কথা বলল। তারপর ভোররাতে ঈশার ঘুম ভাঙল ডোর বেলের শব্দে। কেউ বারবার দরজা ধাক্কা দিচ্ছে। ঘুমচোখে উঠে ঈশা দেখল নীচে রাস্তায় পরপর পুলিসের গাড়ি। আবছা অন্ধকারে লোকজন দেখা যাচ্ছে। ঈশার বুক কেঁপে উঠল। পুলিস দরজা খুলতে বলছে।

দরজা খুলে দিতে দুজন পুলিস অফিসার ভেতরে এলেন। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে একজন বললেন—"মিলটন উইলিয়ামস তোমার কমপ্যানিয়ন?"

ঈশা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল—"কেন? কী হয়েছে তার?"

—"খুব দুঃখের খবর। মিলটন উইলিয়ামস মারা গেছে। শট ডেড্।"

ঈশা বিশ্বাস করতে পারছে না। কী করে সম্ভব? পুলিস অফিসার বললেন—"হাওয়ার্ড জনসন হোটেলে গত রাতে রবারি অ্যাটেম্পট হয়েছিল। নাইট ডেস্কে মিলটন উইলিয়ামস ছিল। সিকিওরিটি আসার আগেই তাকে গুলি করে দিয়েছে। মিলটন অ্যাম্বুলেন্সেই মারা গেছে।"

কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরে রোহনকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে ঈশা পুলিসের গাড়িতে উঠল। লিংকন হসপিটালেই রোহন জন্মেছে। এখানে একজন কালো মানুষের সঙ্গে ঈশার সম্পর্কের শুরু। এখানেই অন্যজনের সঙ্গে সম্পর্কের শেষ।

এই পর্যন্ত লিখে অভিনেতা রোহন উইলিয়ামস কমপিউটার বন্ধ করল। পাবলিশিং কোম্পানির লোক পরশু দিন কপি নিতে আসবে। এবার এই পর্যন্ত থাক। সামনের সপ্তাহে নিউ অর্লিন্সে নতুন ছবির শ্যুটিং আছে। রোহন ফিরে এসে আবার পরের চ্যাপ্টার নিয়ে বসবে। অভিনেতাদের জীবনকাহিনি লেখার জন্য এখনই যে কেন লোকে তাড়া দেয়? চল্লিশ বছর বয়সে কাজের ব্যস্ততার মধ্যে গভীর ভাবে কিছু চিন্তা করা যায়?

রোহনের আজ বারবার মনে হচ্ছে বাবার কথা ভালো করে লেখা হল না। আসলে যেটুকু দেখেছে সবই মার চোখে দিয়ে। মাও কি রোহনকে সব ব্যক্তিগত কথা বলেছেন? আত্মকথায় তো আর কল্পনা মেশানো যায় না। নয়তো মিলটন উইলিয়ামসকে আরও বড় ভূমিকায় রাখা যেত। মাত্র দু'মাস বয়সে যে বাবাকে হারিয়েছে, সে আর শোনা কথা নিয়ে কত লিখবে? তাও যদি বাবাকে অনেক লোক চিনত জানত, রোহন কিছু মালমশলা পেত। গরিব নিগ্রো পঁচিশ বছরের এক হোটেল ক্লার্ককে তার বউ ছাড়া কেউ কাছ থেকে দেখেনি। তার অবশ্য আর বউ হওয়াও হয়নি।

একমাত্র ছিল বুড়ি দিদিমা। রোজা জোন্‌স। রোহনের তিনবছর বয়সে সে বুড়িও স্বর্গে গেছে। যেতেই পারে। মা বলেন তাঁর খুব ঈশ্বর ভক্তি ছিল। মিলটন উইলিয়ামস-এর ফিউনার‍্যাল্‌-এর দিন বুড়ি মাকে বুঝিয়েছিল—ঈশ্বর ওকে ভালবাসেন। তাই সংসারের দুঃখ কষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন।

বোঝো! মা পড়ে রইল। রোহন পড়ে রইল। ঈশ্বর বাবাকে বগলদাবা করে নিয়ে গেলেন। সেটাই তাঁর দয়ার নমুনা। রোহন কমপিউটারে ওল্ড্‌ পিক্‌চার ফাইল খুলে বাবার ছবি দেখল। মা বলেন বাবাকে ডেনজেল ওয়াশিংটনের মতো দেখতে ছিল। রোহন বরং তার নিজের সঙ্গেই বেশি মিল খুঁজে পায়।

ওল্ড্‌ পিকচার ফাইল বন্ধ করার আগে রোহন মা আর অ্যান্ট্‌ অ্যানির ছোটবেলার ছবিটা দেখল। দুই বোনে একটুও মিল নেই। মা চিরকাল মোটা। গোল মুখে গোল গোল চশমা। তখন দাঁতে ব্রেস্‌ পরতো। পাশে অ্যান্ট্‌ অ্যানিকে মনে হচ্ছে টিনেজ মডেল গার্ল। মা বোধহয় একটু কমপ্লেক্সে ভুগতো। হাইস্কুলে কেউ মার সঙ্গে ডেট করেনি। হাইস্কুলে প্রম্‌-ড্যান্সে মা নাচের কোনও সঙ্গী পায়নি। না ইন্ডিয়ান কমিউনিটিতে, না হোয়াইট আমেরিকান কমিউনিটিতে। কোনও ছেলে মাকে নিয়ে একদিনের জন্যেও বেরোয়নি। তাই কলেজে যেতে না যেতেই কোন ফুটবল গেমে মিলটন উইলিয়ামস-এর সঙ্গে আলাপ হল আর মা তার স্বপ্নের পুরুষকে পেয়ে গেল।

রোহন উইলিয়ামস এক সপ্তাহ পরে নিউ অর্লিন্স থেকে লস অ্যাঞ্জেলেসে ফিরল। ভেতরে ভেতরে ভীষণ উত্তেজনা চলেছে। অস্কার এর জন্যে "সেগ্রিগেশন" ছবিটা নমিনেটেড হয়েছে। বেস্ট অ্যাকটর হিসেবে ওর নাম উঠেছে। আরও তিনজন অভিনেতাও নমিনেশন পেয়েছে। তার মধ্যে দু'জন বিখ্যাত নায়ক অসাধারণ অভিনয় করেছে। রোহন ধরেই নিয়েছে ওর তেমন আশা নেই। তবু খবরের কাগজে, টিভিতে ওর অভিনয়ের প্রশংসা আর রেটিং যা শুনছে, রোহনের মনে হচ্ছে হয়তো আশাতীত কিছু ঘটতেও পারে। এর আগে দু'বার ও 'অস্কার'-এ নমিনেটেড হয়েছিল। দু'বারই সাদা অভিনেতা পুরস্কার নিয়ে নিয়েছে। সেই হিসেবে এবার হয়তো রোহনের পাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। যদিও রং-এর জন্যে নির্বাচিত হওয়াকে সে খুবই অসম্মানজনক মনে করে। হলিউডের কালো অভিনেতা হিসেবে নয়, অভিনয়ের যোগ্যতার বিচারে সে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার আশা করে। টিভির ইন্টারভিউতে রোহন এ সব কথা বলেছে।

তিন হাজার মাইল দূরে বসে ঈশা টিভিতে রোহনকে দেখে। মুভি থিয়েটারে গিয়ে বিরাট পর্দায় যখন ছেলের অভিনয় দেখে, বিশ্বাস হয় না এই তার রোহন। বাড়ি ফিরে পুরোনো

অ্যালবাম নিয়ে বসে। সেই উনিশ বছর বয়স থেকে আজ পর্যন্ত কত ঘটনা, কত স্মৃতি। জীবনের এই শেষ পর্বে আরও কী বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে কে জানে?

সেদিন অনেক রাতে রোহন ফোন করল—"তুমি শুয়ে পড়েছিলে না বই পড়ছিলে?"

ঈশা হাসল—"দুটোই। আজকাল ঘুম আসতে দেরি হয়।"

রোহন খুব তাড়া করছিল—"শোনো মা, তোমাকে এখানে আসতে হবে। পরশুর ফ্লাইট নিতে পারবে? আমি ট্রাভল্ এজেন্টকে কল করে দিচ্ছি।"

ঈশা অবাক—"এখনই লস অ্যাঞ্জেলেস যাবো? কী ব্যাপার? তুমি ভাল আছো তো?"

—"না। ভালো নেই। ভীষণ টেনস্ড। তোমার কি মনে হচ্ছে অ্যাওয়ার্ডটা পাবো?"

ঈশার মনে হল রোহন ঠিক ছোটবেলার মতো মাকে দিয়ে ভাগ্য পরীক্ষার চেষ্টা করছে। কথায় কথায় ঈশার সামনে এসে আঙুল নাচিয়ে বলত—এটা হবে কিনা বলো। আমাদের টিম জিতবে কিনা বলো। ইয়েল ড্রামা স্কুলে ভর্তির জন্যে অ্যাপ্লিকেশন পাঠিয়েই শুরু করেছিল—অ্যাডমিশন পাব কিনা বলো। আজকেও এক কথা। ঈশা বলল—"আশা তো করছি তুমিই পাবে। কিন্তু এরজন্যে আমাকে প্রে করতে বোলো না রোহন। ভগবানকে অ্যাওয়ার্ডের কথা বলা যায় না। না চাইতেই তোমাকে তিনি অনেক দিয়েছেন।"

রোহন হেসে ফেলল—"শুধু দুটো ছেলে মেয়ে আর অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডটা বাকি আছে। এনি ওয়ে, মা ইউ মাস্ট কাম টু এল.এ। এবার অস্কার নাইটে তোমারও ইনভিটেশন আছে।"

ঈশা অবাক—"আমাকে ইনভাইট করেছে? তবে তো মনে হচ্ছে এ বছর তুমিই অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছো।"

—"কে জানে? চলে তো এসো। পরশুর টিকিট পাঠাবো?"

—"দাঁড়াও একটু ভেবে দেখি। আমার মেইড আবার কাল থেকে ছুটিতে গেছে। রেবসকে কোথায় রেখে যাবো তাই ভাবছি।"

কুকুরের জন্যে মা অস্কার নাইটে আসার ডিসিশন নিতে পারছে না শুনে রোহন বলে দিল—"তাহলে রেবসকে সঙ্গে নিয়ে এসো। আমি পরশুর ফ্লাইটের টিকিট পাঠাচ্ছি।"

ঈশা শেষ পর্যন্ত কুকুর নিয়ে অনিশাদের বাড়িতে চলে গেল। ওখান থেকেই লস অ্যাঞ্জেলেসের ফ্লাইট নেবে। অনিশা আর ওর ডাক্তার স্বামী দীপংকর প্রিন্সটনে প্র্যাকটিস করে। অনেক বছর ওখানেই আছে। ঈশা মাঝে মাঝে রেবসকে নিয়ে ওদের বাড়িতে যায়। দীপংকরের সঙ্গে কুকুরটার খুব ভাব। এই সাতষট্টি-আটষট্টি বছর বয়সেও দীপংকরের ক্লান্তি বলে কিছু নেই। বল নিয়ে বাগানে রেবসের সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করে বেড়ায়। ঈশা ভেবে দেখল প্রিন্সটনেই ওকে রেখে যাওয়া সুবিধে। এক সপ্তাহের তো ব্যাপার।

এবার মার্চের শেষ সপ্তাহেও বরফ পড়ছে। অনিশাদের বাড়ির চারপাশে অনেকখানি ফাঁকা জমি। পেছন পাইনের বন। ঈশা জানলা দিয়ে বরফ দেখছিল। দূরের মাঠ, নদী পার হয়ে দেবদারু বনের ভেতর দিয়ে দমকা হাওয়ার মাতামাতি। সাঁতারের পুলের নীল জলে ঝরে পড়া বৃষ্টির মতো বরফের কণা। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চেয়ে ঈশা ভাবছিল কাল যেন রোদ ওঠে। মেঘ, বৃষ্টি, বরফ, কুয়াশা কিছুই তার ভালো লাগে না।

পরদিন দুপুরে ফ্লাইট। এর মধ্যে রোহনের ফোন এল। অনিশার সঙ্গে কথা হতে রোহন জিজ্ঞেস করল—"কেমন আছ তোমরা? আংকল-এর কী খবর? কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত?"

অনিশা হাসল—"মোটামুটি। আংকল ভালোই আছেন। তুমি কেমন আছো রোহন? কতদিন দেখা হয়নি। নিউইয়র্কে আসো তো মাঝে মাঝে?"

—"খুব কম সময়ের জন্যে আসি। মার সঙ্গে বেশিক্ষণ থাকা হয় না। দেখি, একবার সময় করে তোমাদের কাছে যাবার চেষ্টা করব।"

দীপংকরের সঙ্গেও রোহনের কথা হল। ওর অস্কার পাওয়ার সম্ভাবনায় অনিশা দীপংকর দুজনেই খুব খুশি। দীপংকর ফোন রাখার আগে উচ্ছ্বাসের গলায় বলল—"উই আর প্রাউড অফ্ ইউ। উইশ ইউ বেস্ট অফ লাক।"

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর তিনজনে ফ্যামিলি রুমে কফি নিয়ে বসেছিল। পুরোনো গল্পের সূত্র ধরে ঘুরে ফিরে সেই মা, বাবা, মিলটনের কথা। দীপংকর মিলটনকে দেখেনি। ওদের বিয়ের সময় ঈশা ফিলাডেলফিয়া থেকে একদিনের জন্যে এসেছিল। রোহনের বয়স তখন পাঁচ বছর।

অনিশা বলছিল—"এখন বুঝতে পারি রোহনকে নিয়ে তোমার আলাদা থাকার ডিসিশনটা ঠিকই হয়েছিল। দ্যাট ওয়াজ দ্য রাইট মুভ। আজ দেখো, নিজের ব্ল্যাক আইডেনটিটি নিয়ে রোহন কোথায় পৌঁছে গেছে।"

ঈশা মাথা নাড়ল—"আমি এত কিছু আশা করিনি অ্যানি। সে সময় শুধু ভাবতাম কী করে ওকে ওর বাবার পরিচয়ে বড় করে তুলব। সেটাই তো ওর সত্যিকারের পরিচয়। আমাদের বাঙালি কমিউনিটি কোনো দিনই ওকে অ্যাকসেপ্ট করেনি।"

দীপংকর তর্ক তুলল—"এটা তোমার অভিমানের কথা। তুমি কোনোদিন সে ভাবে মেলামেশার চেষ্টাও করোনি। চেনাশোনা বাঙালির মেয়ে ব্ল্যাক বিয়ে করেছে। তার একটা বাচ্চা আছে। আমরা তাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারব না।"

ঈশা কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে বলল—"আমরা বোলো না, বল আমি। দীপংকর, তুমি কতটুকু জানো? কতটুকু দেখেছ? আমার এই ষাট বছরের জীবনে "রেস্ রিলেশন" নিয়ে অভিজ্ঞতা তো কম হল না।"

অনিশা বলল—"সবই জানি। আমাদের কমিউনিটি বলে নয়, ডিস্ক্রিমিনেশন সব সমাজেই ছিল। তবু দেখো, মা, বাবা কিন্তু রোহনকে নিয়ে প্রত্যেক জায়গায় যেতেন। দুর্গাপুজোয়, সোশ্যাল গেটটুগেদারে, যেখানেই যেতেন ওকে সঙ্গে নিতে চাইতেন।"

ঈশা বলল—"ওঁরা চেষ্টা করতেন। ভাবতেন এভাবেই সমাজ ওকে আপন করে নেবে। বাঙালি বাচ্চাদের সঙ্গে খেলাধুলো করতে করতে রোহন ওদের দলেই মিশে যাবে।" ঈশার হাত ধরে দীপংকর মৃদু হাসল—"আর তুমি তখন অন্য কথা ভাবতে? তোমার ভয় হত রোহনের মধ্যে মিলটনের পরিচয় মুছে যাবে? তুমি যে ওর বাঙালি মা, সে পরিচয়ও ভুলে থাকতে চাইতে?"

ঈশা মাটির দিকে চেয়ে রইল। জীবনের এই ভাঙা হাটে সে যেন নতুন করে কত কিছুর মূল্যায়ন করছিল। কমবয়সের ভুল, ভ্রান্তি, আবেগের বশে নিজের বাড়ি ছেড়ে যাওয়া সমাজ ছেড়ে থাকা, ফিরে আসা, আবার দূরে সরে যাওয়া। এর মাঝে কত যে গভীর বেদনা আর নিঃশব্দ প্রতিবাদ জমা হয়ে আছে। দীপংকর জানে না রোহনের অস্তিত্ব হারানোর সংকটের জন্যে শুধু নয়, অনেক অবজ্ঞা আর আঘাতের মধ্যে দিয়েই ঈশা তাকে নিয়ে দূরে সরে

গিয়েছিল। অন্য পরিবেশে মানুষ করতে চেয়েছিল। যে পরিবেশে ঈশার "কালুয়া বয়ফ্রেন্ডের" ছেলে বলে রোহনের পরিচয় হবে না। যেখানে রোহন কোনোদিন ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে জানতে চাইবে না—"হোয়াই ডু আই লুক্ লাইক্ এ ব্ল্যাক বয়?"

সেদিনের সেই কঠিন সিদ্ধান্তে ঈশা তার বাবার সমর্থন পেয়েছিল। তিনি ওর সমস্যাটা বুঝেছিলেন। ফিলাডেলফিয়ায় ওদের একটা অ্যাপার্টমেন্ট কিনে দিয়েছিলেন। রোহনকে ক্যাথলিক স্কুলে পড়ার খরচ দিয়েছিলেন। ঈশা হসপিটালে নতুন চাকরি নিয়েছিল। মিলটনের ইনসিওরেন্স-এর থেকে রোহনের নামে কিছু বেনিফিট ছাড়াও হাওয়ার্ড জনসন হোটেল থেকে কমপেনসেশন দিয়েছিল। মোটামুটি সচ্ছলভাবেই তারা থেকেছে। ঈশার মনে হয় মা, বাবার পক্ষেও ব্যাপারটা স্বস্তিদায়ক হয়েছিল। যতদিন ওঁরা বেঁচেছিলেন নিজেদের সামাজিক গণ্ডির মধ্যে কর্তৃত্ব আর প্রাধান্য নিয়ে বেশ ছিলেন। ঈশা রোহনকে নিয়ে আসা-যাওয়া করত। এভাবেই দিনগুলো কেটে গিয়েছিল। আজ অনেক বছর পরে ঈশা উপলব্ধি করছে রোহনকে মানুষ করার সময় সে যেন এক চ্যালেঞ্জ নিয়েছিল। ঈশ্বর সেদিন তার হাত ধরেছিলেন।

শুতে যাওয়ার আগে ঈশা হঠাৎ বলল—"অ্যানি, মিলটনের সঙ্গে তো তোমার বেশি দেখা হয়নি। চেহারাটা মনে আছে?"

অনিশা উত্তর দিল—" 'সেগ্রিগেশন' দেখে এসে ওর কথাই মনে পড়ছিল। রোহনের সঙ্গে এত মিল।"

ঈশা লস অ্যাঞ্জেলেসে এক সপ্তাহ ছিল। অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডে রোহন আর ওর বউ ন্যানসির সঙ্গে সাজগোজ করে গিয়ে সামনের দিকে বসেছিল। অস্কারের জন্যে নমিনেটেড চারটে ছবির অভিনেতাদের একেকটি দৃশ্য দেখানো হচ্ছিল। 'সেগ্রিগেশন' ছবির দৃশ্য দেখানোর পর হল জুড়ে তুমুল হাততালির শব্দ। ঈশার বুক উত্তেজনায় তোলপাড়। রোহন চোয়াল শক্ত করে বসে আছে।

পুরস্কার ঘোষণা করা হল। রোহন উইলিয়ামস্ নয়। সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেলেন বিখ্যাত নায়ক রবার্ট মারসিনি। পঞ্চাশ বছর বয়সে এই তাঁর প্রথম অস্কার। সকলের সঙ্গে রোহন হাততালি দিচ্ছে। দীর্ঘ কালো চোখে পরাজয়ের বেদনা মুহূর্তের মধ্যে হাসিতে ঢেকে গেল। ঈশা ওর দিকে চেয়ে আছে।

কিছুদিন পর রোহন উইলিয়ামস্ আবার তার জীবন কাহিনী নিয়ে বসল। লেখা এবার শেষ করতে হবে।

রোহন উইলিয়ামস্ লিখছিল—"হয়তো আবার বর্ণবৈষম্যের শিকার হলাম। আবারও সেই সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র। কাচের ছাদের নীচে দাঁড়িয়ে ওপরতলা দেখা যায়। পৌঁছানো যায় না। ইয়েল্ ড্রামা স্কুল থেকে হলিউডে এসে পর্যন্ত যত ছবিতে সুযোগ পেয়েছি, 'সেগ্রিগেশনে'র নায়কের ভূমিকাই ছিল সব থেকে কঠিন। এমন সুযোগ বারবার আসে না। আমি গরিব কালো সমাজে বড় হইনি ঠিকই। তবু অভিনয়ের প্রয়োজনে তাদের কাছে থেকে দেখার চেষ্টা করেছি। তাদের ভাবভঙ্গি, কথায় ধরন, হাঁটাচলা অনুকরণ করেছি।

তবে কি সেই অনুকরণে কিছু ভুল ছিল? আমি রোহন উইলিয়ামস্ নিউজার্সির ক্যাম্‌ডেনের মিলটন উইলিয়ামসের ছেলে হলেও গরিব কালো লোকের ভূমিকায় বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারিনি?

তবে ছবিটা পুরস্কার পেল কেন? আমিই বা শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের জন্যে নমিনেশন পেলাম কেন? শুধু এ ছবির জন্যে নয়, কালো অভিনেতা হিসেবে আমার জনপ্রিয়তা যে কোথায় পৌঁছেছে, গত কয়েক বছরেই তার প্রমাণ পেয়েছি। আমি যে এবার অস্কার পেলাম না, সে জন্যে দর্শকরা খুবই হতাশ। কে জানে? এত প্রশংসার পরেও বিচারকদের কাছে কেন আমি শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের স্বীকৃতি পেলাম না?

মা চলে যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা হল না। শ্যুটিং-এ বাইরে ছিলাম। মা একটা কার্ড রেখে গেছে। লিখেছে—একটি পুরস্কারই সফলতার শেষ কথা নয়। জন্মমুহূর্ত থেকে সারা জীবন ধরে মানুষ কোথাও পৌঁছতে চেয়েছে। আমাদের লক্ষ্য বলো, গন্তব্য বলো, সবই সেই আশা, আকাঙ্ক্ষা, উদ্দেশ্য পূরণের কাহিনী। রোহন, নিজের নামের যোগ্য হয়ে ওঠো। হতাশার অন্ধকারের দিকে নয়। অপরিমেয় সূর্যের আলোয় দাঁড়িয়ে সামনে চোখ মেলে দেখো। আর মাত্র কয়েকটি সিঁড়ি। তোমার পা রাখার অপেক্ষায়।

অভিনেতা রোহন উইলিয়াম্‌স মার চিঠি দিয়ে তার আপাত জীবনকাহিনি শেষ করল।

পাপপুণ্য

কেটন হাউসের কাঠের সিঁড়ির ধাপে ধাপে একদল কালো ছেলে মেয়ে বসেছিল। নীচু স্বরে কথা বলছিল। পুরোনো বাড়িটার উঁচু উঁচু জানলার ঝাপসা কাচে সকালের সোনালী রোদের ঝিলিমিলি। ঘর বারান্দা জুড়ে গোলাপ আর মোমবাতির মৃদু গন্ধ। দরজার পাশে লম্বা টুলের ওপর রাখা খাতায় একজন কিছু লিখছে। মণীশ দাঁড়িয়ে যেতে নীপা ডাকল—"ওঁরা অপেক্ষা করছেন। ভেতরে চলো।"

ঘরে ঢুকতে লম্বা, রোগা মতো এক কালো মহিলা ওদের দেখে এগিয়ে এলেন—"হ্যালো! আমি শার্লি। জেসীর বন্ধু। তোমরা নিশ্চয়ই ওর ফ্যামিলি?"

মণীশ দূরে টেবিলের ওপর রাখা ওর মার ছবিটা দেখছিল। নীপা উত্তর দিল—"আমি নীপা। আমার হাসবেন্ড মণীশ ওঁর ছেলে।"

—"এসো। সামনে এসে বোসো। তোমরা বোধহয় সোজা এয়ারপোর্ট থেকে এসেছো? কফি, অরেঞ্জ, জুস্ কিছু দেব?"

মণীশ বলল—"না। আমরা ব্রেকফাস্ট করে এসেছি। ধন্যবাদ।"

দু'জনে টেবিলটার কাছাকাছি সোফায় গিয়ে বসলো। মাঝারি মাপের বসার ঘর। অল্প কিছু লোক এসেছে। কয়েকজন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। বারান্দার সিঁড়িতে বসে থাকা ছেলেমেয়েগুলো একে একে ভেতরে এলো। অর্গ্যানের পাশে সার দিয়ে দাঁড়ালো। এক বৃদ্ধা অর্গ্যানে ধীরে ধীরে সুর তুলছেন।

মনিশ ভাবছিল মার মেমোরিয়াল সার্ভিসে যারা এসেছে তাদের কাউকে ওরা চেনে না। অথচ এরা সবাই মাকে চিনতো। এদের সঙ্গেই মার শেষ জীবনটা কেটে গেছে। আজ এই ঘরে, সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশে মণীশের চোখের সামনে শুধু একটি মাত্র চেনা মুখ। ছবিতে মার মুখ। মাঝে কতদিন দেখা হয়নি। দেখা যদি বা হত, মার কোনো তাপ উত্তাপ বোঝা যেত না। অনুযোগ, অভিযোগ কিছুই ছিল না। মা ধীরে ধীরে নিজেকে একরকম বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিল।

—"আশীষ বলেছিল দশটার মধ্যে পৌঁছে যাবে। কোথায়? দেখছি না তো।"

নীপার কথায় মণীশ ঘড়ি দেখল—"এসে যাবে। জায়গাটা তো ওদের বাড়ির থেকেও কাছে নয়। ভাবো, মা কত বছর ধরে বাস্-এ কমিউট করেছেন।" মণীশ কিছু বলতে যাচ্ছিল। নীপা ঘাড় ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল—"ঐ তো ওরা এসে গেছে।"

শার্লির পাশাপাশি ফুলের তোড়া হাতে আশীষের বউ ক্যাথী আসছে। পেছনে এক ভারতীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে আশীষ। মণীশ হাত তুলে ওদের পাশের চেয়ারগুলো দেখালো। আশীষ কাছে এসে দাদার সঙ্গে কথা শুরু করতেই অর্গ্যান বেজে উঠল। নীপা ইশারায় ওদের চুপ করতে বলল। ক্যাথী তখনও ফুলের তোড়া হাতে জয়শ্রীর ছবির সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে।

শার্লি মেমোরিয়াল সার্ভিস পরিচালনা করেছিলেন। ছেলে মেয়েদের গানের পরে সোশ্যাল সার্ভিস এজেন্সির পক্ষ থেকে দু'জন জয়শ্রী সম্পর্কে শ্রদ্ধা জানালেন। ক্লেটন হাউসের মানসিক প্রতিবন্ধী রুগীদের জন্যে "জেসী রয়ের" দয়া, দাক্ষিণ্য, সেবার কথা বললেন।

জয়শ্রীর ছবির কাছে দাঁড়িয়ে শার্লি পড়ে শোনাচ্ছিলেন—

"আয় অ্যাম্ হোম ইন হেভেন, ডিয়ার ওয়ানস্
ওহ্, সো হ্যাপী অ্যান্ড সো ব্রাইট
দেয়ার ইজ পারফেক্ট্ জয় অ্যান্ড বিউটি
ইন দিস্ এভার ল্যাস্টিং লাইট;

অল দ্য পেইন অ্যান্ড গ্রিফ্ ইজ ওভার
এভ্রি রেস্টলেস্ টসিং পাসড্
আয় অ্যাম নাউ অ্যাট পীস ফরেভার
সেফ্লি হোম ইন হেভেন্ অ্যাটল্যাস্ট——"

ক্যাথীর হাতের ছোঁয়ায় স্মৃতির টানাপোড়েনে ছেদ পড়ল। মণীশের দিকে ঝুঁকে পড়ে নীচু গলায় জিজ্ঞেস করল—"ফ্যামিলির দিক থেকে আপনি কিছু বলবেন? মার ফিউনার‍্যালের দিন আশীষ বলেছিল। আজ আপনি কি মার কথা একটু বলতে চান?"

মণীশ বুঝতে পারছিল ওর ইচ্ছে, অনিচ্ছে নয়, ক্যাথী তার নিজের ইচ্ছের আভাস দিয়েছে। যেমনভাবে মাঝেমাঝে প্রচ্ছন্ন বিবেকের মতো ওদের মানবিক সত্তাকে নাড়া দিতে চেষ্ট করত, সেইভাবে। আশীষ আর মার মধ্যে সমস্ত বোঝাপড়ার মূলে ছিল ক্যাথী। মা যদি শেষ জীবনে সংসারে কারও কাছে এতটুকু সম্মান পেয়ে থাকে, সেও বোধহয় এই ফিলিপিনো বউএর কাছে।

মণীশ নিজে থেকে উঠে গিয়ে কিছু বলবে কিনা ভাবছিল। নীপা ক্যাথীকে বলল—"তুমি ওদের গিয়ে বলো। ওরা ডাকলে তবে তো যাবে।"

ক্যাথী বলল—" শার্লি আমাদের আগেই বলে রেখেছেন, সে জন্যেই মণীশকে বলছি।"

শার্লি যখন ডাকলেন, মণীশ তখন মনে মনে কিছু কথা গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। উঠে দাঁড়িয়ে সে মার ছবির কাছে গেল না। নিজের জায়গা থেকে সামান্য ঘুরে দাঁড়িয়ে সবাইকে ধন্যবাদ দিল। তারপর কয়েক মুহূর্ত থেমে থেকে শুরু করল—" এখানে আমি, আমার স্ত্রী নীপা, আমার ভাই আশীষ আর ওর স্ত্রী ক্যাথী উপস্থিত আছি। আমার ছেলেরা হিউস্টন থেকে আসতে পারেনি। এই আমাদের মা জয়শ্রী রায়ের ইমিডিয়েট ফ্যামিলি। আজ মেমোরিয়াল সার্ভিসে মার সম্পর্কে আমাদের ব্যক্তিগত স্মৃতি' পারিবারিক বন্ধনের কথা বলা যেতে পারে। সাধারণত যেমন হয় আর কি?

'মার কথায় ছোটবেলার সুখ দুঃখের দিনগুলো মনে পড়ে। লোয়ার মিডিল ক্লাস ফ্যামিলিতে ছেলে মেয়েদের মানুষ করতে একজন মাকে যতখানি স্যাক্রিফাইস করতে হয়, মাও তাই করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আমরা ছাড়াও বাবার আরও ফাইন্যান্‌শিয়াল কমিটমেন্ট ছিল। দাদু, ঠাকুমার খরচ চালানো, কাকাদের কলেজে পড়ানো, পিসিদের বিয়ে দেওয়া। ইন্ডিয়াতে এ সব দায়িত্ব আগে বড় ছেলেদেরই নিতে হত। অন্তত আমাদের ছোটবেলায় তাই দেখতাম....। এনি ওয়ে, ইট

ওয়াজ টোট্যাল হার্ডশীপ অন্ মাই পেরেন্টস্। আমরা দুই ভাই লেখাপড়া শিখে ভালো চাকরি পাবো। বাবা, মার দায়িত্ব নেবো। এটুকুই ছিল ওঁদের আশা ভরসা।

"আমি আর আশীষ পড়াশোনা শেষ করে এদেশে চলে এলাম। আশীষ পি এইচ ডি প্রোগ্রামে গেল। খবর পেয়ে বাবা, মা খুব খুশি হয়েছিলেন। বাবা লিখেছিলেন—আমাদের নিয়ে তাঁর স্বপ্ন সফল হয়েছে।"

একটানা বলতে বলতে মণীশ রুমাল দিয়ে চশমার কাচ মুছছে। নিঃস্তব্ধ ঘরে একদল মানুষ উদগ্রীব হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে। ধীর সংযত স্বরে মণীশ বলতে লাগল—"কিন্তু, না। রিয়েলিটিতে তো তা ঘটেনি। ওঁরা আমেরিকায় এলেও সেই স্বপ্ন অপূর্ণই থেকে গেছে। বাবা দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। সেখানেই মারা যান। কিন্তু মার যুদ্ধ শেষ হল না। এবার বিদেশের মাটিতে নতুন করে স্ট্রাগল শুরু হল। অর্থের জন্যে নয়, ছেলেমেয়ে মানুষ করার জন্যে নয়, মার লড়াই শুরু হল বিরুদ্ধ পরিস্থিতির সঙ্গে। আমি তাঁর বড় ছেলে তবু তাঁর নিঃশব্দ রক্তক্ষরণের মুহূর্তে পাশে এসে দাঁড়াইনি। দুজনের নীতিবোধ, মূল্যবোধের সংঘাত আমাদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। ক্ষমা চাওয়া আর ক্ষমা পাওয়া দুই-ই হয়ে উঠল সমান কঠিন...."

মণীশের কণ্ঠস্বর ক্লান্ত, বিষণ্ণ শোনাচ্ছিল—"শেষপর্যন্ত আমি হেরে গেলাম। ততদিনে মার লড়াই শেষ হয়েছে। মা সম্পূর্ণ নিজের শক্তিতে জিতে গেছেন। সংসারের বাইরে অচেনা সমাজে এক বৃহত্তর পরিবার খুঁজে নিয়েছেন। তারা মার ওপর নির্ভর করে। মা-ই যেন তাদের অবলম্বন। এই ক্লেটন হাউস মার সেই আপন পৃথিবী। তাঁর বেঁচে থাকার স্বীকৃতি। শুধু বেঁচে থাকা নয়। সসম্মানে বেঁচে থাকা। আপনারা মাকে সেই মর্যাদা দিয়েছিলেন। তার জন্যে আমরা আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ।"

মণীশের কথা শেষ হল। শার্লি কাছে এসে ওর দু'হাত ধরে ধন্যবাদ জানালেন। সভা শেষ করার সময় বললেন—"আপনারা সবাই জানেন, কৃতজ্ঞতা জানানোর কথা আমাদেরই। মার সঙ্গে ছেলেদের যত ঝগড়াই থাক, ক্লেটন হাউসে তাদের ডোনেশনের চেক্ আসা কখনো বন্ধ হয়নি। রয় ফ্যামিলির ফাইন্যানশিয়াল সাপোর্ট ছাড়া এত খরচ চালাতে পারতাম না। শেষদিকে এটাও ছিল জেসীর একটা বড় স্যাটিস্ফ্যাকশন। মণীশ আর আশীষের ডোনেশনের এন্ভেলপ এলে নিজে হাতে খুলতেন।"

আশীষ হেসে উঠে বলল—"ওটা ভেরিফাই করার জন্যে। ক্যাথীকে বিশ্বাস করতেন। আমাকে নয়। যে অ্যামাউন্ট চাইতেন, তার চেয়ে কম দিয়েছি কিনা সেটাই দেখতেন।"

ক্লেটন হাউসের ডাইনিং রুমে ওদের লাঞ্চে ডাকা হল। হুইল্ চেয়ারে বসা একটি মেয়ে একভাবে মাথা দোলাচ্ছিল। পাশে দাঁড়ানো প্রৌঢ়া মহিলাটি তাকে স্যান্ডউইচ ভেঙে ভেঙে খাওয়াচ্ছিলেন। নীপা কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। এরকম পরিবেশে মন ভালো লাগে না। প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়ের জন্ম দেওয়া যে কতবড় অভিশাপ ভাবলে ভয় করে।

হুইল চেয়ারে বসা মেয়েটি এক হাতে টেডি বেয়ার চেপে ধরে অন্য হাতে মহিলাটিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। স্যান্ডউইচ ফেলে দিচ্ছে। মহিলা নীপাকে জিজ্ঞেস করলেন—"ক্যারট্ কেক খাবেন? আমি বাড়ি থেকে করে এনেছি।"

ওঁর আগ্রহ দেখে নীপা অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্লেটে এক টুকরো কেক তুলে নিল। ভদ্রতা করে জিজ্ঞেস করল—"আপনি এখানে কাজ করেন?"

—"না। আজ জেসীর মেমোরিয়াল সার্ভিসে এসেছিলাম। এ আমার মেয়ে ডনা। বারো বছর হল ক্লেটন হাউসে আছে। জেসী ছাড়া কারুর কাছে খেত না। চান করত না। এখন খুব মুশকিল হয়েছে। সব সময় জেসীকে খুঁজছে। আজ মেমোরিয়াল সার্ভিসের সময় ছবিটা দেখে ভীষণ রেস্টলেস্ হয়ে যাচ্ছিল। মাম্, মাম বলে ডাকার চেষ্টা করছিল। দেখুন না, লাঞ্চ খাওয়াতেই পারছি না।"

—"ওর বয়স কত?"

—"প্রায় চল্লিশ হল। অনেক বছর বাড়িতে রেখেছিলাম। তারপর আমার হাসবেন্ডের স্ট্রোক হল। মেয়েটাকে সারাক্ষণ দেখাশোনা করতে পারছিলাম না। এক বাড়িতে দুটো মানুষ হুইল চেয়ারে। আমার বয়সও তো কম হল না। নিরুপায় হয়ে ডনাকে কম খরচের এই গ্রুপ হোমে রেখেছি। এর বেশি অ্যাফোর্ড করার ক্ষমতা আমার নেই।"

—" আপনাকে মা বলে চিনতে পারে না? অথচ মাম্ শব্দটা তো বলে! কে শেখাল?"

মহিলা ম্লান হাসলেন—"খুব ছোটবেলায় ব্রেন ড্যামেজ হয়েছিল। ডেভেলপ্‌মেন্টালি ডিসএবল্‌ড্ হলেও মা, বাইবাই, ইয়া, নো—এরকম কয়েকটা শব্দ বলতে পারে। তেষ্টা পেলে ইশারায় বুঝিয়ে দেয়। খুশি হলে জোরে জোরে হাততালি দেয়। ওর সঙ্গে এই আমাদের কমিউনিকেশনের ভাষা।"

ওদের কথার মাঝখানে মণীশরা ঘরে এল। শার্লি ওদের দুই ভাইকে ক্লেটন হাউস ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন। তারপর বারান্দায় দাড়িয়ে লাঞ্চ সেরে ওরা এবার কফি নিতে এসেছে। ক্যাথীকে না দেখে আশীষ জিজ্ঞেস করল—" তুমি একলা বসে আছো? ক্যাথী কোথায় গেল?"

নীপা সামান্য হাসল—" আমি তো একলাই। অন্যদিকে তোমরা তিনজন। অবাক হচ্ছো কেন?"

আশীষ বলল—"স্ট্রেঞ্জ! ক্যাথী গেল কোথায়? কোনো ঘরেই তো দেখলাম না!"

মণীশ বলল—"আমি কিন্তু একবার ওকে ড্রাইভ-ওয়েতে যেতে দেখলাম। হাতে একটা ব্যাগ নিয়ে যাচ্ছিল। তুই বেরিয়ে একবার দেখে আয় না।"

—"চলো একসঙ্গেই বেরোই। সাড়ে-বারোটা বাজে। বাড়ি পৌঁছাতে আরো আধ ঘণ্টা। বউদি, উঠে পড়ো।"

তখনই দরজার কাছে ক্যাথীর গলা পাওয়া গেল। কাদের "গুডবাই" বলতে বলতে আসছে । ঘরে ঢুকে ওদের বলল— " এখানে মার কয়েকটা জিনিস ছিল। গাড়িতে রেখে এলাম। তোমরা আবার কফি নিয়ে বসলে কেন?"

নীপা সেই মহিলাকে দেখিয়ে বলল—"ক্যাথী, তুমি ওঁর তৈরি ক্যারট কেক্‌টা অন্তত খাও। খুব ভালো খেতে হয়েছে।"

ক্যাথী এক টুকরো কেক ফয়েল্ পেপারে মুড়ে নিলো। ডনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল—" হাই ডনা। বাই বাই ডনা——" ডনা অদ্ভুতভাবে চেয়ে রইল। তার মা শুধু বললেন—" হোপ্ টু সী ইউ সাম্ ডে।"

ক্লেটন হাউস থেকে ফিলাডেলফিয়ার ঘিঞ্জী এলাকা পেরিয়ে আশীষদের বাড়ি পৌঁছাতে আধঘণ্টার বেশি সময় লাগল। শহরের উত্তরদিকে মেলরোজ পার্কে ওরা অনেক বছর আছে। আশীষের অফিস ফিলাডেলফিয়ার ডাউন টাউনে। ক্যাথী কাজ করে ওখানকার থমাস

জেফারসন হসপিট্যালে। রেজিস্টার্ড নার্স। ছেলে মেয়ে না থাকায় ওদের আর বড় বাড়ি কেনার ইচ্ছে হয়নি। ছোট একতলা বাড়িটাতেই রয়ে গেছে।

জয়শ্রী ওদের সঙ্গে থাকতেন। যদিও সারাটা দিন ওঁর ক্লেটন হাউসেই কেটে যেত। বহুদিন ধরে কমিউনিটি সার্ভিস করতে করতে ওটাই হয়ে গিয়েছিল দ্বিতীয় ঘরবাড়ি। হাসপাতালে ক্যাথীর দিনের বেলার শিফ্‌ট থাকলে জয়শ্রীকে সকালে ক্লেটন হাউসে নামিয়ে দিয়ে কাজে চলে যেত। বিকেলে উনি বাস্‌-এ ফিরতেন। ক্যাথীর নাইট শিফ্‌ট থাকলে ওঁকে দু'বেলা বাস্‌-এ যাতায়াত করতে হত। ক-দিন আগেও জয়শ্রী বাড়ি থেকে দশ মিনিট হেঁটে গিয়ে বাস্‌ ধরেছেন। ব্লাড-প্রেশার ছাড়া আর তেমন কোনো অসুখ বিসুখ ছিল না। বাহাত্তর বছর বয়সেও বেশ শক্ত সমর্থ ছিলেন।

একদিন সকালের দিকে ক্লেটন হাউসের দোতলার সিঁড়ি থেকে জয়শ্রী মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। তখন শার্লি বাজার করতে বেরিয়েছেন। বোধবুদ্ধিহীন মানুষগুলোর কাউকে খবর দেবারও ক্ষমতা নেই। শুধু ডনার অস্বাভাবিক গোঙানির মতো চিৎকার শুনে রাস্তা থেকে মেইলম্যান্‌ ছুটে এসেছিল। সে-ই অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করে জয়শ্রীকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিল। খবর পেয়ে আশীষ আর ক্যাথী যখন পৌঁছাল, তখনও জয়শ্রীর জ্ঞান ফেরেনি। সন্ধের দিকে অবস্থা আরো খারাপ হল। চব্বিশ ঘণ্টা পার হবার আগেই ম্যাসিভ স্ট্রোকে জয়শ্রী মারা গেলেন।

মণীশ আর নীপা সে সময় হিউস্টনে ছিল না। মেডিটেরেনিয়ান ক্রুজ শীপে গ্রিস আর টার্কি বেড়াতে গিয়েছিল। গ্রিসের স্যান্‌টেরিনি আয়ল্যান্ডে জাহাজে ফোন করে আশীষ ওদের খবরটা জানিয়েছিল। মণীশদের জাহাজ অ্যাথেন্সে ফিরে আসতে সময় লাগল। ওরা পরশুর ফ্লাইটে হিউস্টন পৌঁছে গতকাল ওখানে মন্দিরে মার পারলৌকিক কাজ করেছে। আজ ভোরের প্লেন ধরে ফিলাডেলফিয়া এসেছে। আশীষদের কাছে দু'দিন কাটিয়ে ফিরে যাবে।

বাড়িতে পৌঁছে ক্যাথী জয়শ্রীর সেই ব্যাগটা বসার ঘরের একপাশে এনে রাখল। আশীষ ওদের গেস্টরুমে মণীশদের ছোট সুটকেসটা রেখে এসে জিজ্ঞেস করল—"মার ব্যাগটা কোথায় রাখব? ওঁর ঘরের ক্লসেটেই থাক?"

ক্যাথী মাথা নাড়ল—" না। আগে খুলে দেখি কী আছে। লাঞ্চ-বক্স-টক্স আছে বোধহয়। এনি ওয়ে, নীপা, ইউ মাস্ট বী ভেরি টায়ার্ড। কিন্তু লাঞ্চ তো ঠিক মতো হল না। আমি একটু খাবার করে রেখেছিলাম।"

আশীষ সোফায় গা এলিয়ে দিল—" হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে সব বার করো। দাদা, তোমাকে বীয়র দেবো?"

মণীশ হাই তুলল—"ঘুম ঘুম পাচ্ছে। দে একটা বীয়র। ক্যাথী কী খাবার বানিয়েছে দেখি। ওখানে জাস্ট একটা ছোট স্যান্ডউইচ নিয়েছিলাম।"

নীপা বলল—"ক্যাথী তাও নেয়নি। আসলে এত ডিপ্রেসিং এন্‌ভায়রনমেন্টে বসে খেতে ইচ্ছে করে না।"

ক্যাথী চলে যাবার মুহূর্তে ফিরে দাঁড়াল। ওর গলার স্বর বিষণ্ণ শোনাল—" মাও প্রথম প্রথম তাই বলতেন। বাড়ি থেকে খাবার সঙ্গে দিতাম। খেতে পারতেন না। ওঁকে তো প্রথম

দিন থেকে স্টেট ইনস্টিটিউশনে পাঠিয়েছিল। ডেপেলপ্‌মেন্টালি ডিস্‌এবলড্‌দের হ্যান্ডল্‌ করার মতো শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, মায়া মমতা ক'জনের থাকে? মারও ছিল না। ওদের চান করানো, মুখ ধোওয়ানো, বাথরুমে নিয়ে যাওয়া, নোংরা ডায়াপার বদলানো সব করতে হত। মার খুব ঘেন্না করত। ওরা হঠাৎ রেস্টলেস্‌ হয়ে উঠলে মা ভয় পেতেন। অথচ চলে আসার উপায় নেই। কোর্টের অর্ডারে ছ' মাসের কমিউনিটি সার্ভিস করতেই হবে।"

আশীষ দীর্ঘঃশ্বাস ফেলল। ক্যাথীকে বলল—" আর এ সব আলোচনা ভালো লাগছে না। দাদা, বউদিকে একটু রিল্যাক্স করতে দাও। খাবার রেডি করো। বউদি, তোমাকে কি ড্রিংক দেব বলো। রেড ওয়াইন নেবে?"

নীপা উঠে পড়ল—"না; কিচ্ছু দিতে হবে না। আমি ক্যাথীর সঙ্গে কিচেনে যাচ্ছি। কোল্ড ড্রিংক নিয়ে নেবো।"

ওরা রান্নাঘরে গেল। আশীষ বেস্‌মেন্টে নেমে ফ্রিজ থেকে বীয়রের বোতল বার করল। ওপরে এসে দেখল মণীশ সোফায় মাথা হেলিয়ে চোখ বন্ধ করে আছে। কপালের দিকে মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে। একটি-দুটি বলিরেখার আঁচড়। ক্লান্ত, বিষণ্ণ মুখ। চোখের কোণে জলের অস্পষ্ট দাগ। আশীষের সাড়া পেয়ে যেন আচ্ছন্নতার ঘোর থেকে চেতনায় ফিরে এল—" কিরে! ঘুমিয়ে পড়েছিলাম নাকি?"

আশীষ হাত বাড়িয়ে দিল—" ওঠো। ক্যাথী খেতে দিয়েছে। খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ো। ইউ নীড রেস্ট্‌।"

বিকেলের দিকে মণীশের যখন ঘুম ভাঙল, ঘরে পড়ন্ত সূর্যের ম্লান আলো ছড়িয়ে আছে। বাড়িটা আশ্চর্য রকমের নিস্তব্ধ। কতক্ষণে ঘুমিয়েছে মণীশ? শৈশব স্মৃতির শাম্পান ভাসিয়ে নিয়ে ঘুমের অতলগর্ভে কোথায় তলিয়ে গিয়েছিল। ছেঁড়া ছেঁড়া স্বপ্নের মতো বহরমপুরের গঙ্গার ঘাট। গোরাবাজার, ডেভিস রোডে মামার বাড়ি—অথচ স্বপ্নের মধ্যে মাকে কোথাও খুঁজে পেল না। মার কি বহরমপুরের কথা মনে পড়ত? কত বছর মা দেশে যায়নি। নিজের ভাই বোনেদেরও কি দেখতে ইচ্ছে করত না? নীপা হয়ত ঠিকই বলে। এই বাড়ির চার দেওয়ালের বাইরে ক্লেটন হাউসের মানুষগুলো ছাড়া আর কোথাও মার কোনো বন্ধন ছিল না।

ঘরের দরজা খুলে নীপা ঢুকল—"বাবাঃ কি ঘুম তোমার। আমরা কতক্ষণ ধরে গল্প করে যাচ্ছি। সন্ধে হয়ে গেল। এবার উঠে পড়ো"।

পেছনে আশীষের গলা—"ঘুমটা দরকার ছিল। তিন উইক ধরে তো সমানে ট্র্যাভ্‌ল করছ। সাইট-সীইংয়ের ঠেলায় ভেকেশনও শেষে টায়ারিং হয়ে যায়।"

মণীশকে চা দিয়ে ক্যাথী জিজ্ঞেস করল—"আজ কোথায় ডিনারে যাবেন বলুন। থাই, সী-ফুড, ইটালিয়ান? ডাউন টাউনে ভালো ভালো রেস্টোরেন্ট আছে।"

মনীশ হাসল—"হাউ অ্যাবাউট ফিলিপিনো ফুড? তোমার দেশের স্টাইলে একটা ফিশকারি বানিয়ে ফ্যালো। সঙ্গে ভাত।"

—" আরে, সেও আমার বউ রেঁধে রেখেছে। ফিশকারি ডাল ফাল্‌ সব বানিয়েছে। কিন্তু ওগুলো নাকি কালকের জন্যে। কাল ওর হসপিট্যালে নাইট-শিফ্‌ট। সন্ধেবেলা চলে যাবে। তখন আমরা বাড়িতে ডিনার করবো।"

আশীষকে রান্নার ফিরিস্তি দিতে দেখে নীপা হেসে ফেলল—"রোজ রোজ অত ফিশ কারি

খাওয়ার দরকার কি? তোমরা দুই ভাই ঘুরে ফিরে সেই মাছ ভাত খেয়ে ছাড়বে! না, আজ আমরা বাইরে খাবো। ক্যাথীর চয়েস্ আর আমার ট্রিট্।"

মণীশ সায় দিল—"হ্যাঁ, নীপাই খাওয়াবে। জাহাজের ক্যাসিনোতে চারশো ডলার জিতেছে জানিস?"

—"রিয়েলি? তাহলে "ব্লু-ওশানে" ফোন করে রিজার্ভেশন করে দিই? জাহাজের রোজগার জলেই যাক্।"

ক্যাথী ওদের বাংলা রসিকতা বুঝতে পারছিল না। তবে ব্লু-ওশান নামে সী-ফুড রেস্তোরাঁয় যাওয়া হবে শুনে ওদের তৈরি হবার জন্যে তাড়া দিল।

ফিলাডেলফিয়ার ডাউন টাউন থেকে ডিনার সেরে বাড়ি আসতে রাত প্রায় সাড়ে-এগারটা হল। নীপা আর জেগে থাকতে পারছিল না। এমনিতেই সারাদিনের ক্লান্তি। তার ওপর দু' গ্লাস রেড ওয়াইন খেয়ে চোখ ঘুমে ভারী হয়ে আসছে। মণীশরা আবার ফ্যামিলি রুমে টি ভি চালিয়ে বসেছে দেখে ও ক্যাথীকে বলল—" আমি আর তোমাদের সঙ্গে গল্প করতে বসছি না। খুব ঘুম পাচ্ছে——।"

—" তুমি শুতে যাবে না? কাল নাইট শিফ্ট আছে বলছিলে? মণীশ তো আশীষের সঙ্গে টি ভি খুলে বসল। কতক্ষণে ওরা শুতে যায় দ্যাখো।"

ক্যাথী গেস্টরুমে দুটো জলের গেলাস রাখতে রাখতে উত্তর দিল—" কাল তো রবিবার। সকালে ওঠার তাড়া নেই। আশীষ হয়তো দাদার সঙ্গে একটু বেশি সময় কাটাতে চাইছে। কত বছর তোমরা একসঙ্গে আসোনি। আমরা হিউস্টনে গেলে তবে দেখা হত। আশীষ তোমাদের খুব মিস্ করত——।"

নীপার গলায় ক্ষোভ ঝরে পড়ল—"জানি। আর, সব কিছুর জন্যে আমাকে দোষ দেওয়া হত। অন্যায় দেখে চুপ করে থাকতে পারিনি, সেটাই আমার দোষ। ক্যাথী, আমি কিন্তু তার জন্যে এতটুকু রিগ্রেট করি না। নিজের জেদের জন্যে মা ছেলেদের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট করতে চেয়েছিলেন। মণীশকে কম অপমান করেছেন?"

উত্তেজনায় নীপার শরীর কাঁপছিল। হঠাৎ করে কেন যে পুরোনো ঘটনাগুলো মনে পড়ে যায়। আজ সকাল থেকে শাশুড়ির মহত্বের কথা শুনতে শুনতে কি এরকম বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া হল? আজ সারাদিন ধরে শুধু মণীশ নয়, আশীষ এমনকি ক্যাথীও যেন ওকে বোঝাতে চাইছে মার জীবনে বিরাট উত্তরণ ঘটেছিল। হতে পারে, উনি শেষজীবনে কিছু ভালো কাজকর্মে জড়িয়ে ছিলেন। তা বলে আগের ঘটনাগুলো মিথ্যে হয়ে যায়নি। তবু যদি ওঁর মনে সেরকম অনুতাপ বোধ থাকত——না, নীপার পক্ষে সব কথা ভুলে গিয়ে ওঁকে মহিয়সী নারী ভেবে নেওয়া সম্ভব নয়।

নীপা নিজেকে সংযত করল—" সরি, আমার এ সব কথা বলা উচিত নয়। আসলে হঠাৎ করে কেমন একটা গিল্ট ফিলিং হয়। ভাবি, মণীশকে হয়তো সত্যিই আমি ওর ফ্যামিলি থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিলাম। আর তখন নিজেকে জাস্টিফাই করতে গিয়ে তিক্ত স্মৃতিগুলো ফিরে আসে।"

ক্যাথী শান্ত গলায় উত্তর দিল—"নীপা ট্রুথ্ রিভীল্স ইটসেল্ফ! তুমি যদি মার সম্পর্কে মণীশকে সেদিন কিছু নাও বলতে, একদিন আমাদেরই জানাতে হত। এখানে যা ঘটেছিল

সবই তো জানো। অকারণে নিজেকে দোষী ভেবে কষ্ট পেয়ো না। অনেক রাত হয়েছে। ঘুমোবার চেষ্টা করো। গুড নাইট।"

ক্যাথী গেস্টরুমের দরজা টেনে দিয়ে ফ্যামিলি রুমে চলে এলো। টি ভি চলছে না। ওরা তখনও বসে বসে গল্প করছে। ক্যাথীকে দেখে আশীষ জিজ্ঞেস করল—"বউদি কি শুয়ে পড়ল? তোমারও ঘুম পাচ্ছে নাকি?"

—"হ্যাঁ। এবার শুতে যাবো। তার আগে মার ব্যাগটা একটু খুলে দেখি। সোশ্যাল সিকিওরিটি কার্ডটা বোধহয় ওখানেই পাবো।"

ক্যাথী ব্যাগ খুলে জিনিসপত্র বার করছিল। জয়শ্রী রোজ এক প্রস্থ বাড়তি জামাকাপড় নিয়ে যেতেন। রুগিদের চান করানো খাওয়ানোর সময় ঢোলা মতো সোয়েট স্যুট পরে নিতেন। বাড়ি ফেরার সময় আবার সকালের শার্ট প্যান্ট। গরমকালে লম্বা ঝুলের স্কার্ট ব্লাউজ। প্রায় সারা বছর সোয়েটার গায়ে দিতেন।

ক্যাথী ব্যাগ খুলে লাঞ্চ-বক্সটা খুঁজে পেল না। হয়তো বাক্সের ভেতর খাবার-দাবার পচে গিয়েছিল। পরে কেউ বাক্স সুদ্ধু ফেলে দিয়েছে। ছাই ছাই রঙের সোয়েট প্যান্ট আর শার্টটা পাওয়া গেল। খয়েরি কার্ডিগানে চেনা কোলোনের গন্ধ। ছোট প্ল্যাস্টিকের ঠোঙায় টুকিটাকি জিনিস। কয়েকটা ওষুধ। হাতে মাখার ক্রিমের টিউব। সবুজ খাপের মধ্যে পড়ার চশমা। পেন, নোটবই, বাড়ির চাবি। প্লাস্টিকের খাপে রাখা ডলারের নোট। ওখানেই জয়শ্রীর সোশ্যাল সিকিওরিটি কার্ডটা পাওয়া গেল। সঙ্গে দুটো ছবি। একেবারে তলায় মোটা মতো সেই খাতাটা। ক্যাথীই ঐ স্পাইর‍্যাল নোটবুকটা কিনে এনেছিল।

মণীশ জিজ্ঞেস করল—"মাকে কি ক্লেটন হাউসে কিছু অফিস ওয়ার্ক করতে হত?"

ক্যাথী কথাটা খেয়াল করল না। প্ল্যাস্টিকের খাপ থেকে ছবি দুটো বার করে মণীশের হাতে দিল। ঋত্বিক আর রোহনের কলেজ গ্র্যাজুয়েশনের ছবি। মণীশের মনে পড়ল ছেলেদের গ্র্যাজুয়েশনের সময় ওরা প্রিনস্টনে এসেছিল। ফিলাডেলফিয়া থেকে আশীষ আর ক্যাথীও গিয়েছিল। সেই গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনির ছবি।

ক্যাথী বলল—"মা ওঁর টুইন গ্র্যান্ডসন্‌দের নিয়ে বেশ প্রাউড ছিলেন। ক্লেটন হাউসের ভলেনটিয়াররা সবাই রিক্ আর রণের কথা জানে। মা তো মাঝে মাঝে ওদের ফোনও করতেন।"

মনিশ ছবি দুটো টেবিলে রাখতে রাখতে হঠাৎ শ্লেষের ভঙ্গিতে বলল—" নাতিদের জন্যে প্রাউড ছিলেন কিনা জানি না। তবে অ্যাফেক্শন ছিল বলে তো বুঝিনি। আমাদের ওপর এত রাগ যে ছোট বাচ্চা দুটোকেও দেখতে চাইতেন না। পরে বাইরের লোকেদের কাছে নাতির ছবি দেখাতেন। সেটা এক ধরনের শো-অফ্। রয় ফ্যামিলির অ্যাচীভমেন্ট দেখাতে চাইতেন। কিন্তু মার তাতে কোনো ক্রেডিট নেই।"

ক্যাথী থতমত খেয়ে গেছে। আশীষ দাদাকে বোঝাতে চাইল—"ক্রেডিট আমাদেরও নেই। তা বলে রিক, রণের কেরিয়ার অ্যাচীভমেন্টের কথা লোককে বলব না? দাদা, তুমি মার সাইকোলজিক্যাল অ্যাস্পেক্টটা বোঝার চেষ্টা করো। নাতি নাতনীর গল্প করাটা হচ্ছে বুড়িদের ফেভারিট টপিক। মা সিনিয়র সিটিজেন সেন্টারে যেত। ক্লেটন হাউসের নানা প্রোগ্রামে যেত। কিন্তু নাতি নাতনীর গল্প পাবে কোথায়? এ বাড়িতে তো তারা নেই? মা

ক্যাথীকে মাদুলি-টাদুলি পরিয়েও তাদের আনতে পারেনি। তখন রিক আর রণের ছবি দেখিয়েই নিশ্চয়ই গল্প টল্প চালিয়ে যেত। কে জানে?"—কথার শেষে আশীষ যেন জোর করে হেসে উঠল।

মণীশ বুঝতে পারছিল আশীষ তার স্নিগ্ধ কৌতুকবোধ নিয়ে শুধু তুচ্ছ ঘটনা নয়, জীবনের গভীর অভাব বোধও ভুলে থাকার চেষ্টা করে। মার সম্পর্কেও ওর দৃষ্টিভঙি অন্যরকম। কয়েক মুহূর্ত ভাই-এর মুখের দিকে চেয়ে থেকে মণীশ বলল—"তোর অ্যাচীভ্‌মেন্টও কম নয়! আমরা কখনো জাজমেন্টাল হয়ে গিয়ে কমপ্যাশন হারাই। কখনো কমপ্যাশনের আবেগে বিচার বুদ্ধি হারিয়ে ফেলি। বাট ইউ নেভার লস্ট্ ইয়োর ব্যালেন্স।"

সোমবার সকালে আশীষ ফিলাডেলফিয়া এয়ারপোর্টে নীপাদের পৌঁছে দিয়ে অফিস চলে গেল। ক্যাথী গত রাত থেকে হসপিট্যালে নাইট ডিউটিতে। কাল সন্ধেবেলায় কাজে যাওয়ার সময় ওদের 'গুডবাই' জানিয়ে গেছে।। তার আগে দুপুরের দিকে নীপাকে কয়েকটা স্পাইর‍্যাল নোটবুক দিয়েছিল।

খাতাগুলো কেন দিচ্ছে নীপা বুঝতে পারছিল না। ক্যাথী বলেছিল ওগুলো জয়শ্রীর লেখা ডায়েরী। এক সময় ওঁর খুব ডিপ্রেশন হতো। চিকিৎসা করাতে হয়েছিল। ওষুধপত্রের সঙ্গে সাইকোথেরাপি। তখন সাইকোথেরাপিস্ট জয়শ্রীকে ডায়েরি লিখতে বলতেন। মনের মধ্যে যেসব ভাবনা আসে, সুখ দুঃখের অনুভূতি হয়, তাকে লিখে মন হালকা করতে উপদেশ দিতেন। রোজ না হোক, সারা সপ্তাহে অন্তত কয়েক লাইন। সেই থেকে জয়শ্রী মাঝে মাঝে খাতায় কিছু লিখতেন। এত বছরে বেশ কয়েকটা খাতা জমে গেছে। বাংলায় লেখা। ক্যাথীর পক্ষে পড়ে দেখা সম্ভব নয়। নীপা যদি চায়, তো দু' একটা নোটবুক নিয়ে যেতে পারে। আশীষও তাই বলেছে। নীপা আর ক্যাথীর মুখের ওপর না বলতে পারেনি। তিনটে লাল রঙের স্পাইর‍্যাল নোটবুক এখন ওদের সঙ্গে হিউস্টন চলেছে।

প্লেনে আড়াই ঘণ্টার পথ মনীশ খানিকক্ষন ঘুমিয়ে কাটালো। তারপর খবরের কাগজ নিয়ে বসল। ডোমেস্টিক ফ্লাইটে ইদানীং খাবার-টাবার বিশেষ দেয় না। তাও কন্টিনেন্টাল ব্রেকফাস্ট দিয়েছে। নীপা কফি খেতে খেতে ছোট্ট জানলা দিয়ে আকাশ দেখছিল। অনেক নীচে সবুজ পাহাড়ের আঁকাবাঁকা সারি। হালকা নীল সুতোর মতো নদীর রেখা। ভরা গ্রীষ্মেও এদিকের মাঠ ঘাট গাছপালা কা সতেজ সবুজ। আর প্লেন যখন টেক্‌সাস পৌঁছাবে, নীচের টোপোগ্র্যাফীটাই বদলে যাবে। তবু এদিকের পাহাড়, নদী আর ঝর্ণার রাজ্য ছেড়ে সমতলের ঐ শুকনো, গরম শহরটায় পৌঁছোনোর জন্যে নীপা ব্যস্ত হয়ে উঠছিল। আমেরিকায় ওর ঘর বাড়ি বলতে হিউস্টনের সেই পুরোনো শহরতলী অঞ্চল।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নীপা বলল—"এখনও প্রায় একঘণ্টা। ক'দিন ধরে যা হেকটিক গেল, এবার বাড়ি বাড়ি মন করছে। আজকাল অন্য জায়গায় বেশি দিন ভালো লাগে না।"

মণীশ খবরের কাগজের পাতা ভাঁজ করতে করতে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল—"তাহলে সামনের বছর সাউথ আমেরিকা ট্রিপটা বাদ দাও। কয়েক হাজার ডলার বেঁচে যাবে।"

নীপা হাসল—"তার আগে মনে হচ্ছে স্যানফ্র্যানসিস্‌কো যেতে হবে। রিক চাইছে আমার এবার বিদ্যার বাবা, মার সঙ্গে দেখা করি।"

—"কেন? তারা হিউস্টনে আসুক না। মেয়ের বাড়ির লোকেরাই তো আগে দেখা করতে

আসে। হোল আয়েঙ্গার ফ্যামিলিকে নভেম্বরে থ্যাংকস গিভিং-এর সময় ইনভাইট করে দাও।"

—" হ্যাঁ! টার্কির বদলে ছেলেদের ভেজিটেরিয়ান খাওয়ালে মারতে আসবে! তার চেয়ে আমরা যাবো। তোমার ফেভারিট মেড়ু বড়া-টড়া খেয়ে আসবে।"

খানিকক্ষণ বাদে প্লেন নামলো। হিউস্টন এয়ারপোর্টের বাইরে গরম হাওয়ার হল্‌কা। একশো দু' ডিগ্রি টেমপারেচার। ওরা তাড়াতাড়ি লিমোজিনে উঠে পড়ল।

হিউস্টনে ফিরে সপ্তাহ খানেকও মণীশ বাড়িতে থাকল না। ওদের পেট্রোকেমিক্যাল কোম্পানির কাজে কুয়েতে যেতে হল। নীপার কমিউনিটি কলেজে গরমের ছুটি চলছে। মাঝে দু'দিনের জন্যে অ্যাটল্যান্টা থেকে ছোট ছেলে রণ্ এল। ও ওখানে "সেন্টারস্ ফর ডিসিস কন্ট্রোল"-এ ইন্‌ফেকশাস ডিসিস নিয়ে ফেলোশিপ করছে। এসে বলল ঠাকুমা মারা যাবার খবর শুনে বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। মণীশ সময় মতো কুয়েত থেকে ফিরতেই পারল না। দেখা না হলেও ছেলের সঙ্গে ফোনে কথা হল।

ঠাকুমাকে রণের ভালো করে মনেও নেই। কোন্ ছোটবেলায় দেখেছিল। তারপর কী সব ঝগড়া ঝাঁটি হল। ঠাকুমা আর কখনও হিউস্টনে এলেন না। ফিলাডেলফিয়ায় কাকার কাছে থেকে গেলেন। তখন দাদু আর বেঁচে নেই। দাদুকে ও এখানে ছোটবেলায় একবার দেখেছিল। তারপর ইন্ডিয়া ফিরে গিয়েছিলেন। ওঁদের সঙ্গে বাবা, মার সম্পর্ক নষ্ট হলেও কাকা মাঝেমাঝে হিউস্টনে আসতেন। একবার কাকা কাকিমার সঙ্গে ওরা দুই ভাই ডিস্‌নি ওয়র্ল্ড-এ ঘুরে এসেছিল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও কাকা ওদের ফিলাডেলফিয়া নিয়ে যেতে পারেননি। মার জেদের কাছে সবাই হার মেনে গিয়েছিল।

দু-তিন বছর আগে হঠাৎ ঠাকুমা ওদের দু' ভাইকে ফোন্ করলেন। একবার রিকের জন্মদিনে। একবার ক্রীসমাসে রণকে। কাকার বাড়ি থেকে মাঝে মাঝে এরকম ফোন করতেন। কথাবার্তা বিশেষ এগোত না। রণের ধারণা এতকাল পরে ঠাকুমার বোধহয় ওদের দেখার ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু দেখা আর হল কোথায়? ও নিজে অ্যাটল্যান্টায় ফেলোশিপ নিয়ে ব্যস্ত। রিক স্যানফ্র্যানসিস্‌কোয়। সময় থাক না থাক, ঠাকুমাকে হয়তো দেখতে যাওয়া উচিত ছিল। বাবা স্পষ্ট করে না বললেও সেরকম আভাস দিয়েছিলেন।

রণ নীপাকে জিজ্ঞেস করল—"ঠাকুমার মেমোরিয়াল সার্ভিস কেমন হল? কারা অ্যারেঞ্জ করল?"

নীপা ছেলের জন্যে কাটলেট ভাজতে ভাজতে জবাব দিল—"ঐ যেখানে ভলান্টারি কাজ করতেন ওরাই অর্গ্যানাইজ করেছিল। মেন্টালি ডিস্‌এবল্‌ভ লোকেদের গ্রুপ হোমে যারা ডোনেশন টোনেশন দেয় তাদেরও ডেকে ছিল। রণ্, তোদের ঠাকুমার নাম জানিস?"

রণ অবাক হল—"তুমি কোনোদিন বলেছিলে? অ্যাজ ফার অ্যাজ্ উই নো, বাবার মা হচ্ছেন ঠাকুমা। স্ট্রেঞ্জ! আমরাও কোনোদিন জিজ্ঞেস করিনি—! অথচ দাদুর নাম জানি। অসীম রয়।"

নীপা হাসল—"মেমোরিয়াল সার্ভিসে গিয়ে শুনলাম তোমাদের ঠাকুমার নাম জেসী।"

—" হোয়াট ডু ইউ মীন? তুমি ওঁর নাম জানতে না?"

—"জানব না কেন? কিন্তু উনি যে বুড়ো বয়সে জয়শ্রী থেকে জেসী রয় হয়েছিলেন সেটা জানতাম না।"

রণ কাঁধ ঝাঁকালো—"জাস্ট লাইক স্যাম মুখার্জি, মাইক ঘোষ অর অ্যান্ডি দাস। মা, তুমি তো জানো কেন এটা হয়। কেউ ভাবে আমেরিকানদের রিলেট করতে সুবিধে হবে। অ্যাসিমিলেশনের চেষ্টা ছাড়াও হয়তো একটা স্ট্রেঞ্জ কমপ্লেক্স কাজ করে। নাম বদলাতে না চাইলে ও কনফ্রন্ট করতে পারে না।"

—"কিন্তু তোমার বাবা, কাকা কেউ তো নাম চেঞ্জ করেনি।"

—"বিকজ, দে ডিড্ নট হ্যাভ দ্যাট কাইন্ড অফ্ কমপ্লেক্স! প্রফেশন্যাল সাক্সেস থেকে যে লেভেল্ অফ কনফিডেন্স্ ডেভেলপ্ করে, তাতে বাবা বলতে পারেন ডোন্ট কল্ মী জন্। বাট এভরী বডি ক্যান্ট্ রীচ দ্যাট লেভেল অফ কনফিডেন্স!"

নীপা বলল—"তোদের জেনারেশনে দেখছি ইন্ডিয়ান নামগুলো বেশ থেকে যাচ্ছে। সায়ন্তনী, দেবলীনা, সৌরভ, আমেরিকানরা তো পরিষ্কার উচ্চারণ করছে।"

—"না পারার কী আছে? তোমরা স্টেফানোপোলিস, ব্রেজিন্স্কী, বক্সেনবাউম বলতে পারলে, ওরাও রোহন, ঋত্বিক বলতে পারবে। তোমরাই আমাদের নিক্ নেম রণ, রিক রেখেছ। কিন্তু কলেজে, অফিসে আমি 'রোহন'। আমার নামটা তো অনেক ইজি। একজন মাইক্রোবায়োলজিস্ট্ আছে, নাম অশ্বিনী ট্যাংকামালী। সাম্ বডি ট্রায়েড টু কল হিম্ অ্যাজ "ট্যাংক"। অশ্বিনী তাকে "আশ্উইনি" বলতে শিখিয়েছে। ইউ জাস্ট ক্যান্ট্ গিভ আপ।"

নীপা বলে উঠল—"আমি তো সেটাই বলেছিলাম। তুই ঠাকুমার নাম বদলানোটা জাস্টিফাই করতে সেই এক কথাই বলছিস।"

রণ খাবারের প্লেট নিয়ে টেবিলে গিয়ে বসল। কয়েক মুহূর্ত মার দিকে চেয়ে থেকে প্রশ্ন করল—"হোয়াই আর ইউ মেকিং এ বিগ ইস্যু আউট অফ ইট? শি ওয়াজ অ্যান অর্ডিন্যারি উওম্যান। তুমি তো জানো ঠাকুমা কী কাজ করতেন। কেন করতে হয়েছিল তাও জানো। ইন্ডিয়ান আইডেন্টিটি নিয়ে প্রাউড হবার মতো কোনো কাজ যে করেননি, সেই দুঃখও তো ছিল?"

নীপা বুঝতে পারছিল রণ ওর মন্তব্যটা পছন্দ করেনি। পরিস্থিতি সামলে নেওয়ার চেষ্টা করল—"শেষপর্যন্ত হয়ত সে দুঃখ মিটেছিল। শি প্রুভড হারসেল্ফ। ক্লেটন হাউসে গিয়ে মনে হল সবাই ওঁকে রেসপেক্ট করত।"

রণের সেল ফোন বাজল। আলোচনাটা থেমে যেতে নীপাও স্বস্তি পেল। ঠাকুমার সঙ্গে রণের কোনো যোগাযোগ ছিল না। স্নেহ ভালোবাসার টান বলেও কিছু নেই। সে সম্পর্ক গড়ে ওঠার আগেই জয়শ্রী ওদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। এর পেছনে যে কারণ বা ঘটনাগুলো ছিল, সে কথা ওরা বড় হয়ে জেনেছে। তবু ঠাকুমার প্রতি অশ্রদ্ধা নেই। বরং দুঃখী মানুষ হিসেবে সহানুভূতি আছে। ছেলের এই মমত্ববোধটুকু নীপাকে স্পর্শ করল।

দু'দিন পরে রণ অ্যাটল্যান্টা চলে গেল। মণীশ কুয়েত থেকে ফিরেছে। নীপার কলেজ খোলার সময় হয়ে আসছে। নতুন সেমেস্টার শুরু হবার আগে এই দুটো তিনটে সপ্তাহ বেস্ট-সেলার বইগুলো নিয়ে বসেছে। এখন সু মংক্ কিড-এর লেখা "দ্য সিক্রেট লাইফ অফ বীইস্" নামে উপন্যাসটা পড়ছে।

ক'দিন ধরে অসহ্য গরম চলেছে। দুপুরে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে শুনে নীপা সকালের দিকে বাজারে গিয়েছিল। ঘণ্টা খানেক বাদে সুপার মার্কেট থেকে বেরিয়ে দেখল আকাশে

মেঘ ঘনিয়ে আসছে। দমকা হাওয়ার ধাক্কায় শপিং কার্টগুলো এধার ওধার চলে যাচ্ছে। নীপা তাড়াতাড়ি বাজারের ঠোঙাগুলো গাড়িতে তুলছিল। তখনই আকাশ ভেঙে ঝড় বৃষ্টি নামল।

সারাদিন ধরে অবিশ্রাম বৃষ্টি। সন্ধের পরে মণীশ ফিরল। নীপা তখন তাড়াহুড়ো করে খিচুড়ি নামিয়েছে। সকালে জলে ভিজে সর্দি সর্দি ভাব। উপন্যাসটাও ছাড়া যাচ্ছে না। সারা দুপুর বই নিয়ে কেটে গেছে। মণীশ চা খেয়ে জামাকাপড় বদলে নীচে এল। টিভি দেখতে দেখতে বলল—"এত বৃষ্টি অনেকদিন হয়নি। গরমটা কমল মনে হচ্ছে।"

নীপা রান্নাঘরে খাবার দিয়ে ডাকল। ঠিক এই সময় কতগুলো ফোন আসে। ইদানীং ইন্ডিয়ান টিভি চ্যানেলে ডিশ নেট-ওয়র্ক রোজ ফোন করে আবেদন নিবেদন করছে। চেনা শোনা অনেকেই বাড়িতে ই-টিভি, স্টার-টিভি এ সব নিয়েছে। মণীশের অত আগ্রহ নেই। এখন আবার মনে হচ্ছে কেউ একটা ফোন করেছে। মণীশ ফোন তুলে "ঠিক আছে'। ভেবে দেখব" বলে মাঝ পথে কথা থামিয়ে দিল।

খেতে বসে নীপা বসেছিল—"আজ রাত্তিরে বইটা শেষ করব। সাউথ ক্যারোলাইনার ব্যাক-গ্রাউন্ডে দারুণ একটা প্লট তৈরি করেছে। ওখানে যারা মৌচাক থেকে মধু আর মোম তৈরী করে তাদের একটা ছোট্ট সমাজ আছে। কালচার আছে। গল্পের মধ্যেও বিরাট সাসপেন্স...।"

মণীশ বলল—"তুমি আছো ভালো। আমার তো টাইম ম্যাগাজিনটাও উল্টে দেখার সময় হচ্ছে না। আজ একটা অফিসের রিপোর্ট শেষ করতে হবে। সারাদিন মিটিং-এর জ্বালায় রিপোর্ট লেখার সময় পেলাম না। কাল আবার সকালেই ব্রেক-ফাস্ট মিটিং। আর পারা যাচ্ছে না।"

রাতের দিকে বৃষ্টির বেগ কমে এল। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের আড়ালে অস্পষ্ট চাঁদ। বাগান থেকে ভিজে মাটির গন্ধ আসছে। জানলার কাছে টুপটাপ ঝরে পড়া জলের শব্দ শুনতে শুনতে নীপা বই পড়ছিল। হঠাৎ ফোন বাজল। মণীশ অফিসের কাজ নিয়ে বসেছে মানে নীপাকেই ফোনটা ধরতে হবে। বই রেখে রিসিভার তুললে ক্যাথীর গলা শুনল—"কেমন আছো? মাঝে আর কল্ করতে পারিনি...."একথা সেকথার পর ক্যাথী জিজ্ঞেস করল—"নীপা, তুমি মার নোট-বুকগুলো কি পড়ার সময় পেয়েছ?"

নীপার খেয়াল হল—" না ক্যাথী। আসলে মনেও ছিল না। মাঝে রণ এল। তারপর থেকে একটা না একটা ব্যস্ততা চলেছে।"

—"প্যাকেটটা কি খুলেছিলে? ওর মধ্যে ছোট্ট একটা খাম আছে। মা তোমাকে দিতে বলেছিলেন।"

নীপা অবাক হয়ে গেল—"সেদিন বলোনি তো? মা আমাকে চিঠি লিখেছিলেন? এত দিন পরে?"

ক্যাথী উত্তর দিল—"দ্যাট ওয়াজ নট এ লেটার। এনি ওয়ে, খামটা খুলে দেখো। সেই জন্যেই আজ ফোন করলাম। ভালো থেকো। গুড নাইট।"

নীপা ভাবছিল এত রাতে আবার প্যাকেট-ট্যাকেট খুলে বসবে কিনা। জয়শ্রী ওকে এত বছর বাদে কী লিখতে পারেন? ক্যাথী তো বলল সেটা চিঠিও নয়। তাহলে বারবার খুলে দেখতে বলছে কেন? ফিলাডেলফিয়াতেও তো খামটা হাতে দিতে পারত। নীপার কেমন কৌতূহল হল। গেস্টরুমের বুক শেলফ্-এর মাথা থেকে প্যাকেটটা নামিয়ে আনল।

মণীশ তখনও ওপরে আসেনি। নীপা প্যাকেট খুলে দুটো স্পাইর‍্যাল নোটবুকের পাতা

উল্টে দেখল। প্রত্যেক পাতার ওপর দিকে তারিখ দিয়ে দিয়ে জয়শ্রী ডায়েরি লিখেছেন। কোনো পাতায় তিনটে তারিখ। সেখানে একেক দিনে দু-চার লাইনের বেশি লেখেননি। একটা খাতার ভেতরে ছোট খামটা পাওয়া গেল। ওপরে বাংলায় নীপার নাম লেখা। খামের ওপর থেকে শক্ত মতো কিছু হাতে ঠেকছে। ছিঁড়ে ফেলার পর নীপা দেখল ভেতরে সরু সোনার চেন্-এ ঝোলানো তারের কাজের একটা লকেট। সঙ্গে মেরুন রঙের মীনে করা পাশার মতো দুটো দুল। তখনই ভাঁজকরা কাগজটা চোখে পড়ল। ভেতরে লেখা—

ঋত্বিক আর রোহনের বউদের জন্যে আমার বিয়ের সময়কার দুটি সামান্য গয়না রেখে দিলাম।

জয়শ্রী রায়

বাইরে ঝরঝর বৃষ্টির শব্দ। চরাচর গভীর অন্ধকারে ডুবে আছে। রাতের এই নিস্তব্ধ মুহূর্তে নীপা তার পরিপার্শ্ব থেকে কোথাও হারিয়ে যাচ্ছিল। নিরন্তর প্রবহমান জীবনস্রোতের বিপরীত টানে ভেসে যাওয়ার মতো এক অনুভূতি তাকে ফেলে আসা সময়ে ফিরিয়ে নিয়ে চলেছিল।

তখন মণীশ, নীপা রিচমন্ডের ওই বাড়িতে নয়, হিউস্টন শহরেই থাকত। নীপা জিওগ্র্যাফিতে মাস্টার্স করে হাইস্কুলে পড়াছিল। ঋক, রণ সবে কিন্ডারগার্টেনে ঢুকেছে। সে বছর খড়্গপুর থেকে মণীশের বাবা মা এলেন। টেক্সাসের গরমে না এসে সেপ্টেম্বরের শেষে এলেন। ক্রিসমাস কাটিয়ে ফিরে যাবেন। অসীম রেলওয়ে থেকে রিটায়ার করেছেন। চারমাসের প্লেনের টিকিটের মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত থেকে যাওয়ার কোনো অসুবিধে নেই।

ওঁরা আসার পর দিনগুলো বেশ কাটছিল। মণীশরা মাঝে মাঝে ওঁদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। গালফ্ অফ মেক্সিকোয় গিয়ে সমুদ্র দেখাল। টেকসাসের স্যান অ্যান্টোনিও, অস্টিন ফোর্ট অ্যালামো ঘুরিয়ে আনল। মাঝে মাঝে বাঙালিদের বাড়ি নেমন্তন্ন থাকে। অসীম আর জয়শ্রীকে খাওয়ানোর জন্যে বন্ধুরা ডাকাডাকি করছে। অচেনা বাড়িতে আতিথেয়তা পেয়ে ওঁদেরও ভালো লাগছে। রণ, রিককে নিয়েও অনেকটা সময় কেটে যায়। এ ভাবেই মাস দেড়েকের মধ্যে দুর্গাপুজো এসে গেল। হিউস্টনের বাঙালি সমাজ তখনও এত বড় হয়নি। তবু বারোয়ারী দুর্গাপুজো শুরু হয়েছিল। মণীশ ক্লাবের ট্রেজারার। নীপা ফাংশানে গান গায়। রণ, রিক বাচ্চাদের সঙ্গে হুড়োহুড়ি করে বেড়ায়। পুজো দেখা, গান বাজনা, খাওয়া দাওয়া, আড্ডার মধ্যে দিয়ে নীপাদের তিনটে দিন আনন্দে কেটে যায়।

সে বছর জয়শ্রীকে পুজো কমিটিতে নেওয়া হল। ফল কাটা, নৈবেদ্য সাজানো, পুরোহিতের কাছে বসে জিনিসপত্র এগিয়ে দেওয়া, প্রায় সারাদিন কাজকর্মে সাহায্য করলেন। সন্ধে বেলা নাটকের আগে মেয়েদের চুল বেঁধে দিলেন। ড্রেস্-চেঞ্জের সময় উইংস্-এর পাশে থেকে শাড়ি-টাড়ি পরিয়ে দিলেন। এখানে পুজোতে বাঙালিরা বেশ গয়না পরে। জয়শ্রীর হাতে সরু সরু চারটে চুড়ি। গলায় বারোমেসে একটা চেন্। নীপা তাই ওঁকে নিজের ~~ব্রেক-সেট~~ নতুন চুড়ি আর পেনডেন্ট পরতে দিয়েছিল। ওদের চেনা রহিমা ভাবীর কাছ থেকে ঢাকাই জামদানী কিনে এনেছিল। বিদেশের পুজোতে মা ভালো শাড়ি, গয়না পরে এত উৎসাহ নিয়ে কাজকর্ম করছেন দেখে মণীশও খুশি হয়েছিল। কিন্তু পরদিন একটা বিশ্রী

ব্যাপার ঘটল। আগে কখনো এরকম হয়নি। অন্য সকলের মতো নীপারাও ভীষণ অবাক হয়েছিল। উৎসবের শেষ দিনে এ সব কথা আলোচনা করতে করতেই ওরা বাড়ি ফিরেছিল।

—"কী ব্যাপার? এ ঘরে খাতাপত্র খুলে বসে আছ? আমি তো ভাবলাম শুয়ে পড়েছ।"

মণীশকে ঘরের দরজায় দেখে নীপার চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল। সেই কখন থেকে চিঠিটা হাতে নিয়ে পুরোনো কথাগুলো ভাবছিল। এখন মণীশকে কি বলবে? লেখাটা পড়ে ও কষ্ট পাবে। হয়তো অনেকক্ষণ ঘুম আসবে না। ক্লান্ত মানুষটাকে এত রাতে কিছু জানানো দরকার ছিল না। কিন্তু এ মুহূর্তে নীপা অন্য কোনো কথা খুঁজে পেল না। গয়না দুটো হাতে নিয়ে বলল—"মার নোটবই-এর প্যাকেটে এগুলো পেলাম। সঙ্গে একটা চিঠি আছে। পড়ে দ্যাখো।"

চিঠিটা পড়ার পর মণীশ শুধু বলল—"রণ, রিককে একবার মার কাছে যেতে বলেছিলাম। দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুধু ঠাকুমার সঙ্গে দেখা করার সময় হল না।"

নীপা নোট বুকগুলো গুছিয়ে রাখতে রাখতে বলল—"রণেরও বোধহয় সে কথা মনে হচ্ছে। উনি যে হঠাৎ এভাবে চলে যাবেন, কে ভাববে বলো? অসুখ বিসুখের খবর পেলেও না হয় দেখে আসত।"

—"মানুষ হঠাৎ করেই চলে যায় নীপা। অসুখের খবর পেলেও বা কী করতাম? এখানে তো আনা যেত না। চিঠিতে যে কথাগুলো আন্ডারলাইন করেছেন, তাতেই বোঝা যায় মা কোনো কিছু ভুলতে পারেননি।"

নীপা উত্তর দিল না। অকারণ কথা বাড়িয়ে কী হবে। হার আর দুল দুটো শোবার ঘরের ড্রয়ারে রেখে দিল। জয়শ্রীর লেখা কাগজটা বাইরে পড়ে থাকল। মণীশকে ব্লাড-প্রেশারের ওষুধ আর জলের গেলাস এনে দিয়ে বলল—"এবার শুয়ে পড়ো। কাল অফিসে ব্রেকফাস্ট মিটিং আছে বলছিলে। ক'টায় বেরোবে?"

মণীশ ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে বলল—"সাড়ে-সাতটায়।"

নীপা বাথরুম থেকে ফিরে এসে দেখল মণীশ বালিশে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করে কিছু ভাবছে। আলো নিভিয়ে বিছানায় এসে মণীশের গায়ে হাত রাখতে ও নীপার দিকে সরে এল। বাইরে বৃষ্টি থেমে গেছে। অন্ধকার ঘরে নীপার মৃদু স্বর শোনা গেল—"ঘুমের চেষ্টা করো। শুধু শুধু এক কথা ভেবে মন খারাপ কোরো না। তোমার জীবনে তো ওঁর থাকা না থাকা দুইই সমান। চলে যাবার আগে চিঠিতেও শেষবারের মতো রাগ ঝাল মিটিয়ে নিলেন! আশ্চর্য! ক্যাথী না বললে আমি হয়ত খামটা খুঁজেও পেতাম না।"

মণীশ বলল—"ক্যাথী বাংলা জানে না বলে চিঠিটা তোমার হাতে এল। মা জানতেন আশীষ কিছুতেই এ সব কথা লিখতে দেবে না। নীপা হাসল—"ফিলিপিনো বউই শেষপর্যন্ত মার নিয়ারেস্ট পার্সন হয়ে উঠেছিল। মনে আছে, আশীষের বিয়ের পরেও কতবার বলেছেন ভুটিয়া মার্কা নার্সটাকে সে কোথা থেকে জোটাল?"

—"তুমি তো ভূগোলের টিচার। ম্যাপে ভূটান আর ফিলিপিন্‌স্‌-এর ডিসটেন্স্‌ দেখিয়ে দিলে পারতে।"

আরও খানিকক্ষণ গুন গুন করে কথা বলতে বলতে নীপা বুঝতে পারল মণীশ ঘুমিয়ে

পড়েছে। ওর ঘুম আসছিল না। এক সময় নিঃশব্দে উঠে গিয়ে শোবার ঘরের দরজা টেনে দিল। অন্ধকারে বারান্দায় দাঁড়িয়ে খেয়াল হল অর্ধেক পড়া উপন্যাসটা শোবার ঘরেই নাইট স্ট্যান্ডের ওপর রয়েছে। আবার ঘরে ঢুকতে গেলে মণীশ হয়ত জেগে যাবে। অথচ একটু বই-টই না পড়লে ঘুম আসতে চায় না।

নীপা গেস্টরুমে ঢুকে আলো জ্বালাতে জয়শ্রীর নোটবুকগুলো চোখে পড়ল। খুলে দেখার খুব যে আগ্রহ আছে তা নয়। তবু মাঝরাতে রিডিং মেটিরিয়েল্ হিসেবে শাশুড়ির আত্মকথা নিয়ে নীপা সোফায় শুয়ে পড়ল।

প্রথম পাতার সাল তারিখ থেকে বোঝা গেল—পনের বছর আগের লেখা। ওপরে একটা লাইন—জীবন আমার বিফলে গেল।

তারপর জয়শ্রী লিখেছেন—আসলে সব আমার অদৃষ্ট। ভগবান সারা জীবন বঞ্চনা করলেন। এদের অভাবের সংসারে বিয়ে হয়ে কেবল ত্যাগ স্বীকার করে গেছি। না একটা দামী শাড়ি কিনেছি, না একটা গয়না গড়িয়েছি। ওঁর কিনে দেবার সাধ্যই ছিল না। ঘাড়ে অত বড় সংসারের বোঝা। আমেরিকায় কেউ ভাবতে পারবে এক দঙ্গল ননদ দেওর নিয়ে ঘর করার কথা? একটা লোক রোজগার করবে। তার টাকায় বাকিরা খাবে, পরবে, ইস্কুল কলেজে পড়বে। আবার বিয়েও দিতে হবে। জয়া, বিজয়ার বিয়েতে কম টাকা ধার করতে হয়েছিল? তবু বাবার দেওয়া গয়নাগুলো দিইনি। তাহলে আর মণি, আশুকে হোস্টেলে রেখে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াতে পারতাম না। তখন সোনার দাম কত বেড়ে গেছে। যখনই টাকায় টান পড়েছে, একটা দুটো করে গয়না বিক্রি করতে হয়েছে। শাশুড়ির ক্যানসার হল। খরচের শেষ নেই। থাকার মধ্যে ক'গাছা চুড়ি আর সামান্য টুকিটাকি গয়না রাখতে পেরেছিলাম। মণির বিয়েতে ওর বউকে কি দেব? মণির টাকাতেই নেকলেস কিনে দিলাম। আমার নিজের গলায় সেই সরু পিত্‌পিতে হার। এই তো আমার সম্বল। আর নীপা? তার দু' খানা লকার। মণি দুবাই থেকে বউ-এর জন্যে ভারী ভারী সোনার সেট এনে দিয়েছে। দুঃখী মার কথা মনেও পড়েনি। আসলে মুখ ফুটে চাইনি তো কখনও। বউ বরং পুজোবাড়িতে আমায় ওর নতুন হার, চুড়ি পরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

হায় ভগবান! কেন যে পরের জিনিস পরতে গিয়েছিলাম। সেটাই যেন কাল হল। গয়নার লোভে কী শেষে পাগল হয়ে গেলাম। ডাঃ ব্রাউন, ক্যাথী, সবাই তো তাই বলে । এ রোগটা এক ধরনের পাগলামি। শুধু নীপা আর মণি তা বিশ্বাস করে না। নীপা বলল আমি নাকি চুরির মতলব নিয়ে গ্রিনরুমে ঢুকেছিলাম। সে জন্যে বাড়ি থেকেই তাড়িয়ে দিল। এত অপমান আর দুঃখ ওঁর সহ্য হল না। খড়গ্‌পুরে ফিরে গিয়ে একটা বছরও বাঁচলেন না। নীপার কি একটুও অনুতাপ হয় না? ডাঃ ব্রাউন বলেন মানুষকে ক্ষমা করলে শান্তি পাওয়া যায়। শান্তি কি আর এ জীবনে পাবো?"

লেখাটা যে পাতায় শেষ হয়েছে, তার নীচের দিকে আবার দু' লাইন লিখে কেটে দেওয়া। নীপা চেষ্টা করে পড়তে পারল—"এখানকার নদীর নাম ডেলাওয়্যার। গঙ্গার মতো চওড়া। রাধার ঘাট নেই। নৌকো নেই। কোনোদিন বহরমপুর যাওয়া হবে না।"

চশমার আড়ালে নীপার চোখ ঝাপসা হয়ে এল। দীর্ঘঃশ্বাস ফেলে খাতাটা বন্ধ করল। আজ এই পর্যন্তই থাক।

আগস্টের শেষ সপ্তাহে নীপার কলেজ খুলল। এই সেমেস্টারে সপ্তাহে তিনদিন পড়াচ্ছে। মাঝে একটা দিন সময় পেয়ে পুরোনো বন্ধু দোলনের কাছে গেল। দোলন এখন চাকরি করে না। নীপার ফোন পেয়ে লাঞ্চে চলে আসতে বলেছিল।

দোলনের বাড়িতে পৌঁছে দেখল ও তখনও ডেন্টিস্টের কাছ থেকে ফেরেনি। যে মেক্সিক্যান মহিলা ওর বাড়ি পরিষ্কার করে, সেই দরজা খুলে দিল। বলল দোলন বারোটার মধ্যে ফিরে আসবে বলেছে। নীপাকে কফি করে দিতে চাইছিল। "কিছু দরকার নেই" বলে নীপা একটা ম্যাগাজিন নিয়ে বসল।

দু-চার পাতা উল্টে, পড়ার ইচ্ছে হল না। বসে বসে সামনের দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলো দেখছিল। দোলনের দুই মেয়ের ছোট্ট বেলার ছবি। এখন তারা বিয়ে হয়ে একজন নিউইয়র্কে। একজন বস্টনে। টেবিলের ওপর দোলন আর অরুণাংশুর কোন্ একটা অ্যানিভার্সারির ছবি। তখন অরুণাংশুর মাথাভর্তি চুল। মাঝে কত বছর কেটে গেল!

বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ এতকাল পরে নীপার এ বাড়িতে প্রথম আসার দিনটা মনে পড়ল। দোলনের সঙ্গে বন্ধুত্ব দূরে থাক, তখন ওদের ভালো করে চেনাশোনাও হয়নি। তবু ফোন নম্বর জোগাড় করে, একটা বিশেষ প্রয়োজনে আসতে চায় বলে নীপা এখানে চলে এসেছিল। অরুণাংশু ভেবেছিল বোধহয় ডোমেস্টিক ভায়লেন্সের ব্যাপার। বর হয়তো মারধর করছে। নীপা তাই সাহায্য চাইতে আসছে। কিন্তু মণীশকে বাইরে থেকে দেখে তো এরকম ভাবাই যায় না! আর, যদি তাও হয়, তবে হিউস্টনে তো নীপাদের অনেক বন্ধু আছে। তাদের কাছে না গিয়ে নীপা এ বাড়িতে এল কেন? ওরা স্বামী, স্ত্রী একটু অবাকই হয়েছিল।

নীপা সেদিন বলেছিল—"আমি বেশিক্ষণ বসব না। ব্যাপারটা খুব পার্সোন্যাল। আমার শুধু একটা রিকোয়েস্ট। আজকের ঘটনাটা কাউকে প্লিজ বলবেন না। ইটস্ সো পেইনফুল অ্যান্ড সো এম্ব্যারাসিং...."বলতে বলতে লজ্জায় সংকোচে নীপার গলার স্বর ভেঙে গিয়েছিল।

ওর পিঠে হাত রেখে দোলন জিজ্ঞেস করেছিল—"কী হয়েছে নীপাদি? আসুন বেডরুমে গিয়ে কথা বলি।" দোলনেরও ধারণা নীপা হয়তো মণীশের ব্যাপারে কিছু বলতে চাইছে। অরুণাংশুর সামনে সহজ হতে পারবে না ভেবে অন্য ঘরে নিয়ে গেল। ওদের বিছানায় বসে নীপা তখনও যেন ধাতস্থ হতে পারছিল না। কাল থেকে সংসারের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। আজ ও জেদের বশে একাই চলে এসেছে। জীবনে কখনও এমন লজ্জাকর পরিস্থিতিতে পড়তে হবে ভাবেনি। এ মুহূর্তে কথা শুরু করতেও অসোয়াস্তি হচ্ছিল।

দোলন একটু অপেক্ষা করে থেকে আবার বলল—"কী হয়েছে বলুন না নীপাদি? বাড়িতে কোনো প্রব্লেম হচ্ছে?'

নীপা ওর হাত ধরল—"দোলন, এটা আমাদের ফ্যামিলির ব্যাপার। প্লিজ, কথা দাও বাইরের কাউকে জানাবে না।" দোলন ওকে আশ্বস্ত করার পর নীপা ব্যাগ খুলে একটা প্যাকেট বার করল। তার থেকে রুমালে মোড়া জিনিসটা বিছানায় রাখতেই দোলন চমকে উঠল। সারা ঘরে চেনা পারফিউমের গন্ধ ছড়িয়ে যাচ্ছে। রুমালটা চিনতেও সময় লাগেনি। ও অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল—"একি? এটা পাওয়া গেছে? আপনাকে কে দিল?" বলতে বলতে রুমালের ভাঁজ খুঁলে দোলন গয়নাগুলো দেখল। ওর হীরের দুল, মঙ্গলসূত্র, হাতের মোটা বালাটা পর্যন্ত ঠিক ঐ ভাবে রাখা আছে। পুজোর সময় নাটকের মেক-আপ নেওয়ার আগে গয়নাগুলো খুলে রুমাল

মুড়ে ব্যাগে রেখেছিল। বাড়ি ফিরে আর রুমালটা খুঁজে পেল না। ব্যাগ থেকে ডলারগুলোও কেউ তুলে নিয়েছে। পরদিন পুজোবাড়িতে গিয়ে খোঁজ করল। সারাদিন ধরে কয়েকবার মাইকে অ্যানাউন্স্ করাল। ব্যাপারটা যে চুরি, সে তো বোঝাই যাচ্ছে। গ্রীনরুমে কে এমন কাণ্ড করতে পারে ভেবে ওরা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। মনে বিশ্রী সন্দেহ আসছিল। তবু চেনাশোনা কেউ এ কাজ করতে পারে বলে বিশ্বাস হচ্ছিল না।

আর, এতদিন পরে নীপাদি গয়নাগুলো নিয়ে এসেছেন! দোলনের বিস্ময়ের ঘোর কাটছিল না—"আপনি রুমালটা কোথায় পেলেন? গয়নাগুলোও তো ইনট্যাক্ট্ আছে দেখছি!"

নীপা ক্ষুব্ধ স্বরে দিল—"আমাদের বাড়িতে ছিল। কাল একটা ড্রয়ারের মধ্যে পেলাম।"

—"তার মানে?"

—"এটুকু বিশ্বাস করো, আমি ওটা বাড়িতে নিয়ে যাইনি। কাল বিকেলে যখন হঠাৎ ড্রয়ারের নীচে দেখতে পেলাম, তখনও বুঝতে পারিনি। কিন্তু ওটা আমাদের কারুর রুমাল নয়, অন্য রকম পারফিউমের গন্ধ। তখন হাতে নিয়ে দেখি ভেতরে তিনটে গয়না। পুজোর সময় স্টেজে অ্যানাউন্স্ করছিল। তুমিও কতজনকে জিজ্ঞেস করছিলে। সব আমার মনে পড়ে গেল। তারপর থেকে কী যে কষ্ট আর অশান্তি শুরু হল। সারাটা রাত দু'জনে জেগে বসেছিলাম....."।

সেদিন দোলন সবই বুঝতে পেরেছিল। গ্রীনরুমে জয়শ্রী ওকে চুল বেঁধে দিয়েছিলেন। "সাজানো বাগান" নাটকে গ্রামের বউ সেজেছে বলে দু-তিনবার সাধাসিধে করে শাড়ি পরিয়ে দিয়েছিলেন। নাটকের সময়টা বেশির ভাগ গ্রীনরুমেই ছিলেন। দোলন যে গয়না খুলে ব্যাগে রেখেছে, সেও হয়ত দেখেছিলেন। কিন্তু কে ভাবতে পারে, ভদ্র ফ্যামিলির বয়স্কা এক মহিলা এ ভাবে গয়নাগাঁটি, টাকাপয়সা চুরি করতে পারেন!

নীপার মনে আছে দোলন সেদিন বলেছিল—"মণীশদার কথা ভেবে বড় খারাপ লাগছে। আমরা তো কতগুলো কনসেপ্ট্ নিয়ে বড় হই। মা, বাবা, মানে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, বিশ্বাস। সেখানে যখন আঘাত লাগে, সহ্য করা যে কী কঠিন!"

—"মণীশ তো প্রথম বিশ্বাসই করছিল না। শ্বশুরও ভেবেছিলেন আমি বানিয়ে বলছি। মা ওঁদের বোঝাছিলেন তুমি নাকি ওঁকে গয়নাশুদ্ধু রুমালটা রাখতে দিয়েছিলে। তারপর উনি ফেরত দিতে ভুলে গেছেন। আমি হয়তো মেনে নিতাম, যদি না ড্রয়ারে প্রণামীর ডলারগুলো পেতাম।"

দোলন অবাক—"ঐ যে পুজোর সময় চাঁদার টাকা চুরি গেছে বলে শুনেছিলাম....।"

নীপা ম্লান হাসল—"ভাবো, আমার বর পুজোর ট্রেজারার। এবার ওরা বলছিল আশ্চর্য ব্যাপার অন্য বছরের তুলনায় অনেক কম প্রণামী জমা পড়েছে। তখন কী জানি, মা প্রণামীর থালা ওদের চাঁদার টেবিলে নিয়ে যাবার সময় ডলার সরিয়ে নিয়েছেন?"

দোলন মাথা নাড়ল—"এখনও যেন আমার বিশ্বাস হচ্ছে না!"

নীপা বলল—"বললাম তো, নিজে না দেখলে বিশ্বাস হওয়া শক্ত। ওঁর ঘরের ড্রয়ারে কাচা জামাকাপড় রাখতে গিয়ে নোটগুলো পেলাম। এক ডলার, পাঁচ ডলারের নোট মিলিয়ে দেড়শ' ডলার। আমি তো তবু তোমাকে গয়নাগুলো ফেরত দিতে পারলাম। কিন্তু মণীশ কিভাবে ডলারগুলো পুজোর অ্যাকাউন্টে জমা দেবে বলো? লজ্জায় দুঃখে ওর যে কী মনের

অবস্থা হয়েছে। এখন মনে হচ্ছে, ওকে না জানালে পারতাম। ডলারগুলো না হয় কোনো চ্যারিটিতে দিয়ে দিতাম। আসলে মার অ্যাটিচিউড দেখে এত রাগ হচ্ছিল—"

হঠাৎ বাইরে দরজা খোলার আওয়াজে নীপার চিন্তার ঘোর কেটে গেল। এতক্ষণে ডেন্টিস্টের কাছ থেকে ফিরল। মেক্সিক্যান ঝিকে কী যেন বলতে বলতে ঘরে ঢুকছে। নীপাকে দেখে বলে উঠল—"সরি নীপাদি, দেরি হয়ে গেল। চাইনিজ টেক-আউটে খানিক সময় নিল। তুমি অনেকক্ষণ ওয়েট করছ?"

নীপা হাসল—"বেশিক্ষণ না। তুমি আবার চাইনিজ নিয়ে এলে কেন? একটা স্যান্ডউইচ হলেই তো হত।" দোলন খাবারের ঠোঙা হাতে রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বলল—"জাস্ট্ একটা স্যুপ আর নুডল্স্ এনেছি। চলো লাঞ্চ খেতে খেতে কথা হবে।"

দোলন রোজ দুপুরে টিভিতে সোপ-অপেরা দ্যাখে। আজও টিভি খুলে নীপার কথা শুনছিল। একটা এপিসোড শেষ হতে টিভি বন্ধ করে দিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—"তুমি বোধহয় মণীশদার মাকে নতুন করে বোঝার চেষ্টা করছ নীপাদি। হয়তো এই আশাতে এত বছর ধরে নিজের কথা লিখেছিলেন।"

নীপা মাথা নাড়ল—"জানি না। তবে এটা বুঝতে পারছি, এক জীবনেই ওঁর আশ্চর্য পরিবর্তন হয়েছিল। নয়তো একজন ক্লেপটোম্যানিয়াক্ কি ভাবে একটা গরিব ব্ল্যাক ফ্যামিলির দুটো ছেলেকে কলেজে পড়ালেন। মারা যাওয়ার আগের দিন পর্যন্ত ক্লেটন হাউসের রুগীদের জন্যে ফান্ড-রেইজ করেছেন। মণীশ আর আশীষের চেক্ থেকে একটা ডলারও নিজের জন্যে রাখতেন না। সব ডোনেশন দিয়ে দিতেন।"

—"সেই। এভাবেই কারও কারও জীবনে উত্তরণ ঘটে যায়।"

নীপা কথাটা খেয়াল করল—"হয়তো তাই। যদিও উনি বারবার লিখেছেন প্রায়শ্চিত্ত না করে শান্তি পাবো না। শেষের দিকে রিডেম্প্শন কথাটা ব্যবহার করতেন।" দোলন বলল—"কিন্তু ক্লেপটোম্যানিয়াক বলতে ঠিক যা বোঝায়, উনি বোধহয় তা ছিলেন না। ওটা তো অদ্ভুত ধরণের একটা মেন্টাল্ স্টেট। অভাবে কিংবা লোভ থেকে নয়, হঠাৎ ইমপাল্সের মাথায় এরা জিনিস সরিয়ে ফেলে। কিন্তু ওঁর সিচুয়েশনটা বোধহয় অন্য ছিল।"

—"বলতে চাইছ অভাবের জন্যে প্রলোভনে পড়েছিলেন? কিন্তু ঐ বয়সেও এত ভোগের ইচ্ছে থাকে, যে চুরি করে গয়না পরতে হবে?"

দোলন সামান্য হাসল—"সেটা আমরা ভাবছি। কারণ আমাদের শখ মিটে যাচ্ছে। কিন্তু যাঁর কোনোদিন ভালো শাড়ি, গয়না ছিল না, তাঁর পক্ষে ত্যাগের প্রতিমূর্তি হওয়া সোজা নয়। আর বয়সও বা তখন ওঁর কী এমন বেশি ছিল? বছর পঞ্চাশ হবে? আমরা তো এখন তার কাছাকাছি পৌঁছচ্ছি। সাজগোজ কিছু কমছে?"

নীপা বলল—"চুরির সপক্ষে অত লজিক দেখিও না। তাছাড়া, একবার তো নয়। ফিলাডেলফিয়া চলে গিয়েও কা কাণ্ড করলেন। তার জন্যে ভোগান্তি কম হল না।"

—"ব্যাপারটা ঠিক কী হয়েছিল বলো তো? মণীশদার সামনে এ সব আলোচনা করতে খারাপ লাগে।"

নীপা ঘড়ি দেখল। আর বেশিক্ষণ বসলে ফেরার সময় ট্র্যাফিকে পড়ে যাবে। ঋত্বিকের এনগেজমেন্টের খবর পেয়ে এর আগে একদিন দোলনকে ফোন করেছিল। আজ আসার

পরে লাঞ্চের সময় অনেকক্ষণ সেই সব কথাই হল। তারপর জয়শ্রীর ডায়েরির প্রসঙ্গ নীপা নিজেই তুলেছিল। প্রতিদিন মনের মধ্যে যে ভাবনার টানাপোড়েন চলছে, সে নিয়ে কারুর সঙ্গে মন খুলে কথা বলার সুযোগ নেই। হিউস্টনে শুধু দোলন, অরুণাংশুই জানে কেন জয়শ্রী নীপাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেননি। অন্যরা এ সব নিয়ে মাথা ঘামায় না। অথবা ধরেই নিয়েছে, শাশুড়ি বউ-এর মধ্যে বনিবনা না হওয়ায় উনি এখানে আসতে চান না। বহুকাল আগে একবার হিউস্টনে আসাতে এরা অনেকে জয়শ্রীকে দেখেওনি। সেদিক থেকে দোলনের সঙ্গে নীপার সম্পর্কটা অনেক কাছের। ওকে বিশ্বাস করে নিজেদের বাড়ির সমস্যার কথা বলতে পারে। এই যে শাশুড়ির ডায়েরি পড়ে নীপার মন খারাপ লাগছে, কখনও রাগ হচ্ছে, কখনও নিজের ক্ষমাহীনতার জন্যে সূক্ষ্ম অপরাধ বোধে কষ্ট পাচ্ছে, একমাত্র দোলন তা উপলব্ধি করতে পারছে। আজ আসার পর মন কিছুটা হালকা লাগছে। কিন্তু এখন আর বেশিক্ষণ থাকা যাবে না। সকাল থেকে বেরিয়ে পড়েছে। রান্নাবান্না হয়নি বাজারও ঠিক মতো করা নেই। মণীশ অফিস থেকে ফেরার আগে বাড়ি পৌঁছে ডিনারের ব্যবস্থা করতে হবে। নীপা দোলনের শেষ প্রশ্নটার উত্তর না দিয়ে বাড়ি ফেরার জন্যে ব্যস্ত হলো। দোলনের মধ্যে কৌতূহল কম। ড্রাইভ-ওয়ে পর্যন্ত নীপাকে এগিয়ে দিয়ে হাত নেড়ে ভেতরে চলে গেল।

গ্রীষ্ম শেষ হয়ে আসছে। এক একটি উজ্জ্বল দিনের শেষে রাতের স্বচ্ছ আকাশে অজস্র তারা ফুল ফোটে। কখনও মেঘহীন নীল জোৎস্নায় বাগানে আশ্চর্য আলো ছায়া খেলা করে। সারাদিনের কাজের পরে মনিশ আর নীপা বইপত্র পড়ে। স্পাইর‍্যাল নোট-বুকগুলো প্রায় শেষ হয়ে আসছে।

সে রাতে নীপা পড়ছিল—

স্বখ্যাত সলিলে ডুবেছি।

ওখানে সময় কাটে না বলে কাজটা নিয়েছিলাম। খাটুনি কিছুই না। গুজরাটিরা নতুন সিনিয়র সিটিজেন হোম খুলেছে। ক্যাথি বলছিল ওখানে লোক খুঁজছে। সপ্তাহে ক' ঘণ্টার কাজ। ইন্ডিয়ান বুড়ো, বুড়িদের কীর্তন, ভজন শোনাতে হবে। সেন্টারের বাস্-এ চড়ে ওদের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া, শপিং মল কিংবা মন্দিরে যাওয়া। এসকর্ট্ হিসেবে ঘণ্টা পিছু মাইনে দেবে। আশু কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না। আমি কিন্তু সময় কাটানোর জন্যে কাজে ঢুকে পড়লাম। মন্দ লাগছিল না। গুজরাটি না জানলেও একটু হিন্দি জানি। ওদের কীর্তন অন্য-রকম। ওরাই দল বেঁধে গায়। ভজন গাইতে এক মাদ্রাজী মহিলা আসে। সেদিন বাসে করে সবাইকে ইন্ডিয়া বাজারে নিয়ে গেল। কেউ মিষ্টির দোকানে ঢুকলো, কেউ মশলার দোকানে আচার আর ধুপ কিনতে গেল। দোকান-টোকান ঘুরে ভেজিটেরিয়ান খেয়ে ফিরে যাব। সঙ্গে আমার মতো আরও দুজন এস্কর্ট ছিল। নিরুবেন আর মালিনী প্যাটেল। গয়নার দোকানের কাচের শো-কেসগুলো দেখতে দেখতে হাঁটছিলাম। এক ফুটপাতেই বোধহয় পরপর পাঁচটা জুয়েলারি স্টোর। একটা দোকানে বেশ ভিড় দেখলাম। নবরাত্রি না কিসের সেল্ দিচ্ছে। ক্যাথী বলেছিল পুজোয় একটা লম্বা চেন্ কিনে দেবে। ভাবলাম, আজ একবার ডিজাইন পছন্দ করে আসি।

দোকানের ভেতরে-ঢুকে হার দেখতে দেখতে সুন্দর সুন্দর চুড়ির সেট চোখে পড়ল। মেয়েরা কাউন্টারে দাঁড়িয়ে গোছা গোছা হাতে পরে দেখছে। এ ধরনের ডিজাইন কখনও

দেখিনি। পরে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল। ওদিকে এগিয়ে গিয়ে সেল্‌সের মেয়েটাকে বলতে দু' সেট চুড়ি দেখাল। হাতে পরে দেখছিলাম। এই বয়সেও হাতভরা চুড়ি কেমন সুন্দর মানায়।

দোকানে ভিড় বাড়ছিল। শনিবার এ সব পাড়ায় শুধু ইন্ডিয়ানরা বাজার করতে আসে। গয়নার দোকানেও লোক কিছু কম দেখছি না। এদের হাতে অনেক ডলার। যা পছন্দ হবে, কিনে নেবে। আমার তো হাত শূন্য! ক্যাথীও হাজার-বারোশ ডলার খরচ করে এই চুড়িগুলো কিনে দেবে না। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে মাথার মধ্যে আবার সেই দুর্বুদ্ধি চাড়া দিয়ে উঠল। ক্রমশ লোভ আমাকে গ্রাস করছিল। ভিড়ের মধ্যে পিছিয়ে গিয়ে দরজা পর্যন্ত, পৌঁছে গেলাম। হাতল খুলে বেরতে যাবো, ভীষণ জোরে অ্যালার্মের মতো কী একটা বাজতে শুরু করল। কাউন্টার থেকে সেল্‌স-এর মেয়েরা চিৎকার করছে। একটা লোক এসে আমার হাত চেপে ধরল। আমি তখন ভয়ে কাঁপছি। হাত, পা অবশ হয়ে যাচ্ছে।

কেন সেদিন ঐ দুর্মতি হল? এখন যখন ভাবতে বসি, নিজের ওপরে ঘেন্না হয়। নীপা একদিন বলেছিল—ছিঃ এত লোভ আপনার। চুরি করতেও বিবেকে বাধল না? আজ নিজেকেই সে কথা জিজ্ঞেস করি। কেন আমার এরকম প্রবৃত্তি হল? অভাব তো কত মানুষেরই থাকে। সবাই কি এত হীন কাজ করতে পারে?

সেদিন দোকানের ম্যানেজার পুলিস ডাকল। খবর পেয়ে আশুরা থানায় গেল। আমাকে ছাড়িয়ে আনল। শেষ পর্যন্ত জেল হল না বটে কিন্তু কোর্টের হুকুমে আমাকে সরকারি পাগলা গারদে ছ' মাস কাজ করতে হল। প্রথম প্রথম ভাবতাম পাপের শাস্তি আর এর চেয়ে বেশি কী হতে পারে? কতগুলো ন্যালা খ্যাপা, জন্মপাগল লোকেদের কাছ যেতে ভয় করত। জড়িয়ে ধরতে এলে সরিয়ে দিতাম। তাদের পায়খানা পেচ্ছাপ করানো, চান করানো, খাওয়ানো, যা-ই করতে যাই, ঘেন্নায় গা ঘিন্ ঘিন্ করত।

অথচ ছ' মাস পরে যখন রিলিজ্ পেলাম, মনে হল আর তো কোনো যাওয়ার জায়গা নেই! নিজের দোষে মণীশের সংসারে থাকতে পারিনি। আশিষের বউও কি একই কথা ভাবছে না? হতে পারে ওদের মণীশদের মতো চেনাশোনা বিরাট বাঙালি সমাজ নেই। বাড়িতে ছেলে মেয়ে নেই। নীপাদের ভয় ছিল আমি হয়ত ওদের বন্ধু বান্ধবদের বাড়িতে গিয়েও চুরি করব। ছেলেরাই বা কী শিক্ষা পাবে? ওদের দোষ দিই না। কিন্তু আশীষও যদি রাখতে না চায় কোথায় যাব? দেশে বাড়ি ঘর নেই। হঠাৎ ফিরে গিয়ে আত্মীয় স্বজনকেও বা কী বোঝাব? ছেলেরা কৃতি হয়েছে বলে মনে অহংকার হয়েছিল। ভাবতাম আত্মীয়রা আমাদের হিংসে করে। আর আজ আমার কী দশা!

ক্যাথী কিন্তু কোথাও যেতে দিল না। যেন আমি ছ' মাসের জন্যে কোনোখানে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে ওদের কাছে ফিরিয়ে আনল। একটা পুরোনো কথাও তুলল না। শুধু আশু কেমন গুম মেরে গেছে।

আমার মনের কষ্ট কাউকে বোঝাতে পারি না। সেদিন পুলিস যখন আমাকে গাড়িতে তুলল, রাস্তার ইন্ডিয়ান লোকজন কেমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। শুধু শধু হ্যারাস্ করছে কিনা বুঝতে পারছিল না। কেউ কেউ দোকানের ম্যানেজারকে বলছিল ওঁকে অ্যারেস্ট করাচ্ছেন কেন? গয়না নিয়ে তো চলে যেতে পারেননি। কেস্ করে কী হবে? আসলে ওরা লজ্জা পাচ্ছিল। আমি তো ইন্ডিয়ানদের মুখেই চুনকালি দিলাম। থানায় আশুর সেই অপদস্থ মুখখানা

যখন মনে পড়ে, বড় কষ্ট হয়। মা হয়ে ছেলেদের মানসম্মান, সংসারের শান্তি নষ্ট করে দিলাম। নিজেকে শত ধিক্কার দিই। মাথার ভেতর অস্থির অস্থির লাগে। রাতে আমার কান্নার শব্দ পেয়ে আশু একদিন ঘরে এল। অনেকক্ষণ বিছানায় বসে রইল। দু'দিন পরে ক্যাথীদের হাসাপাতালে নিয়ে গিয়ে সাইকিয়েট্রিস্ট দেখাল। সেই থেকে ওষুধ খাচ্ছি। থেরাপি চলছে। মন এখন অনেক শান্ত।"

নীপা দেখল লেখাটা এখানে শেষ হয়েছে। তারপর বাকি কয়েক পাতায় কিছু নেই। তবে কি এই ক'টাই মাত্র ডায়েরী ছিল? অথচ ক্যাথী বলেছিল, জয়শ্রী নিয়মিত না হলেও প্রায়ই কিছু লিখতেন। তাহলে গত দশ-বারো বছরের খাতাগুলো গেল কোথায়? নাকি একসঙ্গে অতগুলো খাতা ক্যাথী দিতে চায়নি?

ক'দিন পরে আশীষের ফোন এল। ঋত্বিক তার বান্ধবী বিদ্যার সঙ্গে এন্‌গেজড হওয়ার খবর দিয়ে কাকাকে ফোন করেছিল। সামনের বছর মে-জুন নাগাদ ক্যালিফোর্নিয়ায় বিয়ে। আশীষ আর ক্যাথী কবে ছুটি নেবে জানার জন্যে মণীশকে ফোন করল। ওদের কথা শেষ হতে নীপা জিজ্ঞেস করল—"ক্যাথী, তোমার কাছে কি মার আর কোনো ডায়েরি আছে? যে ক'টা দিয়েছিলে পড়ে দেখলাম। কেমন অ্যাব্রাপ্টলি শেষ হয়ে গেছে।"

ক্যাথী জানাল ওর কাছে আরো কয়েকটা নোট বুক আছে। মেইল্ করে পাঠিয়ে দেবে। প্যাকেটটা যখন এসে পৌঁছল মণীশরা তখন ঋত্বিকের কাছে স্যানফ্র্যানসিসকোয়। বিদ্যার বাবা, মা ওখানকার পুরনো বাসিন্দা। মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে আলোচনা করার জন্যে ওদের যেতে বলেছিলেন। ঋত্বিকও চাইছিল মা, বাবা একবার ঘুরে যাক। যাওয়ার পর দুটো-তিনটে দিন আয়েঙ্গারদের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়ে আর বিদ্যার সঙ্গে সময় কাটিয়ে নীপা বেশ খুশি হল। চলে আসার আগের দিন ওকে রেস্টোরেন্টে খেতে নিয়ে গিয়েছিল। বাড়ি ফেরার পথে নীপা হাসতে হাসতে মণীশকে বলল—"বিয়েবাড়ি তেঁতুলে ভরে যাবে। ইন্ডিয়া থেকেও একদল বুড়োবুড়ি আসছে।"

মণীশ জিজ্ঞেস করল—"এত খবর পেলে কোথায়?"

—"বিদ্যাই বলছিল। ওর গ্র্যান্ড পেরেন্টরা চারজনেই আসছে। আমাদের দিক থেকে যে কে কে আসতে পারবে জানি না তবে বাবা, মা আসবেন বলেছেন।"

ঋত্বিক গাড়ি চালাতে চালাতে বলল—ঠাকুমা বেঁচে থাকলে হয়তো কাকাদের সঙ্গে আসতে পারতেন। লেটলী আমাকে বেশ কয়েকবার ফোন করেছিলেন। আই ট্রায়েড টু মেক্ এ ট্রিপ টু ফিলাডেলফিয়া। ফাইন্যালি সময় পেলাম না। এনি ওয়ে, ঠাকুমার রিকোয়েস্টে একটা চ্যারিটি ফান্ডে ডোনেশন পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।"

মণীশ হেসে উঠল—"সেকি? মা তোকেও ছাড়েননি? চেক্ কোথায় পাঠিয়েছিলি?"

—"কাকার অ্যাড্রেসে। ঠাকুমার সঙ্গে কে কাজ করে, তার ভাই-এর কিডনি ট্র্যান্‌স্‌প্ল্যান্টের জন্যে ফান্ড-রেইজ করছিলেন।"

নীপা ভাবছিল ওদের অজান্তে জয়শ্রী ধীরে ধীরে নাতিদের খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন। সে কি ওঁর দান ধ্যানের সুবিধের জন্যে? ঋক আর কী করবে? ঠাকুমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ না থাক, ভদ্রতা আর মানবিকতার খাতিরে ডোনেশন পাঠিয়েছে। বোঝা যাচ্ছে মণীশ খুবই আপ্লুত। ছেলের কাঁধের ওপর হাত রেখে সামান্য চাপ দিল।

হিউস্টনে ফিরে কলেজের পরীক্ষা নিয়ে নীপা ক'দিন ব্যস্ত ছিল। মণীশ ভিডিও স্টোর থেকে দুটো বাংলা ছবি এনেছিল। দু'দিন সন্ধ্যেবেলা সিনেমা দেখে কাটল। ক'দিন বাদে নীপা আবার বাকি ডায়েরিগুলো পড়ার সময় পেল।

এবার ক্লেটন হাউসে ভলান্টারি সার্ভিসের কথা। ক্যাথীর চেনা এক নিউরোলজিস্ট্ জয়শ্রীকে ওখানে পাঠিয়েছিলেন। নীপা লক্ষ্য করছিল মেন্টালি ডিসএবল্ডদের সঙ্গে থাকতে থাকতে জয়শ্রীর মানসিকতার পরিবর্তন হচ্ছে। জীবন সম্পর্কে নতুন অভিজ্ঞতা থেকে দৃষ্টিভঙ্গী বদলে যাচ্ছে।

জয়শ্রী লিখেছেন—যা একদিন অভিশাপ বলে মনে হয়েছিল, তাই-ই কি শেষে ঈশ্বরের আশীর্বাদ হয়ে উঠল? সেদিন স্টেট ইনস্টিটিউশনে কাজ করতে বাধ্য না হলে জীবনের এই করুণ দিকটা জানতে পারতাম না। বিকলাঙ্গ, জড়বুদ্ধি সন্তান থাকার যে কী জ্বালা, যাদের আছে শুধু তারাই জানে। কি ধৈর্য নিয়েই না এদের দেখাশোনা করতে হয়? জীবজন্তু পুষলে তারা মানুষের ডাকে সাড়া দেয়। আহা! এদের সে বোধবুদ্ধিও নেই। শরীর বাড়ছে। মনের বাড়বৃদ্ধি নেই। তবু ডনা আমাকে চিনতে পারে। কাছে গেলে আঁকড়ে ধরে। শার্লি বলে আমি ছাড়া ডনাকে কেউ খাওয়াতে পারে না। ওর জন্যে বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যায়। তবু না খাইয়ে চলে আসতে পারি না। কেভিন নামে ছেলেটার আবার সেদিন সিজার হল। হুইল্ চেয়ার থেকে উল্টে পড়ে যাবে ভেবে দু'হাতে চেপে ধরলাম। মুখ দিয়ে গাঁজলা উঠছে। সারা মুখ, মাথা বীভৎসভাবে বেঁকে যাচ্ছে। যখন ওষুধ দেওয়ার পর শান্ত হয়ে ঘুমোল, ভাবছিলাম ভগবান কেন ওর জন্ম দিয়েছিলেন?

ঠাকুর আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছেন জীবনে দুঃখ আর বঞ্চনা কাকে বলে। এতদিন অন্ধ ছিলাম, বুঝিনি তিনি আমায় কত দিয়েছিলেন। স্বামী ছিলেন সৎ, নির্লোভ মানুষ। সংসারের জন্যে প্রাণপাত করেছেন। তবু কোনো নালিশ ছিল না। মণি আর আশুকে নিয়ে ওঁর কত আশা। ছেলেরা মানুষ হলো বলে কী আনন্দ! অথচ আমি? কোনো কিছুর মর্ম বুঝিনি। কী পেলাম, ভেবে দেখিনি। যা পাইনি, তার জন্যে পাগল হয়েছি। আজ তার ফল ভোগ করছি।

অথচ ভোগের আকাঙ্ক্ষা বলো, লোভ বলো, শার্লির মধ্যে কখনও তা দেখলাম না। গরীব নিগ্রোদের দুঃখ দুর্দশার তো শেষ নেই। শার্লির ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের রেখে ওর স্বামী মরে গেল। সেই থেকে লড়াই করে যাচ্ছে। ক্লেটন হাউসের সামান্য মাইনেতে অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দিয়ে খেয়ে পরে থাকা সোজা কথা? দিনের ডিউটি পড়লে তবু একরকম। রাতের ডিউটিতে ওদের কার ভরসায় রেখে আসবে? শেষে ম্যানেজারের অনুমতি নিয়ে শার্লি ওদের রাতের ডিউটিতে সঙ্গে নিয়ে আসত। আমি বাড়ি যাবার সময় দেখতাম শার্লি ওদের রাতের খাবার বালিশ, আর কম্বল নিয়ে ক্লেটন হাউসে ঢুকছে। বাচ্চাগুলো এখানেই খেয়ে নিয়ে স্কুলের হোম-ওয়র্ক নিয়ে বসত। রাত হলে অফিস ঘরের মেঝে আর সোফায় বিছানা পেতে ঘুমোত। কিন্তু এ তো সুস্থ লোকেদের বাড়ি নয়। আমি তো দরকার পড়লে রাতে থেকেছি। মাথার কাছে মনিটর রেখে শুয়েছি। হঠাৎ কেটির অদ্ভুত গলার আওয়াজ ভেসে এল। ঘরে ঢুকে দেখি বিছানা ভাসিয়েছে। কেটিকে ভেজা জামাকাপড় ছাড়িয়ে বিছানা পরিষ্কার করে আবার শুইয়ে দিলাম। খানিকক্ষণ পরে ডনা, কেভিন আর

বব্‌কে ঘুম থেকে তুলে হুইল চেয়ারে বসিয়ে বাথরুমে নিয়ে গেলাম। এই ছিল আমাদের সারারাতের কাজ। শার্লি রাতের পর রাত ডিউটি করেছে। কতটুকু ঘুমোত? ক্লেটন হাউসের অসুস্থ মানুষগুলোর অস্বাভাবিক চিৎকারে মাঝরাতে শার্লির বাচ্চাগুলো জেগে উঠত। ভীষণ ভয় পেতো। পরদিন কিছুতেই আসতে চাইত না।

ক' বছর পরে বড় ছেলে মাইকের ভরসায় শার্লি ওদের বাড়িতে রেখে আসত। ক্লেটন হাউসে তখন কম্‌পিউটার ছিল না। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার অসুবিধে হচ্ছে বুঝে শার্লি আর ওদের সন্ধেবেলা সঙ্গে নিয়ে আসত না।

মাইক হাইস্কুল পাশ করল। ভোকেশন্যাল ট্রেনিং নিয়ে ছোটখাটো চাকরি পেলেও শার্লির সাহায্য হত। মাইক কলেজে পড়তে চাইছিল। শার্লির তো ওকে কমিউনিটি কলেজে ভর্তি করারও সামর্থ্য নেই। শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থা করল। মাইক ব্ল্যাক এডুকেশন্যাল ফান্ড থেকে পড়ার খরচ পেল। দু' বছরের মাথায় মেয়েটা ভালো রেজাল্ট করে হাইস্কুল পাশ করল। নিউজার্সির বড় কলেজে ভর্তি হল। স্কলারশিপ পেয়েছিল। তাও অনেক খরচ দিতে হবে। আমরা ক'জন মিলে সাহায্য করলাম। আশু আর ক্যাথী তো দিলই। মণিও তাই শুনে তিন হাজার ডলার পাঠিয়েছিল।

শার্লির মেয়ে জ্যানেট লইয়ার হয়েছে। ছেলে মেয়েরা ভালো রোজগার করছে। তবু শার্লির সাজ পোশাক একটুও বদলাল না। শখ করে একটা ব্যাগ পর্যন্ত কেনে না। জ্যানেট ওকে মুক্তোর হার দিতে চাইল। ও বলেছিল তার বদলে নিগ্রো কলেজ ফান্ডে ডোনেশন পাঠিয়ে দিতে। শার্লি ক্লেটন হাউসের ম্যানেজার থেকে এখন ট্রাস্টি বোর্ডের মেম্বার হয়েছে। ওর সততা, নির্লোভ স্বভাব, আর পরিশ্রম করার ক্ষমতার জন্যে এত সম্মান পেয়েছে। শার্লিকে যত দেখি, ভেতর থেকে কেমন যেন লজ্জা পাই। ওর কাছে আমার অনেক কিছু শেখার ছিল। নিজেকে এত ছোট মনে হয়....।"

জয়শ্রীর আত্মকথা শেষ করে নীপা একদিন মণীশকে বলল—"তুমি বলেছিলে সময় পেলে মার ডায়েরিগুলো দেখবে। আমার তো শেষ হয়ে গেল। তোমাকে শুধু একটা-দুটো পাতা পড়ে শোনাবো। এখন শুনবে?"

মণীশ ইন্টারনেট দেখছিল। নীপার কথা শুনে কমপিউটারের পর্দা থেকে চোখ সরাল—"আমাকে তার মানে শেষ থেকে শুরু করতে বলছ। কবে আর সময় পাবো জানি না। তুমি কী পড়ে শোনাবে তাই শোনাও।"

নীপা পড়ছিল—"আশু জিজ্ঞেস করল আমি একবার দেশে বেড়াতে যাব কিনা। তাহলে ক্রিসমাসের ছুটিতে নিয়ে যাবে। বলেছি ভেবে দেখি। সত্যি, বহুকাল যাওয়া হয়নি। এখনও দাদা বউদি বেঁচে আছে। বোন দুটো কতবার যেতে লিখেছে। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় ঘুরে আসি। কিন্তু তারপরেই পিছুটান শুরু হয়। এবারও মন বলছে শেষপর্যন্ত কোথাও যাওয়া হবে না। আমি চলে গেলে ক্লেটন হাউসে ওদের দেখাশোনার কী হবে? নতুন যারা কাজ করতে আসে, তাদের ট্রেনিং দিতে হয়। সুজ্যান আর মার্থাকে ট্রেনিং দিয়েছি। কিন্তু আমি না গেলে সকাল থেকে একটা না একটা ঝামেলা বাধবে। আমায় না দেখলে ডনা মাম্ মাম্ করে অস্থির হয়। কেভিনের অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। এখন দিনেও ডায়াপার পরাতে হয়। কেউ হয়তো সময়মতো বদলে দেবে না। ভ্যাসেলীন্ লাগাবে না। ডায়াপার র‍্যাশ হয়ে কষ্ট

পাবে। কেভিনের তো কিছু বোঝানোর ক্ষমতা নেই। এই অবোধ, অসহায় মানুষগুলোকে ছেড়ে কোথায় যাবো? গেলেও শান্তি পাবো না। কেটি বসে বসে আপনমনে ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টায়। পড়তে পারে না, সে তো সবই জানে। সেদিন মার্থা এসে ওর ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে ম্যাগাজিনটা ফেলে দিল। কেটির সেই যে পাগলামো শুরু হল, টেবিলে মাথা ঠুকে ঠুকে প্রায় রক্ত বার করে ফেলছিল। আমি গিয়ে না পড়লে মেয়েটাকে বোধহয় হাসপাতালে দিতে হত। কেটির বাড়ি থেকে আজকাল কেউ খোঁজ নিতেও আসে না। বাপ, মা বেঁচে নেই। কে আর আসবে। ওর প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স হল। কেভিনের বয়স ও কম হল না। আর হয়তো বেশিদিন বাঁচবে না। এতকাল সেবাযত্ন করলাম। শেষ কটাদিন কাছে থাকি। আমার তো এটুকুই বন্ধন।

মণীশ আর নীপার কাছে যে যাই না, সেও এই ক্লেটন হাউসের জন্যে। ওরা দুঃখ পায়। ভাবে এখনও রাগ করে আছি। কী করে বোঝাব, আমার রাগ, অভিমান কবে ধুয়ে মুছে গেছে। পাপ স্খলনের জন্যেই হয়ত ভগবান আমাকে এখানে এনেছিলেন। অসহায় ছেলে মেয়েদের সেবা করে পুণ্য অর্জন না হোক মনে তো শান্তি পেলাম।

এরপর যদি কোথাও যাই, একবার দাদার করছে যাব। বহরমপুরের ডেভিস রোডের বাড়িটা এখনও মনে পড়ে। যদি বেঁচে থাকি, শেষবারের মতো ছোটবেলার সেই মফঃস্বল শহর আর গঙ্গার ঘাট দেখে আসব.....।"

জয়শ্রীর ডায়েরি এখানে শেষ হয়ে গেছে। তারিখ দেখে বোঝা গেল মারা যাবার মাস খানেক আগের লেখা।

সে বছরের শেষে মণীশ আর নীপা কলকাতায় গেল। সেখান থেকে দু'দিনের জন্যে বহরমপুর। আশীষ ওদের সঙ্গে ছোট ফুলদানির মতো দেখতে একটা কৌটো দিয়েছিল। জয়শ্রী মারা যাবার পর ক্রিমেটোরিয়াম থেকে দেওয়া ভস্ম। মণীশ এতবছর বাদে এসে শহরটা চিনতে পারছিল না। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল-এখান থেকে গঙ্গা কত দুরে? রাধার ঘাট?

খোঁজ

ভোরের কুয়াশা জড়ানো আধো অন্ধকারে ড্রাইভওয়েতে গাড়ির আলো এসে পড়ল। অরূপ জানলার দিকে ফিরে বলল—"লিমোজিন এসে গেছে।"

এষা ঘড়ি দেখল। গাড়িটা আগেই এসেছে। অরূপ ক্লসেট থেকে জুতো বার করছে দেখে বলল—"এখনও পাঁচটা বাজেনি। এত আগে বেরোবে?"

—"বেরিয়েই পড়ি। রাস্তা ফাঁকা পাব। ট্রাফিক থাকবে না।"

ড্রাইভার এসে দরজার বেল্ বাজাতে অরূপ ছোট সুটকেসটা দিয়ে দিল। দু'দিনের জন্যে অফিসের কাজে ড্যালাস যাচ্ছে। লাগেজ বলতে ঐ সুটকেস আর অ্যাটাশে। অরূপ জ্যাকেট পরল। দরজায় দাঁড়িয়ে এষার পিঠে হাত রাখল—"চললাম তাহলে? সাবধানে থেকো। পৌঁছে ফোন করব।"

অন্ধকারে মুখ বাড়িয়ে এষা বলল—"সাবধানে যেও। দুর্গা, দুর্গা।"

লিমোজিন রাস্তার মোড় ঘুরতেই এষা ওপরে চলে এল। ঘুম হোক, না হোক খানিকক্ষণ শুয়ে থাকবে। আজ সারাদিন তেমন কাজ তো নেই। বিউটি স্যালনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। সেও বেশ দেরিতে। এত সকালে নীচে গিয়ে কী করব? এষা কম্বল জড়িয়ে ঘুমনোর চেষ্টা করল।

সেই ঘুম ভাঙল ফোনের আওয়াজে। বেলা তখন প্রায় দশটা। হুড়মুড় করে ফোন ধরতেই পূর্ণার গলা।

—"সরি আন্টি। ঘুম ভাঙালাম?"

—"না, না, এমনিই হঠাৎ অসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভোরবেলা একবার উঠেছিলাম তো, আবার একটু শুতে গিয়ে এই কাণ্ড।"

পূর্ণা হাসছিল—"ভালোই তো। রেস্ট নিতে পারলে। আংকল কবে ফিরবেন?"

এষা ফোন কানে নিয়ে ড্রেসিং গাউন পরতে পরতে উত্তর দিল—"পরশু সন্ধের ফ্লাইটে। তুমি এখন কোথা থেকে কথা বলছ?"

—"বাড়ি থেকে। কাল এসেছি। ভিকিকে কলেজে পৌঁছতে যাব।"

—"ভিকি কি ডিউকেই যাচ্ছে?"

—"না। ইয়েল এ ওয়েট-লিস্টে ছিল। পেয়ে গেছে। কাল ওর সঙ্গে নিউ-হ্যাভেনে যাচ্ছি। আন্টি, মা তোমাকে এই খবরটাই দিতে বললেন। মার স্ট্রেপ্-থ্রোট হয়েছে। কথা বলতে পারছেন না।"

এষা তার ভাবী বেয়ানের জন্যে উৎকণ্ঠা দেখল—"সে কী? কবে হল?"

—"পরশু থেকে জ্বর। অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে আজ জ্বর কমেছে। গলায় এখনও ব্যথা।

—"তাহলে কাল আর রেখা যেতে পারছে না? আমি কি গিয়ে কিছুক্ষণ ওর কাছে থাকব?"

পূর্ণা বলল—"মা ভিকির সঙ্গে যেতে চাইছেন। দেখি, কেমন থাকেন।"

এষা ফোন রাখার আগে বলল—"ঠিক আছে। আমি পরে খবর নেব। ভিকিকে কনগ্র্যাচুলেট করে দিও।"

এষা নীচে এল। কফির জল বসিয়ে ঘড়ি দেখল বেশ দেরি হয়ে গেছে। বারোটায় "হেয়ার অ্যান্ড কেয়ার"-এ অ্যাপয়েন্টমেন্ট। তার আগে ব্যাংকে যেতে হবে। চান করে ব্রেকফাস্ট সারতে সারতেই বেরোনোর সময় হয়ে যাবে। ট্রেড-মিল একসারসাইজ আর করা হল না। ভাগ্যিস পূর্ণার ফোনটা এল। নয়তো কখন ঘুম ভাঙতে কে জানে? এষা আজ এতক্ষণ ধরে ঘুমোল কী করে আশ্চর্য!

আসলে এ সব হচ্ছে জমে থাকা ঘুম। উইকএন্ডে বেশি বেশি রাত জাগার ফল। কাল রাত্তিরে ও তো চার ঘণ্টার বেশি ঘুমোতে পারেনি। ভোর চারটেয় অ্যালার্ম দিলে সময়মতো শুতে যাওয়া উচিত। কিন্তু অরূপ সেই এগারোটা বাজাল। দীপক চোপরার বই নিয়ে এষার চোখের গোড়ায় আলো জ্বালিয়ে শুয়ে আছে তো শুয়েই আছে। অত জ্ঞানের কথা নিজের মনে পড়ছ, পড়ো। তা নয়, এ পাতা থেকে, একবার ও পাতা থেকে এষাকে পড়ে শোনানোর চেষ্টা। ঐ "এজলেস বডি অ্যান্ড টাইমলেস মাইন্ড" শুনতে শুনতেই এষার ঘুমের বারোটা বেজে গেল। তারপর একবার বাথরুমে যাওয়া। একবার জল খাওয়া। একবার গরম লাগা। একবার শীত করা। বয়স হচ্ছে বোঝা যায়। এষা জানে অরূপের পরের টার্গেট "মহাভারত"। রাজশেখর বসুর বইটা দীপক চোপরার পাশেই বসে আছে। কত রাত ভোগাবে কে জানে? এক বই যে মানুষ দু'বার কী করে পড়ে আশ্চর্য। এক গানও যে একশোবার কী করে শোনে....।

বিউটি স্যালনে পৌঁছতে একটু দেরি হয়ে গেল। কালো আলখাল্লা পরে কফি খেতে খেতে এষা ফ্যাশন ম্যাগাজিন দেখছিল। আজকাল সাহস করে নানা কায়দায় চুল ছাঁটছে। আগে এক একটা স্টাইল ধরলে সহজে ছাড়ত না। লং বব থেকে ঘাড় অবধি উঠল তো টানা দু' বছর এক ছাঁট। আবার যেই মাথার পেছন দিকে খামচা খামচা করে চুল ছাঁটিয়ে লেয়ার স্টাইল ধরল, তো, তাই চালাল প্রায় তিন বছর। সিঁথির দু'পাশে পাতা কেটে ফেদার-কাট। এই লেয়ার ফেদারই শেষে সিংহের কেশরের মতো লাগছে দেখে অরূপের তাড়নায় মাথা মুড়িয়ে এল। অরূপ কদম ছাঁট পছন্দ করে। কিন্তু ঝোলা দুল পরা যায় না। এষা তো এখন শাবানা আজমীর দুঃসাহস দেখে অবাক। ও নিজে আবার চুল লম্বা করে ফেলেছিল। সিলকের ঝালরের মতো পিঠে ফেলে রেখেছিল ছ'মাস। আবার স্টাইল বদলে ব্লান্ট কাট। বাঁকা সিঁথি। এক কান থেকে অন্য কান অবধি সরল রেখা। এখনও তাই। আজ একটু বদলাবে কী না ভাবছে।

"হেয়ার অ্যান্ড কেয়ারে"-এ আজ বেশ ভিড়। এষা আগের দিন ফোন করে লেসলিকে পেল না। ডনাও আজ ভীষণ ব্যস্ত। ক্রিস্টিনা নামে রোগাপটকা মেয়েটা এষাকে তার চেয়ারে ডেকে নিয়ে গেল। কেমন চুল কাটে কে জানে? ঢুলু ঢুলু চাউনি, ঝাঁকড়া চুলওলা মেয়েটাকে দেখলে মনে হয় চেনাশোনা কার সঙ্গে যেন মিল আছে।

চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে হাসি হাসি মুখে ক্রিস্টিনা জানতে চাইল—"আজ কি শুধু কালারিং আর হেয়ারকাট? একই কালার রাখবে তো?"

আয়নার ভেতর দিয়ে এষা উত্তর দিল—"হ্যাঁ। পরে ব্লো-ড্রাই করার সময় এই স্টাইলটা করে দিও।"

ম্যাগাজিন দেখে ক্রিস্টিনা ঘাড় কাৎ করে চলে গেল। এখন এষার কার্ড নম্বর বের করে রং গুলবে। নম্বর ভুল করলেই হয়েছে! এষাকে হয়তো ব্লন্ড করে দিল। তখন এক মাথা শনের নুড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে।

নাঃ এষা শুধু শুধু ভাবছে। মেয়েটা যেমনই চুল কাটুক, কী আর এধার-ওধার হবে? একটু নতুনত্ব হলেই হল। নিজের চেহারাটা দিন দিন এত একঘেয়ে লাগছে এষার। আয়নার বেশিক্ষণ টলারেট করা যায় না! বেশি ডায়েট করলে দুর্ভিক্ষের এফেক্ট। বেশি নেমন্তন্ন খেলে চাকা কুমড়ো। ভালো লাগে না। কিন্তু মুখটা তো আর বদলানো যাবে না। তার চেয়ে চুলের স্টাইল পাল্টে যদি একটু ভাল দেখায়।

ক্রিস্টিনা ফিরে আসতে এষা ওর হাতে মাথা জমা দিয়ে ঝিম মেরে বসে থাকল। চুলে কেউ হাত ছোঁওয়ালেই আরাম হয়। এষার চুলের মুঠি ধরে মেয়েটা যা প্রাণ চায় করুক। তুলি বুলিয়ে বুলিয়ে যতক্ষণ ইচ্ছে রং দিক। মাথা ডলে ডলে যতবার খুশি শ্যাম্পু করুক, কন্ডিশনার লাগাক। এষা শুধু চোখ বুজে রিল্যাক্স করবে।

এষার চুলে হেয়ার ডাই লাগিয়ে টাইমার ঘড়ি সেট করে দিয়ে ক্রিস্টিনা পাশের চেয়ারে গেল। এক খুনখুনে বুড়ি সারা মাথায় রাংতার টুকরো জড়িয়ে ঝিমোচ্ছিল। টাইমার বেজে উঠতেই নড়ে চড়ে বসেছে। ক্রিস্টিনা তাকে শ্যাম্পু করাতে নিয়ে গেল।

এষা ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে যাচ্ছে। কফি নিয়ে ডনা এল। এতক্ষণে এর কথা বলার ফুরসৎ হয়েছে। এষা ওর কাছে অনেক বছর ধরে চুল কাটছে। দুজনে দুজনের বাড়ির খবর নেয়। আজ ডনা জিজ্ঞেস করল—"তোমার ইন্ডিয়া বেড়ানো কেমন হল?"

এষা হাসল—"ভালো। খুব ভালো। এবার অনেক জায়গায় গিয়েছিলাম।"

—"সবাই গিয়েছিলে?"

—" ছেলে যায়নি। তার ছুটি নেই।"

—"তোমার ছেলের মেডিকেল স্কুল শেষ হয়নি?"

—"সবে শেষ হয়েছে। এখন রেসিডেন্সির প্রথম বছর। ইন্ডিয়া যাবে কী? হসপিট্যাল থেকে উইকএন্ডে বাড়িতে আসারই সময় নেই তার।"

—"এই চলবে সারা জীবন"—ও পাশ থেকে মডেলের মতো এক সুন্দরী বলে উঠল—"আমার বাবা ডাক্তার। বর ডাক্তার। সময়-টময় এদের কোনোদিনও হয় না। যত সোশ্যাল কমিটমেন্ট আমাদের।"

খুনখুনে বুড়িটা মাথায় তোয়ালে চাপিয়ে বসেছিল। এদের কথা শুনে গলা খাঁকারি দিয়ে সাড়া দিল—"সে আর জানি না? আমার বর ছিল গাইনোকলজিস্ট। আমার যখন পেইন উঠল, সে তখন হাসপাতালে কার যেন ডেলিভারি করাচ্ছে! সে যুগে ডাক্তারদের পেজারও ছিল না। সেলফোনও ছিল না। ভোরে একবার বেরিয়ে গেল তো ব্যস!"....খক্ খক্ কাশির দমকে বুড়ির নালিশ বন্ধ হয়ে গেল।

এষা জানে এর কোনোটাই অনুযোগ নয়। কথার কথা। আমেরিকার বড়লোক ডাক্তারদের সুখী সুখী গিন্নিদের রুটিন সংলাপ। একদিন পূর্ণাও হয়তো বলবে। কিন্তু এখন অনির যা খাটুনি

চলেছে, একটানা ছত্রিশ ঘণ্টা জেগে থাকে কী করে ছেলেটা? নাঃ, আজকেই ফোন করে দেখবে রোজ মালটিভিটামিন খাচ্ছে কি না। আবার ফোন করলেও তো অর্ধেক কথার জবাব দেবে না। এষা যদি বলে সামনের বছর বিয়ে করবি কি না ঠিক করেছিস? অনি তখনই হুঁ, হাঁ করে ফোন রেখে দেবে। এনগেজমেন্ট রিং কেনার পয়সা জমেনি তো মাকে বল। চার হাজার ডলারের ধাক্কা বলে চুপচাপ বসে থাকবি?

এই সব ভাবতে ভাবতে এষা ভেজা মাথায় চুল কাটার উঁচু চেয়ারে চড়ে বসল। ক্রিস্টিনা যতক্ষণ কাঁচি চালাল, এষা কথা বলল না। শুভদৃষ্টির আগের মুহূর্তের মতে ঘাড় নামিয়ে বসে থাকল। ছোটবেলার ট্রেনিং। মহাদেব নাপিত শিখিয়েছিল। খবরের কাগজের জামা পরিয়ে খচাখচ কাঁচি চালিয়ে ববছাঁট দিত। কপালে কাঠি কাঠি চুল ফেলে চাইনিজ কাট। মহাদেব "রোমান হলিডে"র নাম শোনেনি। তবু এমন ছাঁট দিল, এষাকে দেখে ছোট পিসি বলেছিল, অড্রে হেপবার্ন। হামের পর যে ন্যাড়া হয়েছিল, সেও মহাদেব নাপিতের হাতে। মুখটা এখনও মনে আছে। এষার বিয়ের অ্যালবামেও দাঁত উঁচু মহাদেব উঁকি মারছে।

বিয়েতে নাপিতের রোলটা যে কী কে জানে? নজর লাগাটাগা নিয়ে কী সব ছড়াটড়া বলত মহাদেব। এই নজরের ব্যাপারটা কিন্তু এষা ইটালিয়ানদের মধ্যেও দেখেছে। মস্ত সাদা ওড়না দিয়ে যে বিয়ের সময় ব্রাইডের মুখ ঢেকে রাখে, সে তো কুনজর লাগার ভয়ে। পয়া, অপয়া, সুনজর, কুনজর এরাও খুব বিশ্বাস করে।

ক্রিস্টিনা চুল কেটে সেট করার পর এষার একদম পছন্দ হল না। মাথার ওপরটা ফোয়ারার মতো কী যে করে দিল! একেবারে ছোটবেলাকার ফোয়ারা ঝুঁটি। এষার নিজের ওপরেই রাগ হচ্ছে। বেশি সাহসী হতে গিয়ে কিম্ভুত এক ছাঁট দিয়ে বসল।

ক্রিস্টিনা বড় আয়না এনে চুলের পেছন দিকটা দেখাল। এষার সাড়াশব্দ নেই দেখে জিজ্ঞেস করল—"ঠিক হয়েছে তো?"

এষা মাথা নাড়ল—"ঠিকই আছে। একটু চেঞ্জ হল। সারা বছর এক স্টাইল ভালো লাগে না।"

ক্রিস্টিনা ভরসা দিল—"ইউ লুক গ্রেট্"।

বিল দিয়ে এষার হাত থেকে চেক নিয়ে এক ঝলক দেখেই ক্রিস্টিনা জিজ্ঞেস করল—"তুমি বেঙ্গলি?"

এষা হাসল—"কী করে বুঝলে?"

ঢুলু ঢুলু চোখে মেয়েটাও হাসল—"পদবী দেখে। বাসু তো বেঙ্গলিদের লাস্ট-নেম হয়।"

—"তুমি আর কোন বাসুকে চেনো?"

—"আমি নিজেই বাসু। ক্রিস্টিনা বাসু।"

এষা কোট পরতে পরতে বলল—"তাই? বিয়ে করে বাসু হয়েছ?" ক্রিস্টিনা মাথা নাড়ল—"বিয়ে করিনি। আমার নিজেরই লাস্ট-নেম বাসু।"

ক্রিস্টিনা আর কথা বাড়াল না। ওর পরের কাস্টমার কালো গাউন চড়িয়ে চেয়ারে বসে গেছে। এষাও আর দেরি করল না। ফোয়ারা-ঝুঁটি হোক, যাই-ই হোক, এত দামি চুল ভিজে যাওয়ার আগে বাড়ি পৌঁছতে হবে। বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

দু'দিন বাদে অরূপ ফিরল। এষা যখন রাতের খাওয়ার পর ডিশ-ওয়াশারে বাসন ঢোকাচ্ছে,

ড্রাইভ ওয়েতে গাড়ির দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনল। ভুরু কুঁচকে অরূপকে বলল—"গাড়ির আওয়াজ মনে হল না?"

অরূপ টিভি দেখছিল। এষার কথা শুনেছে কি না বোঝা গেল না। বাইরে জুতোর আওয়াজ। তারপরেই ডোর-বেল। কাচের ভেতর দিয়ে এষা দেখল অনি দাঁড়িয়ে আছে।

দরজা খুলে এষা বলল—"কী রে? আসবি বলিসনি তো? আমরা খেয়ে নিলাম। জানলে ওয়েট করতাম।"

অনির মুখে মৃদু মৃদু হাসি। জুতো খুলতে খুলতে মার দিকে তাকিয়ে বলল—"খেয়ে এসেছি। ড্যাড কোথায়? আজ ফিরেছে না?"

অনির গলা শুনে অরূপ উঠে এল। আজকাল ছেলের সঙ্গে মাসে দু-তিন বারের বেশি দেখা হয় না। অনি নিউ ইয়র্কে মাউন্ট সাইনাই হসপিট্যালের কাছেই অ্যাপার্টমেন্ট নিয়েছে। যে উইক-এন্ডে বাড়িতে আসে, অরূপ সেদিন আর কোনো পার্টিতে যেতে চায় না। ছেলের সঙ্গে বসে বসে টিভিতে বেসবল গেম দেখে। নতুন নতুন অসুখ বিসুখ, তার ওষুধ আর চিকিৎসার খবর নেয়। এক সময় অনি হুঁ, হাঁ করে জবাব দিচ্ছে দেখে অরূপ বলে—"গো, গেট সাম স্লিপ।" তারপর নিজেও সোফায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে। টিভি চলতে থাকে। কার্পেটের ওপর কুশন মাথায় দিয়ে অনি ঘুমোয়। সোফায় অরূপের মৃদু নাক ডাকে। এষা ঘরে এসে দু'জনের গায়ে দুটো কম্বল চাপিয়ে দেয়। এই হচ্ছে অরূপের কাছে ছুটি কাটানোর সবচেয়ে ভালো উপায়।

কিন্তু আজ হঠাৎ বুধবার রাতে অনি চলে এসেছে দেখে অরূপ অবাক হল—"আজ মিডউইক-এ চলে এলি? কাল অফ নিয়েছিস?"

অনি মাথা নাড়ল—"সকালে অফ নিয়েছি। আফটার-নুন-এ যাব। তুমি আজ ফিরলে কখন?"

—"আটটা নাগাদ। হিউস্টনে ঝড়বৃষ্টি শুনে ভাবলাম ফ্লাইট ডিলে করবে। কিন্তু দেরি হয়নি।"

ওরা ডাইনিং রুমে বসল দেখে এষা জিজ্ঞেস করল—"কফি করব? নাকি আইসক্রিম দেব?"

কেউ কিছু খেতে চাইল না। ওদের কথাবার্তার মাঝে এষা একটা অমৃতি নিয়ে এসে অনিকে বলল—"সনাতন টেম্পলের প্রসাদ। খেয়ে নে।"

অনি মিষ্টি ভালবাসে না। একটু গুঁড়ো মতো ভেঙে নিয়ে বলল—"আবার তোমরা মিষ্টি খাওয়া শুরু করেছ? দিস ইজ নট রাইট। ড্যাড, তুমি এসব খাচ্ছ?"

অরূপ ভাবছিল ভাঙা অমৃতিটা এষা ওকে দেবে। দেশ থেকে ফিরে কদিন খুব মিষ্টির লোভ হয়। কলকাতা থেকে আনা বলরামের সন্দেশগুলো শেষ। শোনপাপড়ি ক'টা মনে হয় এষা একাই উড়িয়েছে। মাঝে আবার কবে অমৃতি কিনে নিয়ে সনাতন টেম্পলে গিয়েছিল। আজ নিশ্চয়ই অরূপকে একটা দিত। কিন্তু এখন অনির সামনে আর দেবে না। ভাঙা অমৃতিটা নিয়ে এষা কিচেনে চলে গেল।

অরূপ অনিকে বোঝাল—"না, না মিষ্টি ফিস্টি অত খাই না। ইনফ্যাক্ট পার্টিতে গিয়েও ডেসার্ট বাদ দিই।"

—"খেয়ো না। কী দরকার?"

এষার গলা শোনা গেল—"অনি, এক গ্লাস দুধ খাবি?"

—"দিতে পারো।"

এষা দুধ এনে রাখার পর অনি জিজ্ঞেস করল—"মা, কাল সকালে কি কোথাও বেরোবে?"

—"না। কাল তো ক্লিনিং লেডি আসবে। বাড়িতেই থাকব।"

—"কখন আসবে?"

—"ভেরোনিকা বারোটার আগে আসে না। তুই দেরি করেই উঠিস।" নয়তো, তোর ঘরটা বাদ দিতে বলব। অন্যদিন ক্লিন করবে।"

অনি কিছু ভাবছিল। অরূপ এষাকে বলল—"কাল ভেরোনিকাকে আসতে বারণ করে দাও না। সকালে ফোন করে দিও।"

অনি মার দিকে তাকাল—"দ্যাট সাউন্ডস বেটার। কাল আমার সঙ্গে তোমাকে একটু বেরোতে হবে। অ্যান্ড দ্যাট উইল টেক টাইম।"

এষা জিজ্ঞেস করল—"কোথায় নিয়ে যাবি? লাঞ্চ খেতে?"

অনি বলল—"ঠিক আছে।"

—"কিন্তু বেরোতে বলছিস কেন? শপিং করতে হবে?"

অনি হাসল—"পূর্ণার জন্যে এনগেজমেন্ট রিং কিনব।"

এষা এতক্ষণে অনির বাড়িতে আসার কারণটা বুঝতে পারল। কাল পূর্ণার জন্য এনগেজমেন্ট রিং কিনবে। তার মানে, বছর খানেকের মধ্যেই বিয়ে করার ইচ্ছে।

এষার গলায় খুশির আভাস—"তাহলে হিরের আংটির জন্যে সেভিংস হয়েছে? নাকি আমাকে লাঞ্চ খাইয়েই তারপর আংটি কিনে দিতে বলবি?"

অনি কাঁধ ঝাঁকিয়ে হেসে উঠল—"আই ডোন্ট মাইন্ড! তুমি চাইলে কিনে দিতে পারো।"

অরূপ খুব খুশি। এষাকে জিজ্ঞেস করল—"অনিকে কোন দোকানে নিয়ে যাবে? স্টাইন জুয়েলার্সে?"

—"সেটাই ভাবছি। ডায়মন্ডের ক্ল্যারিটি, কোয়ালিটি, অত কিছু বুঝিও না। শার্লিনের বোন ওখানে জেমোলজিস্ট। আগে স্টাইন জুয়েলার্সেই গিয়ে দেখি।"

অনি বলল—"মা, দামের ব্যাপারে একটা আইডিয়া দাও তো।"

—" তুই কতর মধ্যে কিনতে চাইছিস?"

—"অ্যারাউন্ড ফাইভ থাউসেন্ড। এর বেশি স্পেন্ড করতে চাই না।"

অরূপ হঠাৎ অনির পিঠে চাপড় মেরে বলল—"পাঁচ হাজার ডলারে না হলে আর এক হাজার দিবি। এই বয়স থেকে এত হিসেব করিস না।"

শুনে এষা আর অনি দু'জনেই হেসে অস্থির। এই অরূপ চিরকাল এষাকে বেহিসেবী খরচ করো বলে লেকচার দিয়েছে। এষা গয়না কিনলে ব্যাড ইনভেস্টমেন্ট বলেছে। অনির জুতো আর জামাকাপড়ের দাম শুনে চোখ কপালে তুলেছে। নিজের তো কোনো শখই নেই। সারাক্ষণ শুধু ইনভেস্টমেন্টের কথা। এখন নিজেই আবার অনিকে বলছে এত হিসেব করিস কেন?

ওদের হাসাহাসির মাঝখানে অরূপ হাত নেড়ে বলে গেল—"যা পছন্দ হয় কিনে নিও। দামের জন্যে ভাবতে হবে না।"

মে মাসের শেষে মেমোরিয়াল-ডে উইক-এন্ডে তিনদিনের ছুটি ছিল। রবিবারে এষারা এনগেজমেন্ট পার্টি দিল। পূর্ণাদের ফ্যামিলিটা ছোট। তবে ধারে কাছে ওদের আত্মীয়স্বজন কিছু আছে। অরূপ আর এষার বন্ধু-বান্ধব মিলিয়ে শ'দেড়েক লোক হয়ে গেল। তার ওপর অনি আর পূর্ণার বন্ধুর দল। অরূপের ইচ্ছে ছিল বাগানে বিরাট ক্যানপী টাঙিয়ে পার্টি দেবে। বৃষ্টির ভয়ে এষা রাজি হল না। এনগেজমেন্ট পার্টি মানে ড্যান্স ফ্লোর চাই। ডিসক জকি চাই। কেটারারদের জন্যে পুরো একদিক ছেড়ে দিতে হবে। দেড়শো-দুশো লোক বাড়িতে ঢুকে বাথরুমে যাবে। ডেকরেটররা বাগানের এক কোণে পোর্টেবল টয়লেট এনে বসিয়ে দেয়। কিন্তু আলমারির মতো ওই খুপরির মধ্যে মেয়েরা ঢুকতে চায় না। একগাদা খরচ করে এত ব্যবস্থার পরেও যদি তুমুল বৃষ্টি নামে তো হয়ে গেল। এষা তাই অরূপের প্যান্ডেল খাটানোর কথায় কান দিল না। মরিস টাউনের রেস্তোরাঁয় গিয়ে কথাবার্তা বলে এল। সিন্ধি মালিক সতীশ মেহতানি খুব করিৎকর্মা লোক। ইন্ডিয়ানদের বড় বড় পার্টির ব্যাপারে একেবারে ভেটারেন। ওর হাতেই অনির এনগেজমেন্ট পার্টির ভার দিয়ে এষা নিশ্চিন্ত হল।

হিরের আংটি পূর্ণার খুব পছন্দ হয়েছে। পার্টির দিন ছোট্ট করে আশীর্বাদ হয়ে গেল। দেড়শো লোক আশীর্বাদ করতে করতে ধান, দুর্বো শেষ। শেষে ফুলের পাপড়ি টাপড়ি ছিঁড়ে কাজ চালানো হল। অরূপ মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। একবার অনির দিকে তাকায়। একবার পূর্ণার দিকে তাকায়। বক্তৃতার শেষে পূর্ণার বাবা ডাঃ অরুণ শর্মাকে বলল—"আজ হতে আমরা আত্মীয়....এতদিন আমাদের একটি ছেলে ছিল। আজ হতে একটি মেয়ে পেলাম....."। অরুণ শর্মাও গদগদ হয়ে সুর মেলাল।

ডিনারের সময় অনি মজা করে বলল—"ড্যাড, তুমি তো আজই প্রায় ওয়েডিং স্পিচ দিয়ে দিলে! শর্মাদের অলরেডি আত্মীয় বানিয়ে দিলে। তাহলে বিয়ের রিসেপশনে কী বলবে?"

অরূপের মুখ-ভর্তি খাবার। উত্তর দেওয়ার আগেই এষা গলা বাড়িয়ে ছেলেকে বলল—"দু'গেলাস ওয়াইন খেয়েই এত কথা! তোর বিয়ের দিন কী হবে ভেবে দেখ!"

অরূপ চিংড়ির রোল খেতে খেতে বলল—"সেদিন তো একটা কবিতা বলব। টেগোরের সুমঙ্গলী বধূ। দ্যাটস ইট। পূর্ণা, কবিতাটা তোমার জন্যেই পড়ব। উইথ ইংলিশ ট্র্যানস্‌লেশন।"

ওরা ইংরিজিতে কথাবার্তা বলছিল। অরুণ শর্মা আর তার বউ রেখা টেবিল থেকে উঠে কাদের সঙ্গে কথা বলতে গেছে। অনি আর এষা অরূপের স্পিচ নিয়ে রসিকতা করছে দেখে পূর্ণা বলল—"আংকলের স্পিচ আমার খুব ভাল লেগেছে। নিজের ফিলিং এক্সপ্রেস করেছেন। আমার বাবাও তাই।"

অরূপ খুশি হল—"অ্যান্ড উই মিন ইট। আমাদের কালচারে বিয়ে মানে তো শুধু দুজনের মধ্যে রিলেশনশিপ নয়। দুটো ফ্যামিলির মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হল। সে কথাই বলেছি।"

এনগেজমেন্টের মাস খানেক পরে অনিদের বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেল। নভেম্বরের থ্যাংকস-গিভিং হলিডেতে বিয়ে হবে। অনির সময় নেই। পূর্ণাই তার বাবা, মার সঙ্গে বিয়ের হল দেখতে যাচ্ছে। অরুণ শর্মা শেষ অবধি ম্যারিয়ট হোটেলে হল বুক করল। অরূপ বার বার

বলছে জয়েন্ট রিসেপশন হোক। অরুণ শর্মা রাজি হচ্ছে না। বরাত পার্টিকে মেয়ের বিয়েতে খাইয়ে পয়সা নিতে পারবে না। অথচ আজকাল অনেকেই জয়েন্ট রিসেপশন দিচ্ছে। দেশেও হচ্ছে। অরূপের ধারণা এটা প্রগতির লক্ষণ। মেয়ের বাবার ঘাড়ে বিয়ের গুরুভার চাপিয়ে দেওয়া আর কতকাল চলবে?

কিন্তু আমেরিকায় বসে অরূপ সেই সদবিবেচনা দেখাতে পারছে না। অরুণ শর্মা চান্স দিচ্ছে না। অরূপ খরচের কথা তুললেই রামভক্ত হনুমানের মতো জোড়হাত করে এক কথা—"আমার মা বারণ করেছেন, মার কথা অমান্য করি কী করে?"

এষা মনে মনে ভাবে যাক গে। তুমি ডাক্তার। টাকার তো শেষ নেই। বুড়ি মার হুকুমে ছ'শো লোক খাইয়ে দাও। আরও যা প্রাণ চায় করো। মেয়ের বিয়েতে কোয়ার্টার মিলিয়ন ডলার খরচ করা তোমাদের কাছে আর কী?

দেখতে দেখতে সময় চলে যাচ্ছে। এষা দেখল হাতে মোটে কয়েকটা মাস। নিজেদের দিকের তোড়জোড় শুরু করতে হবে। এতদিন বন্ধুদের ছেলেমেয়ের বিয়ে দেখেছে। যেটুকু পেরেছে কাজেকর্মে সাহায্য করেছে। কিন্তু এবার নিজেদের কাজ। দেশ থেকে আত্মীয়স্বজন আসবে। অরূপ অনেককেই ফোন করেছে। এষা জানে, অরূপ যে এত আনন্দ করে লোকজন জড়ো করতে চাইছে, তার প্রধান কারণ অনি ইন্ডিয়ান মেয়েকে বিয়ে করছে। অথচ ছাত্র জীবন থেকে অরূপ আমেরিকায়। জীবনের অর্ধেকের বেশি সময় আমেরিকানদের সঙ্গে কেটে গেল। তবু, নিজের এই ছোট্ট পরিবারের গণ্ডির মধ্যে তাদের আপনজন বলে সহজভাবে গ্রহণ করা, অরূপ কোনোদিন সেই ঔদার্য অনুভব করেনি। এই গোঁড়ামির কথা আগে বাইরেও বলত। এখন বলে না। চেনাশোনা ছেলেমেয়েরা আমেরিকান বিয়ে করছে। ওই সব ইনসেনসিটিভ কথা বলার কোনো মানে হয় না। অনিও তো আমেরিকান বিয়ে করতে পারত। ঠিক আছে। সে না হয় তোমার ইচ্ছের দাম দিয়েছে। কিন্তু কতদিন ধরে রাখতে পারবে? বড়জোর এক জেনারেশন। অরূপ একদিন এষার কথা শুনে বলেছিল—"তোমরা মেয়েরাই দেখছি বেশি লিবারেল্।"

এষা বুঝতে পারেনি—"তার মানে?"

—"তোমাদের উদারতা বেশি।"

—"হয়তো ঠিক তা নয়। অ্যাকসেপটেন্স। ছেলেমেয়ের ওপরে মায়াও যে বেশি।"

ইদানীং অনির বিয়ের জন্য অরূপের উৎসাহ আর ব্যস্ততা দেখে এষার মনে হচ্ছে অনি তাকেও কত স্বস্তি দিয়েছে। বিয়ের মতো আনন্দের ব্যাপার নিয়ে তিনজন কাছের মানুষের মধ্যে জাত, ধর্মের তর্ক, অশান্তি আর মান, অভিমানের জের, সেই টানাপোড়েন তাকে সহ্য করতে হয়নি।

বিয়ের বাজার করতে এষা দেশে যাবে ঠিক করল। অরূপের পক্ষে এক বছরে তিনবার ছুটি নেওয়া অসম্ভব। ক' মাস আগে দেশ থেকে ফিরেছে। আবার নভেম্বরে অনির বিয়ের জন্য ছুটি নিতে হবে। তার ওপর এই গরমে দেশে যাওয়া মানেই অসুখ বিসুখে পড়া। অরূপ এষাকেও যেতে দিতে চাইছিল না। এষা শুনল না। মাস খানেকের জন্যে চলে গেল।

এবার কলকাতায় পৌঁছে আত্মীয়স্বজনের বাড়ি দেখা করার আগে শাড়ি, গয়নার দোকানেই বেশি সময় গেল। এষার বাবা, মা থাকেন সল্টলেকে। অরূপদের বাড়ি টালিগঞ্জে। এষা

একবার যাচ্ছে পার্ক স্ট্রিটে। একবার যাচ্ছে গড়িয়াহাটে। বিয়ের খুচখাচ বাজারও কম নয়। বাঙালিদের বিয়েতে যা যা লাগে, মোটামুটি নিয়ে যাচ্ছে। তারপর মারাঠি পুরোহিত যা করে করবে। অরুণ শর্মাই পুরোহিত ঠিক করেছে।

গরমে এষার ঘোরাঘুরি করতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। তাও একদিন অরূপের জ্যাঠামশাই-এর সঙ্গে দেখা করতে গেল। বাবা নেই। জ্যাঠামশাই আছেন। অরূপ বার বার বলে দিয়েছে জ্যাঠামশাইকে বিয়ের খবর দিতে যেও। খুশি হবেন। অরূপের ইচ্ছে বিয়ে মিটলে অনিদের নিয়ে একবার কলকাতায় যাবে। তখন জ্যাঠামশাই-এর নামে চিঠি ছাপিয়ে একটা রিসেপশন দেওয়ার কথাও ভাবছে। আগে এষা গিয়ে ওঁকে খবরটা দিক।

প্রতাপাদিত্য রোডের বাড়িতে গিয়ে এষা দেখল ব্রততাদি তখনও কলেজ থেকে ফেরেননি। জ্যাঠামশাই মেয়ের কাছে থাকেন। জেঠিমা অনেকদিন মারা গেছেন। এষা ওঁকে দেখেনি। ব্রততীদির নিজের ভাইবোন নেই। অরূপরা ওঁকে বড়দি বলে। ওঁর স্বামীও ক'বছর হল মারা গেছেন।

এষা জ্যাঠামশাইকে প্রণাম করতে মাথায় হাত রাখলেন। ক'মাস আগে দেখা হয়েছে। সেবারও লক্ষ্য করেছিল উনি যেন কেমন চুপচাপ হয়ে গেছেন। বুড়ো মানুষ, সারাদিন প্রায় একাই থাকেন। চেহারাও যেন খারাপ লাগছে।

এষা জিজ্ঞেস করল—"কেমন আছেন জ্যাঠামশাই? শরীর ঠিক আছে?"

ভাঙা ভাঙা গলায় জ্যাঠামশাই উত্তর দিলেন—"আছি সেই রকমই। মাঝে মাঝে প্রেশারটা বেড়ে যায়। এ বয়সে যেমন হয়....। এবার রূপু আসেনি শুনলাম?"

—"না। আমি একাই এসেছি। জ্যাঠামশাই, অনির বিয়ে ঠিক হয়েছে।"

বৃদ্ধ একটু নড়েচড়ে বসলেন—"অনির্বাণের বিয়ে? কোথায় ঠিক করলে? কলকাতায়?"

—"না। আমেরিকার মেয়ে। অনি নিজেই ঠিক করেছে।"

জ্যাঠামশাই ভুরু কুঁচকে চেয়ে আছেন—"অনির্বাণ আমেরিকান বিয়ে করছে?"

এষা ওঁকে আশ্বস্ত করতে চাইল—"না, না, ইন্ডিয়ান মেয়ে। ওখানে জন্মেছে। আমাদেরই মতো, ইমিগ্র্যান্ট।"

—"কী জাত বউমা?"

এষা বলল—"বাঙালি না। কাশ্মিরী। পদবী শর্মা। নাম পূর্ণা।"

জ্যাঠামশাই হাসলেন—"বাঃ বেশ নাম। পূর্ণা। তোমাদের জেঠিমার নাম ছিল অন্নপূর্ণা।"

—"এ মেয়ের নাম সম্পূর্ণা। নিজে ছোট করে নিয়েছে।" জ্যাঠামশাই মাথা নাড়লেন—"ভালো। নামটি সুন্দর। তা অনির্বাণ তো ডাক্তার হয়েছে। ওর বউও ডাক্তার?"

—"না। বউ লইয়ার। সবে পাস করেছে।"

—"ও বাবা, তবে তো ডাক্তারে উকিলে মিলে ভালো পশার জমাবে! তোমাদেরও সুবিধে হলো। কাউকে ফি দিতে হবে না।"

এষার ভালো লাগছিল। নাতির বিয়ের খবরে ওঁর কথাবার্তার সুর পাল্টে গেছে। জ্যাঠামশাই অনির মুখে ভাত দিয়েছিলেন। কিন্তু বিয়ে আর দেখা হবে না। এষার বাবাও যেতে পারবেন না। এঁদের জন্যেই অনির বিয়ের পর একবার আসতে হবে।

ব্রততীদি ফিরলেন। এষার আর বেশিক্ষণ বসার সময় নেই। ব্রততীদি বললেন—"রাস্তায় এত ভিড়! জানি তুমি আজ আসবে। তাও দেরি হয়ে গেল।"

—"বুঝতেই পারছিলাম। কলকাতার রাস্তাঘাটের যা অবস্থা! আপনারা যে কী করে রোজ কমিউট করেন!"

—"উপায় কী বলো? মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যেও দেখি ট্র্যাফিক জ্যামে বসে আছি। বাস নড়ছে না।"

জ্যাঠামশাই ব্রততীদিকে বললেন—"বউমাকে চা টা কিছু দেওয়া হয়নি। তোর জন্যে বসেছিল। আমাকেও চা দিতে বল।"

চা খেতে খেতে অনির বিয়ের কথা হল। ব্রততীদি ঘুম ঘুম চোখ তুলে যেন অবাক—"অনিরও বিয়ে? এই সেদিন পর্যন্ত দেশে এসে সারা ছাত দৌড়ে বেড়াত! মনে আছে? উড়ে শম্ভুর সঙ্গে ইংরিজিতে ফটর ফটর করতে করতে চিড়িয়াখানায় চলে গেল!"

জ্যাঠামশাই কিন্তু আর ওদের গল্পে যোগ দিচ্ছেন না। নিজের মনে কিছু চিন্তা করছেন। একবার ব্রততীদিকে কী বলতে গেলেন। ব্রততীদি খেয়াল করলেন না। জ্যাঠামশাই বারান্দা থেকে উঠে গেলেন। একটু পরে ফিরে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন। এষা ওঁর মধ্যে এক চাপা অস্থিরতা লক্ষ্য করছিল। ব্রততীদির কথার মাঝখানে জ্যাঠামশাই হঠাৎ অধৈর্য হয়ে উঠলেন—"আটটা বেজে গেল। বউমা আর বেশিক্ষণ বসবে না।"

বাবার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্তে চেয়ে থেকে ব্রততীদি বললেন—"জানি। একটু সময় দাও। একটা ভালো খবর দিতে এসেছে। শুনতে দাও।"

জ্যাঠামশাহ-এর অপ্রতিভ মুখখানা দেখে এষার মায়া হল। বুড়ো মানুষদের যা হয়। এক কথা দশবার বলেন। হয়তো সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করছেন। তুচ্ছ কথা বলে ব্রততীদি কানে নিচ্ছেন না। তবু ওঁর কত ধৈর্য।। এত বছর ধরে জ্যাঠামশাই-এর দেখাশোনা করছেন। মা নেই। ভাইবোন নেই। স্বামী নেই। একটা মাত্র মেয়ে। সেও অস্ট্রেলিয়ায়। বাবাকে ছেড়ে ব্রততীদি কোথাও যেতে পারেন না। চাকরি আর বাবার দেখা দেখাশোনা, এই-ই ওঁর জীবন।

জ্যাঠামশাই নিজের ঘরে চলে গেছেন। ব্রততীদি আর এষা বারান্দায় বসে আছে। সন্ধে থেকে হাওয়া উঠেছে। হাওয়ায় যুঁই ফুলের গন্ধ। ব্রততীদির ছাদের বাগান থেকে ভেসে আসছে। এষার আজ সময় মতো ওঠা হল না। ব্রততীদি বলেছেন ওঁর কিছু কথা বলার আছে, যা শুধু এষাই জানবে। আর ফিরে গিয়ে অরূপকে বলবে। কলকাতায় কারুকে জানাতে চান না ওঁরা।

এষা প্রথমে ভেবেছিল হয়তো কোনো বৈষয়িক ব্যাপার। অরূপদের বর্ধমানে কিছু জমি-টমি আছে। জ্যাঠামশাই-এরও নিশ্চয়ই অংশ আছে। সেই নিয়েই হয়তো ঝামেলা হচ্ছে। এষার শাশুড়ি আর ভাসুরদের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে যদি কোনো অশান্তি হয়েও থাকে, ওরা সে সব জানে না। কে জানে? দূরে থেকে কতটুকুই বা খবর রাখে? তবে সেরকম হলে শাশুড়ি কি আর বলতেন না? এষা ঠিক বুঝতে পারছিল না।

ব্রততীদি বললেন—"কোথা থেকে যে শুরু করি। অনেক পুরনো ঘটনা। এতদিন নিজেদের মধ্যে রেখেছিলাম। এখন বাবা আর পারছেন না। অরূপকে জানাতে চাইছেন। জানি না তোমরা কী করতে পারবে?"

এষা ভাবল নির্ঘাৎ বিষয় সম্পত্তি নিয়ে লেগেছে। ওই বর্ধমানের জমিজমার ব্যাপার।

জ্যাঠামশাই জানেন অরূপ দেশের প্রপার্টি নিয়ে মাথা ঘামায় না। ওঁকে ভালোবাসে। ভক্তি করে। তাই অরূপের সাহায্য চাইছেন। কিন্তু এই প্যাঁচ পলিটিক্সে কে থাকবে? এষা গম্ভীর হয়ে গেল।

ব্রততীদি জিজ্ঞেস করলেন—"তোমাদের ওদিকে এলিজাবেথ টাউন আছে, চেনো?"

কোথায় বর্ধমান আর কোথায় এলিজাবেথ? মনটাকে ঘুরিয়ে আনতে ওর একটু সময় লাগল—"এলিজাবেথ? হ্যাঁ, গেছি দু-একবার। আমাদের দিকে নয়। সাউথে। কেন? কেউ আছে ওখানে?"

—"বাবা ছিলেন। প্রায় ষাট বছর আগে। পোর্টে চাকরি করতেন"।

এষা অবাক—"জ্যাঠামশাই আমেরিকায় ছিলেন? কই বলেননি তো কখনও? আমরা ধারণা ছিল উনি একবার ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন।"

ব্রততী বললেন—"কেন যে বলেননি তাই ভাবি। আসলে সে যুগের ব্যাপার জানো তো। ডিভোর্সের কথা লোকে পাঁচ কান করত না।"

এষা ঠিক বুঝতে পারছে না—"ডিভোর্স মানে? জ্যাঠামশাই কি আগে বিয়ে করেছিলেন?"

ব্রততীদি যেন সহজ হওয়ার চেষ্টা করলেন—"হ্যাঁ। বাবার কথা ঠাকুমারা জানতেন। কিন্তু তার বাইরে কেউ জানত বলে মনে হয় না। বিলেত, আমেরিকায় একবার বিয়ে করে, সে বিয়ে ভেঙে গেছে, এরকম হত। লোকে জানাতে চাইত না।"

এষা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, তারপর জিজ্ঞেস করল—"আর আপনার মা? তিনিও কখনও জানতে পারেননি?"

—"বাবা নাকি মাকে বলেছিলেন। আমি কিন্তু কখনও মার কাছে শুনিনি। আমাকে বাবাই বলেছেন। সেও মা মারা যাওয়ার অনেক পরে।"

—"ব্রততীদি, একটা এপিসোড কবে শেষ হয়ে গেছে। এত বছর পরে কেন সে কথা জানাতে চাইছেন?"

—"কারণ, বাবা তাঁর ছেলের খবর চান।"

এষা স্তম্ভিত। জ্যাঠামশায়ের ছেলে আছে? অথচ কেউ তার কথা জানে না! অরূপ কি শুনলেও বিশ্বাস করবে? জ্যাঠামশায়ের এরকম সিক্রেট পাস্ট আছে ভাবা যায়?

—"ব্যাপারটা একটু খুলে বলবেন? উনি যাঁকে আগে বিয়ে করেছিলেন তিনি এখনও বেঁচে আছেন?"

ব্রততীদি মাথা নাড়লেন—"জানি না। বাবা তার কথা কোনোদিনই খুলে বলেননি। বাবা মার্চেন্ট নেভিতে ছিলেন। অল্পদিনের জন্যে আমেরিকায় গিয়ে বিয়ে করে থেকে গিয়েছিলেন। যতদূর জানি, তিন বছরের মধ্যেই ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল। দু' বছরের ছেলে রেখে বাবা চলে আসেন।"

এষাকে বাবার কাছে বসিয়ে রেখে ব্রততীদি নিজের কাজকর্ম সারছিলেন। এষা বুঝতে পারছিল জ্যাঠামশাই সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। ও নিজে থেকে জিজ্ঞেস করল—"আপনার ছেলের এখন কিরকম বয়স হবে জ্যাঠামশাই? নাম কী?"

জ্যাঠামশাই-এর গলার স্বর জড়িয়ে যাচ্ছে। চশমার কাচের ওপারে ক্লান্ত, বিষণ্ণ দৃষ্টি। এষা

ওঁর হাত ধরেছিল। জ্যাঠামশাই বললেন—"নাম ছিল রায়্যান। দু' বছরের ছেলে নিয়ে ওর মা আলাদা হয়ে গেল। তার স্বভাব, চরিত্র ভালো ছিল না। তার থেকেই অশান্তি, ঝগড়া। অল্প বয়সের মোহের ঘোরে কী ভুল যে করেছিলাম বউমা! আজ তার প্রায়শ্চিত্ত করছি।"

—"প্রায়শ্চিত্ত বলছেন কেন জ্যাঠামশাই? বিয়ে ভেঙে যাওয়াটা কি পাপ?"

জ্যাঠামশাই বললেন—"আমি তাও মিটমাটের চেষ্টা করেছিলাম। সুজ্যান রাজি হল না।"

—"সেই যে চলে এসেছিলেন, তারপর আর কোনো খবর পাননি?"

—"রায়্যানের খোঁজ খবর চেয়ে এলিজাবেথের একজন লোককে চিঠি দিয়েছিলাম। সেই লিখেছিল সুজ্যান আবার বিয়ে করেছে। রায়্যানকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে।"

—"আর কখনও খোঁজ করেননি?"

জ্যাঠামশাই মাথা নাড়লেন—"নাঃ। আর চেষ্টা করিনি। আমিও তো আবার সংসার করলাম। ওই পর্বটা ভুলে থাকতে চেয়েছিলাম।"

এষা জিজ্ঞেস করল—"এখন তাকে দেখতে ইচ্ছে করে?"

—"দেখা কি আর হবে? সে কোথায় আছে, আমার কথা জানে কি না, কিছুই তো জানি না রে মা। তাই ভাবছিলাম, তোমরা যদি একবার খোঁজ করো।"

—"চেষ্টা করে দেখি। আসলে শুধু নাম থেকে খুঁজে বার করা তো যাবে না। ছবি আছে আপনার কাছে? এলিজাবেথের কোনো ঠিকানা আছে?"

বালিশের তলা থেকে পুরনো একটা খাম বার করলেন জ্যাঠামশাই। ভেতরে কোন কালের এক রঙিন ছবি। নেভীর পোশাক পরা জ্যাঠামশাই। কোলে দেড়-দু বছরের ছেলে।

ঘরে ব্রততীদি এসে দাঁড়িয়েছেন। এষার মনে হল ওঁর যেন কেমন নিস্পৃহ ভাব। তবে কি জ্যাঠামশায়ের কথায় এষার আগ্রহ দেখানো ঠিক হবে? উনি শেষ বয়সে ছেলের খোঁজ নিতে চাইছেন। কিন্তু আত্মীয়স্বজন কেউ তো কিছু জানে না। ব্রততীদি জানাতেও চান না। তার মানে কি ওঁর এই ব্যাপারটা ভাল লাগছে না? যাকে জীবনে কখনও দেখেননি, তাকে হঠাৎ ভাই বলে মেনে নেওয়া। ব্রততীদি হয়তো কখনই তা পারবেন না। এষার প্রথম থেকেই মনে হচ্ছিল ব্রততীদি শুধু জ্যাঠামশাইয়ের জন্যে এত কথা বলেছেন। নয়তো কে আর এসব ঘটনা বাইরে জানাতে চায়?

ছবি হাতে নিয়ে এষা সরাসরি প্রশ্ন করল—"ব্রততীদি, সত্যিই কি তাহলে ফিরে গিয়ে খোঁজ খবর করব?"

ব্রততীদি সামান্য হাসলেন—"আমার মতামত চাইছ?"

জ্যাঠামশাই বলে উঠলেন—"খুকুও চাইবে। আজ না হোক, একদিন ঠিক মনে হবে। তখন আমি বেঁচে থাকব না। বউমা, এ কাজটা তোমাদেরই করতে হবে।"

গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ব্রততীদি বললেন—"বাবার দুঃখটা বুঝি। আর কতদিনই বা বাঁচবেন। যদি পারো, একবার চেষ্টা করে দেখো।"

দেশ থেকে চলে আসার আগে এষা প্রথমে ওর মাকে, আর দু'দিন পরে শাশুড়িকে জ্যাঠামশাই-এর কথা বলে দিল। ও যে একটা রহস্য উদ্ধার করতে যাচ্ছে, সেই উত্তেজনা লুকিয়ে রাখতে পারছিল না। কিন্তু শাশুড়িকে চমকে দেওয়া গেল না। তিনি নাকি অরূপের বাবার কাছে শুনেছিলেন। কিন্তু ছেলেদের বলেননি। জ্যাঠামশাই-এর ওপরে অরূপদের শ্রদ্ধা,

ভক্তির বহর দেখে ঠাকুমাই বলতে বারণ করেছিলেন। ব্রততীদি জানেন শুনে এষার শাশুড়ি বললেন—"বুড়ো বয়সে ভীমরতি! মেয়েটাকে বলার কী দরকার ছিল? সারা জীবন বাপের সেবা করছে। আর এখন উনি ছেলে ছেলে করে মরছেন! মেমের ছেলে এসে ওঁর মুখে আগুন দেবে?"

এষা ওঁকে উসকে দিল—"তারপর দেখবেন বর্ধমানের জমিরও ভাগ চাইবে!"

শাশুড়ি রেগে উঠলেন—"তোমার সঙ্গে বটঠাকুরের এসব কথাও হয়েছে নাকি?"

এষা সামলে নিলো—"না মা, এমনি, মজা করছিলাম।"

আমেরিকায় ফিরে এসে এষা বিয়ের ব্যস্ততায় জড়িয়ে পড়ল। অরুণ আর রেখা শর্মা দু-তিন দিন পরে পরে ফোন করছে। বিয়ে কতক্ষণ ধরে হবে, হল ডেকোরেশন, টেবিলে টেবিলে কেমন ফুল সাজানো হবে, ককটেল আর ডিনার মেনু ঠিক করা, কেক কত উঁচু হবে, সঙ্গীত সেরিমনি, মেহেন্দী সেরিমনি, গণেশ পুজো, বরাত পার্টি মোট দুশোর মধ্যে থাকছে কি না—প্রত্যেক ব্যাপারে শর্মারা ওদের সঙ্গে কথা বলছে।

অরূপও ব্যস্ত। বিয়েতে দূর থেকে কারা কারা আসবে, কতদিন থাকবে, কারা হোটেলে উঠবে, কাদের লোকের বাড়িতে তোলা হবে, কতবার এয়ারপোর্ট যেতে হবে, সব গুছিয়ে কমপিউটরে তুলছে। এষা গায়ে হলুদ আর তত্ত্ব সাজানোর ব্যাপারে বন্ধুদের ডেকে লাঞ্চ মিটিং করল। ঠিক হল ভিকো টারমেরিক দিয়ে গায়ে হলুদ হবে। যে গরমমশলার বাগানবাড়ি বানানোর স্কিম জানে, তাকে এষা ব্যাগ ভর্তি করে তেজপাতা, লবঙ্গ, এলাচ, দারচিনি দিয়ে দিল। কাশ্মীরিদের দিতে হবে। তার মধ্যে অনি আর পূর্ণার ফোন আসছে। অনি টোপর পরবে না। পূর্ণা গালভর্তি করে 'স্মল পক্সে'র মতো চন্দন পরবে না। না পরবি, না পরবি। এষা এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। তার আসল সমস্যা হচ্ছে লোক কমানো। কিছুতেই নেমন্তন্নের লিস্ট ছোট করতে পারছে না। বিয়ের খরচ না নিয়ে আচ্ছা ফ্যাসাদে ফেলেছে শর্মারা। নিজেরা চারশোর ওপর লোক ডাকছে। আর এষাদের বেলায় মোটে দুশো। এর চেয়ে আলাদা রিসেপশন করলে ভালো হত। মুশকিল হচ্ছে সকলেই যে বিয়ে দেখতে চায়।

জ্যাঠামশায়ের ঘটনাটা এষা ফিরে এসেই অরূপ আর অনিকে বলেছিল। অরূপ বিশ্বাস করতে পারছিল না। কিন্তু এ তো বাইরে থেকে শোনা কথা নয়। এষাকে উনি নিজের মুখে বলেছেন। ছেলের ছবি দিয়েছেন। অরূপ ভাবছিল—মানুষকে এত কাছে থেকেও চেনা যায় না। জ্যাঠামশায়ের এদেশে বউ ছিল। ছেলে ছিল। অথচ অরূপরা জানত ওরাই ওঁর ছেলের মতো। বড়দিরও হয়তো ব্যাপারটা অ্যাকসেপ্ট করতে কত সময় লেগেছে। জ্যাঠামশাই এখন ঠিক কী চাইছেন? হারানো ছেলের খোঁজ পেলে কি তাকে দেখতে আসবেন? এই বৃদ্ধ বয়সে তা কি সম্ভব?

অরূপ এষাকে বলেছিল—"সামনে অনির বিয়ে। এর মধ্যে এত খোঁজ খবর করার সময় কোথায়? বিয়ে মিটে যাক। তারপর দেখছি।"

অনিও ঘটনা শুনে অবাক—"স্ট্রেঞ্জ! বড় দাদু এত বছর তোমাদের কিছু বলেননি? ছেলের সঙ্গেও কনট্যাক্ট করার চেষ্টা করেননি?"

এষা বলল—"এখন একেবারে অস্থির হয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু কীভাবে খোঁজ নেওয়া যায় বল তো? ছেলের নাম রায়্যান। তার মার নাম সুজ্যান। সে বুড়িও বেঁচে আছে কি না সন্দেহ! ছেলের বয়সই প্রায় ষাটের কাছাকাছি হবে।"

অরূপ বিরক্ত হতে গিয়েও হেসে ফেলল—"এ যেন আমাদের বৈঁচিতে গিয়ে হরি আর হরির মাকে খোঁজা হচ্ছে! বুড়ো বয়সে জ্যাঠামশাই কী কাজই যে দিলেন!"

অনিও হাসছে– "বেস্ট হচ্ছে কোনো ইনফর্মেশন-এজেন্সির কাছে যাওয়া। ডিটেকটিভ এজেন্সির হেলপ নিলেও কাজ হতে পারে। নয়তো, মা, এক কাজ করো। ওই ছবিটা নিয়ে টিভি-র টকশোতে জয়েন করো। মিসিং রিলেটিভস রি-ইউনাইটেড শোতে বাবার ওই কাজিনকে ওরা এনে হাজির করবে।"

অরূপ ভুরু কুঁচকে বলে উঠল—"না। এখন আমি আর কাজিন টাজিন চাই না। এমনিতেই তোমার বিয়ের গেস্ট লিস্ট নিয়ে রোজ কাটাকুটি চলছে। আর নতুন আত্মীয়তার দরকার নেই।"

অনি পরে মার কাছে হাসছিল—"ড্যাড মনে হচ্ছে একটু জেলাস হয়ে পড়েছে। এতদিন বলত আমরাই জ্যাঠামশায়ের ছেলে। অ্যান্ড নাউ, অল অন-আ-সাডন, বড়দাদুর ছেলে আছে শুনে ড্যাড-এর রি-অ্যাকশনটা দেখছো?"

এষা বলল—"হতেই পারে। তাছাড়া একটা শকও তো! ছোট থেকে যাঁকে এত রেসপেক্ট করে এসেছে, তাঁর সম্পর্কে হঠাৎ এরকম শুনলে...."

অনি বলল—"জানি, ড্যাডের মেনে নিতে সময় লাগবে।"

সারাদিনের কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে এষা যেন এক ধরনের চ্যালেঞ্জ অনুভব করছিল। একটা বেশ কঠিন কাজ করে দেখানোর সুযোগ পেয়েছে। সুযোগটা কাজে লাগাতে হবে। এদেশে সদাব্যস্ত কেরিয়ার উইমেন-এর ভিড়ে ও কখনো নিজের জায়গা খুঁজে পায়নি। বাঙালি বন্ধুদের মধ্যে বেশিরভাগই কোনো না কোনোও প্রফেশনে আছে। আমেরিকায় আসার পর আরও পড়াশোনা করেছে। এষার কিছুই করা হয়নি । কাজ বলতে ওই দোকানে, বাজারে টুকটাক পার্ট টাইম চাকরি। এক বছর করেছে, তো ছ'মাস বসে থেকেছে। ফুল-টাইম চাকরি ওর পোষায় না। সাত সকালে উঠে মেক-আপ চড়িয়ে গাড়ি নিয়ে বেরোনো। আর সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে রান্না করা থেকে সংসারের সব ঝক্কি সামলানো। বাঙালি বরেরা কতটুকু সাহায্য করে জানা আছে। যারা করে, তারা করে। কিন্তু অরূপ যে কত কাজের লোক, এষা খুব জানে। ডবল খাটুনি খেটে এষার প্রাণ যেত। অত বাড়তি রোজগারের ঝোঁকও নেই। তার চেয়ে যখন ইচ্ছে দেশে যাবে। যতদিন খুশি কাটিয়ে আসবে। এই ওর ভাল লাগে। চাকরি মানেই দু'দিকের কমিটমেন্ট। বছরের পর বছর ঘরে, বাইরে উদয়াস্ত খাটুনি। এষার অত লড়তে ইচ্ছে করে না।

কিন্তু ইদানীং নিজেকে একটু দলছাড়া মনে হয়। বিশেষ করে ইন্ডিয়ান গ্যাদারিং-এ গেলে একেক সময় কেমন যেন আইসোলেটড লাগে। ওই যে এক কথা—তুমি কিছু কর না? সারাদিন কী করে বাড়িতে থাকো? আমি তো ভাবতেই পারি না। মাই গড, কাজের মধ্যে না থাকলে পাগল হয়ে যাবো।

এষার খুব রাগ হয়। বাড়িতে থাকি মানে কি শুয়ে থাকি? সংসার চালানোটা কাজ নয়? অনিকে কে মানুষ করল? কে বাংলা বলতে শেখাল? নয়তো ওই তোদের ছেলেদের মতো সং তৈরি হত। টিকি দুলিয়ে কানে মাকড়ি পরে ঘুরত।

কিন্তু এসব কথা তো আর বলা যায় না। ছেলে মানুষ করেছি বলে অহঙ্কার করাও

হাস্যকর। কিন্তু লোকেদের কথাবার্তা শুনলে মাঝে মাঝে এরকমই বলতে ইচ্ছে করে ওর। তাছাড়া, বাইরের কাজ কি কম? বাজারহাট, ব্যাঙ্ক, পোস্টঅফিস, গাড়ির সার্ভিসিং করানো, বাড়ি সারানো—কোনটা ও করছে না? অফিসে চাকরি না করলেই বসে থাকা হল? আজকাল অরূপও বলতে শুরু করেছে—হার্ডশিপ কি জিনিস, কোনোদিনই তো জানলে না।

ইদানীং এ ধরনের মন্তব্য এষাকে এক ধরনের কমপ্লেক্সের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছিল। কোথাও যেন নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করা যাচ্ছে না। জ্যাঠামশায়ের ছেলে খুঁজে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে ও হয়তো সেই যোগ্যতা দেখানোর চেষ্টা করছিল। অনি যাই বলুক, কাজটা মোটেই সহজ নয়। বললেই তো হল না, প্রাইভেট আই-এর কাছে যাও। টিভি-র টক-শোতে চলে যাও। এষা ওভাবে ফ্যামিলির প্রাইভেট খবর নিতে চায় না। প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশনের খরচই বা দেবে কে? সেই তো ওদের ঘাড়েই পড়বে। তার চেয়ে এষা নিজে চেষ্টা করবে। অনির বিয়ে মিটে যাক। তারপর এলিজাবেথে গিয়ে টাউনশিপের অফিসে দেখা করবে। ওদের পোস্ট অফিসে খোঁজ নেবে। তারপর টিভি-র ফক্স নিউজ চ্যানেলের সাহায্য চাইবে। দেখাই যাক না কী থেকে কী হয়?

এষার আরও একটা চিন্তা হচ্ছে। যদি সেই রায়্যান বাসুর খোঁজ পাওয়াও যায়, সে কি যোগাযোগ করতে চাইবে? হয়তো সে জ্যাঠামশাইকে স্বীকার করতেও চাইবে না। হতেই পারে। তখন এষা কী করবে? জ্যাঠামশাইকে সত্যি কথাটা জানাতে হবে। কেননা ও যে তাঁর ছেলের খোঁজ পেয়েছে, সেটা বলতেই হবে। আবার এমনও হতে পারে রায়্যান বাসু ভীষণ অভিভূত হয়ে পড়বে। আমেরিকানরা রুট খোঁজার জন্যে কী না করছে? অ্যাডপ্টেড লোক আসল বাবা, মাকে খুঁজে বার করছে। রায়্যান বাসু হয়তো তার বাবাকে কতবার দেখতে চেয়েছে। এষা যদি আজ তাকে বাবার খবর এনে দেয়, সে আশ্চর্য হয়ে যাবে না? খুশি হয়ে বাবাকে দেখতে চাইবে।

কল্পনায় এই সব আবেগময় দৃশ্য দেখতে দেখতে এষা অসম্ভব প্রেরণা পাচ্ছিল। জ্যাঠামশাইকে অভাবিত আনন্দ দেওয়ার জন্যে, অরূপ অনি আর চেনাশোনা লোকেদের কাছে নিজের অনুসন্ধান ক্ষমতার প্রমাণ দেওয়ার জন্যে এষা এক ভীষণ উত্তেজনাপূর্ণ কাজ পেয়ে গেল।

এষা অনেকদিন "হেয়ার অ্যান্ড কেয়ারে" যেতে পারেনি। মাঝে জ্বরে পড়ল। প্রায় দু' মাস পরে যেদিন বিউটি স্যালনে গেল, দুপুরে তেমন ভিড় ছিল না। এষা লেসলির কাছে শ্যাম্পু করছিল। চোখ খোলার পর সামনের আয়নায় ক্রিস্টিনাকে দেখতে পেল। এক মাথা কোঁকড়ানো চুল খোঁপার মতো করে জড়িয়ে রেখেছে। ঘুম ঘুম চোখে একজোড়া সরু ফ্রেমের চশমা। এষার দিকে তাকিয়ে হাসল।

এষার মনে হল দু'জন অচেনা মানুষের মধ্যে কী আশ্চর্য মিল! কথা বলার আগেই ক্রিস্টিনার ছায়া সরে গেল।

এষা কাউন্টারে বিল পেমেন্ট করার সময় ক্রিস্টিনাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করল—"তুমি বলেছিলে না তোমরা বেঙ্গলি?"

ক্রিস্টিনা দেওয়ালের তাকে নেইল-পলিশের শিশি সাজাতে সাজাতে মুখ ফেরাল—"বলেছিলাম। তোমার লাস্ট-নেম দেখে বুঝেছিলাম তুমিও বেঙ্গলি।"

এষার মাথার মধ্যে যেসব প্রশ্ন ভিড় করে আসছে, এত সামান্য পরিচয়ে তা জিজ্ঞেস করা

যায় না। কারুর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে নিজে থেকে বেশি কিছু জানতে চাওয়া মানে অশোভন কৌতূহল দেখানো। তবু এষা না বলে পারল না—"তোমার বাবা বেঙ্গলি? লাস্ট-নেম বলেছিলে বাসু? রাইট?"

ক্রিস্টিনা চলে যেতে যেতে উত্তর দিল—"ইয়েস। ফ্রম ওয়ান সাইড।"

এষা আর কথা বলার সুযোগ পেল না। বাড়ি ফেরার সময় গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবল সামনে সপ্তাহেই আবার "হেয়ার অ্যান্ড কেয়ারে" আসবে। ক্রিস্টিনার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে। কিন্তু অনির বিয়ের মুখে এষা ওর কাছে যা তা করে চুল কাটতে বসবে না। ফেশিয়াল আর পেডিকিওরের ছুতো করে চলে আসবে। তারপর মালিশের ফাঁকে ফাঁকে খবর বার করবে। এষার মন বলছে, রহস্য উদ্ধারের দেরি নেই। এ কাজ ও নিজেই করতে চায়। আগে থেকে অরূপকে, অনিকে কিছু বলার দরকার নেই।

সেদিন ভোর থেকে বরফ পড়ছে। নভেম্বরের গোড়ায় এত ঠান্ডা পড়ে যাচ্ছে দেখে অরূপ অফিস যাওয়ার সময় বলল—"এখন থেকে স্নো শুরু হল! থ্যাঙ্কস গিভিং হলিডেতে ওয়েদার কেমন থাকবে কে জানে?"

এষা ওর হাতে লাঞ্চের প্যাকেট ধরিয়ে দিয়ে বলল—"ওয়েদার ভালোই থাকবে। তাছাড়া, বিয়ে তো হোটেলে হচ্ছে। বাইরে হলে চিন্তা ছিল।"

একটু বেলায় আবহাওয়া পরিষ্কার হতে এষা "হেয়ার অ্যান্ড কেয়ারে" চলে গেল। ক্রিস্টিনার সঙ্গে অনির বিয়ের কথা নিয়ে গল্প শুরু করল। মুখে, গলায় ম্যাসাজের সময় বেশি বক বক করা যায় না। পেডিকিওরের সময় সুবিধে হল। এষা ক্রিস্টিনার হাঁটুর ওপর পাতা তোয়ালেতে পা তুলে দিয়ে বলল—"ইন্ডিয়া থেকে ক'জন আত্মীয় বিয়েতে আসছে। মোস্টলি ফ্রম ক্যালকাটা।"

ক্রিস্টিনা উৎসাহ দেখাল—"ওঃ, রিয়েলি?"

—"তুমি ক্যালকাটার নাম শুনেছ?"

—"বাবার কাছে শুনেছি। বাবা অবশ্য কখনও যায়নি।"

এষা হেলান দিয়ে বসেছিল। এবার সোজা হল—"তোমার গ্র্যান্ড পেরেন্টরা কি ক্যালকাটা থেকে এসেছিলেন?"

ক্রিস্টিনা এষার গোড়ালিতে ব্রাশ ঘষতে ঘষতে মুখ নীচু করে উত্তর দিল-"আমার গ্র্যান্ড ফাদার ক্যালকাটা থেকে এসেছিলেন।"

এষা ঝুঁকে পড়ছে-"তুমি তার নাম জানো?"

মুখ তুলে ক্রিস্টিনা বলল—"অ্যাশ বাসু।"

এষা ভেতরে ভেতরে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। অ্যাশ বাসু? আর কে হতে পারে? নিশ্চয়ই জ্যাঠামশাই। অশ্বিনী থেকে অ্যাশ হয়েছিলেন। কী ছাই নাম! এষা আরও ঝুঁকে পড়ল—"আর তোমার বাবার নাম? ডাজ হি হ্যাভ এনি ইন্ডিয়ান নেম?"

ক্রিস্টিনা টাবের মধ্যে পা ধোওয়াতে ধোওয়াতে মাথা নাড়ল—"নো। হিজ নেম ইজ রায়্যান।"

এষা রহস্যের কিনারায় এসে প্রায় নিশ্চিত হয়ে বলল—"আর তোমার গ্র্যান্ড মা-র নাম সুজ্যান? রাইট?"

ক্রিস্টিনা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। শুধু ক্যালক্যাটার নাম শুনে এ মহিলা এত খবর বলে দিলেন! বাসু মানে কি একটা ছোট্ট ক্ল্যান? সবাই সবাইকে চেনে? এ কথা জিজ্ঞেস করাতে এষা বলল—"না। আমি আসলে একটা সম্পর্কের খোঁজ করছিলাম। আজ কথায় কথায় বেরিয়ে গেল।"

ক্রিস্টিনা জিজ্ঞেস করল—"তুমি আমার গ্র্যান্ড মা-র নাম জানলে কী করে? উনি তো কখনও ইন্ডিয়ায় যাননি?"

এষা হাসল—"তোমার গ্র্যান্ড ফাদারের থেকে।"

ক্রিস্টিনা বিস্ময়ের ঘোরে উঠে দাঁড়িয়েছে—"সে কী? তিনি কোথায়? এখনও বেঁচে আছেন?"

ওদের কথার মাঝখানে স্যালনের ম্যানেজার ডেবি এসে দাঁড়াতে দু'জনেই থেমে গেল। ডেবি বলে গেল ক্রিস্টিনার লাঞ্চ ব্রেক হয়ে গেছে। পরের কাস্টমার আধ ঘণ্টার মধ্যে আসবে। ক্রিস্টিনা তাড়াতাড়ি করে আবার কাজ শুরু করল। চলে আসার আগে আরও কিছু কথা বলে এষা ওর বাড়ির ফোন নম্বর দিয়ে এল।

দু'দিন পরে ক্রিস্টিনার ফোন। ওর বাবা এষার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন। একবার কি দেখা করা সম্ভব? এষা ওদের ওই সপ্তাহেই আসতে বলে দিল। রায়্যান প্রায় ফিলাডেলফিয়ার কাছে থাকেন। ছুটির দিন হলে সুবিধে হত। কিন্তু এষাদের এখন উইক-এন্ডে বিয়ের কাজকর্ম এগিয়ে রাখতে হচ্ছে। ক্রিস্টিনা ওর বাবাকে নিয়ে মিড-উইকেই আসবে বলল।

এষা অরূপ আর অনিকে যখন ব্যাপারটা জানাল, ওরা প্রথমে বিশ্বাস করছিল না। আমেরিকায় রায়্যান নামে হাজার হাজার লোক আছে। এক আধজন বাসুও হতে পারে। এষা কাকে জ্যাঠামশায়ের হারোনো ছেলে বলে ধরে আনছে কে জানে? অবশ্য লতাপাতা খুঁজে আত্মীয়তা আবিষ্কারের ক্ষমতা যে ওর অসাধারণ, সে অরূপ বরাবর দেখে আসছে। তাই বলে হঠাৎ "অ্যাশ"-কে অশ্বিনীকুমার ধরে নিয়ে আচমকা তার তিন পুরুষ খুঁজে বার করা—এ কি সিনেমার গল্প নাকি? এষা এবার পুরো আন্দাজে ঢিল মেরেছে। এখন সেই ঢুলুশ্রী মেয়ে আর তার বাবা আসছে আলাপ করতে। ভদ্রতার খাতিরে এষা আবার তাদের ডিনার খেতে ডেকেছে।

অরূপের হাবভাব দেখে এষা রেগে গিয়ে অনিকে ফোন করল। ওদেরই বাড়ির জন্যে এত সময় নষ্ট করে এষা 'ইনভেস্টিগেশন' করছে। নয়তো কে এই কেচ্ছা নিয়ে মাথা ঘামাত?

অনি জিজ্ঞেস করল—"কেচ্ছা মানে কী?"

এষা কথা ঘুরিয়ে বলল—"জানি না। বাট ইউ পিপল শুড রেকগনাইজ মাই এফর্ট। তা নয়, খালি হাসাহাসি!"

শেষ পর্যন্ত শুক্রবার বিকেলে ক্রিস্টিনা তার বাবাকে নিয়ে এল। ষাটের কাছাকাছি বয়স। আমেরিকানদের তুলনায় ছোটখাটো চেহারা গোল মুখ। চশমার আড়ালে ঢুলঢুলে চাউনি। অরূপ দেখছিল জ্যাঠামশায়ের মাঝ বয়সের চেহারার সঙ্গে মেলে। সত্যি! মেয়েটাকেও অনেকটা বড়দির মতো দেখতে। এষার অবজারভেশন আছে বটে!

ওরা এসে বসার পর কেউই ঠিক কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। অসোয়াস্তি কাটিয়ে অরূপ শুরু করল—"আপনারা এষার কাছে কিছুটা জেনেছেন নিশ্চয়ই? আমার আঙ্কল অনেক বছর

আগে এসেছিলেন। বিয়ে করেছিলেন। দ্যাট ওয়াজ হিজ ফার্স্ট ম্যারেজ। ওর স্ত্রীর নাম ছিল সুজ্যান। ছেলের নাম রায়্যান। আমার আঙ্কলের নাম অশ্বিনী বাসু। আপনি কিছু রিলেট করতে পারছেন?"

নিজের ওয়ালেট থেকে একটা ছবি বার করলেন ভদ্রলোক। অরূপের হাতে দিয়ে বললেন—"আমার বাবার ছবি। এঁর কথা আমার কিছুই মনে নেই। শুধু ছবি দেখেছি।"

অরূপের চিনতে ভুল হল না। জ্যাঠামশায়ের কম বয়সের ছবি। মাথা নেড়ে বলল—"হ্যাঁ, ইনি আমার বাবার বড় ভাই।"

রায়্যান জিজ্ঞেস করলেন—"ওঁর কাছে আমারও ছবি দেখেছেন শুনলাম। সে ছবিখানা একবার দেখতে পারি?"

এষা জ্যাঠামশায়ের দেওয়া ছবিটা এনে রায়্যানের হাতে দিল। ভদ্রলোক কতক্ষণ ধরে ছবিখানা দেখলেন। মেয়ের হাতে দিয়ে বললেন—

—"দিস ইজ ইওর গ্র্যান্ড ফাদার। অ্যান্ড দ্যাটস মি।"

ওঁর গলা ভারি হয়ে এল। একটু চুপ করে থেকে অরূপকে বললেন—

—"বেঁচে আছেন শুনেছি। হি মাস্ট বি ইন হিজ এইটিজ্?"

—"অলমোস্ট এইটি ফাইভ।"

ক্রিস্টিনা এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। মাঝে আবার কথাবার্তা থেমে আছে দেখে এষাকে জিজ্ঞেস করল—"তোমার ছেলের বিয়ে বোধহয় এসে গেল? ক্যালকাটা থেকে আত্মীয়রা আসবে বলেছিলে। আমার গ্র্যান্ড ফাদার কি আসছেন?"

এষা ওদের ডিনারের আগে স্ন্যাকস দিচ্ছিল। কফি টেবলে খাবারের প্লেট রেখে বলল—"না। ওর পক্ষে এত দূর আসা কষ্টকর। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার ট্র্যাভল। আমরাই টায়ার্ড হয়ে পড়ি।"

আরও খানিকক্ষণ কথাবার্তা হল। রায়্যান বললেন ওঁর ছবি বাঁধাহ-এর ব্যবসা। ছেলেও সেই ব্যবসা দেখে। বউ আর্ট টিচার। ক্রিস্টিনা বিউটিশিয়ানের কোর্স নিয়েছে। পরে নিজের স্যালন খোলার ইচ্ছে। ওর এনগেজমেন্ট হয়ে গেছে। সামনের বছর বিয়ে। ক্রিস্টিনার বয়ফ্রেন্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। সে এদিকে থাকে বলে ক্রিস্টিনা কাছাকাছি শহরে চলে এসেছে। এক বন্ধুর সঙ্গে অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করে আছে।

এষা জিজ্ঞেস করল—"আর আপনার মা? তিনি কোথায় থাকেন?"

রায়্যান বললেন—"মা বেঁচে নেই। গত বছর ফ্লোরিডায় মারা গেছেন। ওখানেই থাকতেন। স্টেপ-ফাদারও অনেকদিন মারা গেছেন।"

ডিনারের পর রাত হয়ে যাচ্ছে দেখে ক্রিস্টিনা উঠতে চাহছিল। রায়্যান বললেন—"হ্যাঁ, যে কথাটা জানতে এসেছিলাম। আপনার আঙ্কল হঠাৎ এতদিন পরে কেন আমার খোঁজ করছেন? দু' বছর বয়সে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। আর কখনও খবর নেননি।"

রায়্যানের কথায় বেদনার আভাস—"হি নেভার কেয়ার্ড ফর মি।"

অরূপ যেন জ্যাঠামশায়ের হয়ে কৈফিয়ৎ দেওয়ার চেষ্টা করল—"যতদূর জানি, উনি আপনাকে ছেড়ে যেতে চাননি। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েছিলেন। আসলে, ঠিক কী যে ঘটেছিল, কেউই জানি না। আঙ্কল যেটুকু বলেছেন।"

রায়্যান বললেন—"আমি যা জানি, সেও মার কাছে শোনা। বাবাকে পাইনি। একটা বয়সে তাঁকে আমার কত প্রয়োজন ছিল। এখন তো নিজেই বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। তবু, এ দুঃখ কখনও যাবে না।"

ভদ্রলোকের বিষণ্ণ মুখের দিকে চেয়ে থেকে এষা বলল—"আপনার দুঃখ আমরা বুঝতে পারছি। আঙ্কল বলেছিলেন উনি অনেকদিন পর্যন্ত আপনার খবর নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কোনোভাবেই যোগাযোগ করতে পারেননি।"

—"হতে পারে। আমরা অন্য স্টেটে চলে গিয়েছিলাম।"

ক্রিস্টিনা সোজাসুজি জানতে চাইল—"উনি কি ড্যাডকে দেখতে চাইছেন?"

এষা উত্তর দিল—"হ্যাঁ। ওঁর এক মেয়ে আছে। তার সঙ্গেই থাকেন। কিন্তু এখন কেবলই বলছেন যদি একবার ছেলের সঙ্গে দেখা হয়। যদি আমরা তাঁর খবর এনে দিতে পারি...।"

রায়্যান মৃদু হাসলেন—"আপনার আশ্চর্য ক্ষমতা বলতে হবে। যাই হোক। ছেলের খোঁজ না হয় পাওয়া গেল। তারপর? ওঁর তো এদেশে আসার ক্ষমতা নেই?"

ক্রিস্টিনা মৃদুস্বরে বলল—"তোমার আছে। ইচ্ছে হলে তুমি তাঁকে দেখতে যেতে পারো।"

রায়্যান উত্তর দিলেন না। এষা ওঁর চোখে জল দেখল।

অরূপ একটা ছোট্ট কার্ডে জ্যাঠামশায়ের ঠিকানা, ফোন নম্বর লিখে দিল। রায়্যান তাঁর ওয়ালেটের খাপে বাবার ছবির সঙ্গে কার্ডটা রাখলেন। চলে যাওয়ার সময় অরূপ আর এষাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললেন—"বাসু ফ্যামিলির লাস্ট-নেম ছাড়া তো কিছু পাইনি। আপনাদের কি আত্মীয় মনে করতে পারি?"

অরূপ ওঁর হাত ধরে সামান্য ঝাঁকুনি দিয়ে বলল—"নিশ্চয়ই। আমরা একই ফ্যামিলি থেকে এসেছি। উই আর ফার্স্ট কাজিনস।"

ক্রিস্টিনা আর তার বাবা অভিভূত হয়ে ফিরে গেলেন। রাত তখন এগারোটা। এষা হিসেব করে দেখল কলকাতায় সকাল ন'টা বেজে গেছে। অরূপকে জিজ্ঞেস করল—"জ্যাঠামশাইকে কে ফোন করবে? তুমি? না আমি?"

—"তার চেয়ে বড়দিকে আগে করো। বুড়ো মানুষ! হঠাৎ ছেলের খোঁজ পেয়ে একসাইটেড হয়ে গেলেই মুশকিল!"

—"হ্যাঁ! ছাই কুমার বসুকে তাঁর মেয়েই খবরটা দিক।"

অরূপ অবাক—"ছাই কুমার? ওঃ! অ্যাশ্ বাসু! তুমি যে কী করে ধরেছিলে!"

এষা হেসে উঠল—"যখনই দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দ্যাখো তাই। পাইলে পাইতে পারো অমূল্য রতন! আমরা রায়্যানকে পাইলাম।"

বলতে বলতে অনির ফোন এল। এষাই ধরল। অরূপ এষার অনর্গল কথা শুনতে শুনতে পাশের ঘরে গেল। অনির বিয়ের কার্ডের বাক্সে পড়ে থাকা শেষ কার্ডখানা তুলে নিয়ে খামের ওপর লিখল—মিস্টার অ্যান্ড মিসেস রায়্যান বাসু অ্যান্ড ফ্যামিলি।

—

অন্বেষা

লিংকন সেন্টারের বাইরে এসে নীলা ট্যাক্সি নেবে কিনা ভাবছিল। মাঝে কখন বৃষ্টি হয়ে গেছে। ভেজা রাস্তায় লোকজন, গাড়ির মিছিল। শহর এখনও জেগে আছে। লিংকন সেন্টারের পার্কিং গ্যারাজ থেকে একের পর এক গাড়ি বেরোচ্ছে।

মাথায় টুপ করে জলের ফোঁটা পড়তে নীলা গাছের পাশ থেকে সরে দাঁড়াল। এক পলক আকাশ দেখল। উচুঁ উঁচু বাড়িগুলোর মাথায় স্লেট-রঙা আকাশে অস্পষ্ট চাঁদ ভেসে আছে। তারা টারা চোখে পড়ল না। আবার হয়তো বৃষ্টি নামবে। সঙ্গে ছাতাও নেই। তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি নেওয়ার জন্যে রাস্তার দিকে এগোতেই পেছন থেকে কেউ নীলার নাম ধরে ডাকল।

ঘুরে দাঁড়িয়ে নীলা দেখল ওর মার বন্ধু শর্মিলা আর প্রদীপ রায়। সঙ্গে আরও ক'জন। শর্মিলা এগিয়ে এল—"কী রে? তোকে একবার অডিটোরিয়ামে দূর থেকে দেখলাম। কেমন লাগল অনুষ্কার প্রোগ্রাম?"

নীলা কাঁধ ঝাঁকাল—"নাথিং স্পেশ্যাল। আমি রবিশংকর শুনতেই এসেছিলাম। হি ইজ ওভার এইট্টি। আর তো বেশিদিন শোনার সুযোগ পাব না।"

প্রদীপ ওদের পাশে দাঁড়ানো ছেলেটির সঙ্গে নীলার পরিচয় করাল—"দিস্ ইজ সায়ন। অ্যান্ড শী ইজ নীলা।" ওরা দুজনে হাত বাড়িয়ে দিল—"নাইস্ মিটিং ইউ।"

নীলা আর দেরি করতে চাইছিল না। সামনেই ট্যাক্সি পেয়ে যেতে ওদের গুডনাইট বলে উঠে পড়ল। শর্মিলাদেরও রাত হয়ে যাচ্ছিল। ওরা কানেকটিকাটে ফিরবে। দুজনে পার্কিং গ্যারাজের দিকে যাওয়ার আগে সায়নকে বলে গেল—"একদিন ফোন করে চলে এসো। আমরা ট্রেন-স্টেশন থেকে তুলে আনব।"

সাব-ওয়েতে সিঁড়ি দিয়ে স্টেশনে নেমে সায়ন ঘড়ি দেখল। সাড়ে এগারটা বাজে। ব্রুক্‌লীনে পৌঁছে বাড়ি ঢোকার আগে একটা স্যান্ডউইচ কিনে নেবে। হঠাৎ ওর পকেটে সেল্ ফোন বাজল। যা ভেবেছে ঠিক তাই। ফ্রীমন্ট থেমে মার ফোন। সায়ন কথা শুরু করতে করতে ট্রেন এসে গেল।

ট্রেনে উঠে সায়ন আর ফোন করল না। রোজ রোজ কোনো কথা থাকে না। তবু রাতের দিকে একবার না একবার মা ওকে ধরবেই। নিউইয়র্ক থেকে ক্যালিফোর্নিয়ায় তিন ঘণ্টার সময়ের তফাৎ। ওখানে সময় পিছিয়ে থাকাতে মার আরও সুবিধে হয়েছে। সায়নকে ধরার জন্যে বেশি রাত অবধি জেগে থাকতে হয় না। ওখানে রাত আটটা-ন'টায় ফোন করলেই এখানে সায়নকে বাড়িতে পেয়ে যায়। সেল্ ফোনে সব সময় পায় না বলে বাড়িতেই লম্বা লম্বা মেসেজ রেখে দেয়।

অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে জামাকাপড় বদ্‌লে সায়ন সবে মাত্র টিভিটা খুলেছে, আবার ফোন

বাজল। আবার সেই উত্তেজিত গলা—"কী ব্যাপার বলো তো? সন্ধে থেকে তোর সেল ফোন্ অফ। বাড়িতেও ছিলি না। একটা এমার্জেন্সি হলে তোকে তো পাওয়াই যাবে না....।"

স্যান্ডউইচ খেতে খেতে সায়নের নির্বিকার প্রতিক্রিয়া—"কেন? কী আবার এমার্জেন্সি হল?

—"হলে আর তোমাকে এসে পৌঁছোতে হবে না। আচ্ছা সেল্ ফোনটা এতক্ষণ অফ করে রাখিস কেন?"

সায়ন হাসছিল—"আজ তোমার জন্যে করেছিলাম। না হলে কনসার্টের মাঝখানে কল্ করতে। এনি ওয়ে ইজ এভ্‌রিথিং ও.কে উইথ ইউ? বাবা ঠিক আছে?

সায়নের মা পাপড়ি উত্তর দিল—"বাবা তপাদের বাড়ি রিহার্সাল দিতে গেছে। এখন এই শুরু হল। প্রত্যেক শুক্রবার রাত করে ফিরবে।"

—"তুমি যাওনি কেন? তোমাকে আজকাল কাস্টিং-এ নিচ্ছে না?"

—"নাঃ ও সব মিডল্ ইস্টার্ন রোল্-টোল করতে চাই না।"

—"বেঙ্গলি ড্রামা ফেসটিভ্যালে বাবা মিডল্ ইস্টার্ন্ প্লে করছে? হাউ স্ট্রেঞ্জ!"

পাপড়ি হেসে উঠল—"ওরা 'আলিবাবা' করছে। তোর বাবা সাজছে খুব বুড়ো একটা ব্লাইন্ড ম্যান। বসে বসে ডেডবডি সেলাই করবে।"

সায়ন বলল—"টেরিফিক! হু ইজ গোয়িং টু বী দ্য ডেডম্যান? বিমল আংক্‌ল?"

—"ওকেই নেওয়া উচিত ছিল। সেদিনও দেখলাম মিটিং-এ বসে ঘুমোচ্ছে। হ্যাঁ, তুই কন্‌সার্টের কথা কী বলছিলি? আজ কোনো ফাংশানে গিয়েছিলি?"

—"হ্যাঁ। লিংকন সেন্টারে রবিশংকর আর ওর মেয়ের প্রোগ্রাম ছিল। আই ওয়েন্ট স্টেইট ফ্রম দ্য ওয়র্ক। ওখানে তোমার সেই কাজিনের সঙ্গে দেখা হল।"

পাপড়ি জিজ্ঞেস করল—"কে বল্‌তো? কার কথা বলছিস?" সায়নের ঘুম পাচ্ছিল। মার কাজিন শর্মিলা মাসিদের সঙ্গে দেখা হওয়ার খবর-টবর দিয়ে একটু পরে ফোন রেখে দিচ্ছিল। ঠিক তখনই পাপড়ি সেই এক প্রশ্ন করল— "সায়ন, এত জায়গায় যাচ্ছিস, কোনো ইন্ডিয়ান মেয়ের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে না?"

সায়ন এক মুহূর্ত ভেবে নিল—"হ্যাঁ, আজই একজনকে মিট করলাম। আমার চেয়ে বেটার বাংলা বলে।"

পাপড়ি জানতে চাইল—"বাঙালি? নিউইয়র্কে থাকে?"

—"দ্যাট আই ডোন্ট নো। শী ইজ ব্লন্ড অ্যান্ড ব্লু- আইড। বাট স্পিকস্ বেঙ্গলি উইদাউট এনি অ্যাক্‌সেন্ট।"

সায়ন রসিকতা করছে ভেবে পাপড়ি আর বেশিক্ষণ কথা বাড়াল না। ফোন রেখে সায়ন শুতে গেল। বাইরে বৃষ্টির ঝরঝর শব্দ। জানলার কাচে জলের ধারা নামছে। অন্ধকারে ঘুম আসার আগে এলোমেলো চিন্তার ফাঁকে ওর মনে হল নীলা ওর লাস্ট নেম্ বলেনি। আচ্ছা সায়ন এ সব ভাবছে কেন? এক মিনিটের আলাপে নীলার কথা ও ভুলেই গিয়েছিল। হঠাৎ মার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মনে পড়ল। তারপর আর নামটা মাথা থেকে যাচ্ছে না। এই গভীর রাতে নীলা ইন্ডিয়ান না আমেরিকান, হঠাৎ করে এরকম অবান্তর ভাবনা, অযথা কৌতূহল জাগছে কেন? আরও কিছুক্ষণ জেগে থাকার পর ঝুম বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে সায়নের ঘুম এসে গেল।

ক'দিন একটানা ঝড় বৃষ্টির পরে এপ্রিলের মাঝামাঝি বসন্ত এল। একদিন ভোরবেলা ঘুম ভেঙে ঈশানী দেখল বাগানে গোলাপী চেরি গাছ দুটো ফুলে ফুলে ভরে গেছে। হাওয়ায় ভাসছে ফুলের পাপড়ি। রবিবার এত আগে এ বাড়িতে সকাল হয় না। ভুল করে ঘড়ির অ্যালার্ম দিয়ে রেখে সন্দীপন ভোরবেলা ঈশানীর ঘুম ভাঙিয়েছে। নিজে আবার পাশ ফিরে চাদর মুড়ি দিল। অনায়াসে বেলা দশটা অবধি টানবে। মাঝখান থেকে ঈশানীর ঘুম শেষ। হাজার চেষ্টা করলেও ছেঁড়া ঘুম জোড়া লাগবে না। কাল বিয়ে বাড়ি থেকে ফিরে কত রাতে শুয়েছে। একবার সন্দীপন অ্যান্টাসিড খেতে গিয়ে জাগাল। আবার এই সাত সকালে অ্যালার্মের কিঁ কিঁ আওয়াজ!

বিরক্ত ঈশানী নীচে এসে চায়ের কেটলি বসিয়েছিল। ঠিক তখনই রান্নাঘরের জানলা দিয়ে চেরি গাছ দুটো চোখে পড়ল। ফুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে নীল প্রজাপতি উড়ছে। উইলো গাছের ডাল ধরে কাঠবেড়ালির দোল খাওয়া দেখতে দেখতে ঈশানীর অসময়ে ঘুম ভাঙার বিরক্তি দূর হয়ে যাচ্ছিল।

রোজ সকালে সন্দীপন অফিসে চলে গেলে ঈশানী হাঁটতে বেরোয়। আগে আগে ইচ্ছে করত না। কিন্তু হাঁটুর ব্যথার জন্যে ডাক্তার রোজ হনহন করে হাঁটতে বলেছে। শুরু করার পর হাঁটুর আড়ষ্ট ব্যথাটা কমেছে। বেরিয়ে পড়লে ভালোই লাগে। নরম রোদ, ঝিরঝিরে হাওয়া গায়ে মেখে উঁচু নীচু রাস্তা ধরে কিছুক্ষণ ঘুরে আসে। আজ রবিবারের নিঝুম সকালে ঈশানীর আর জামাকাপড় পালটে বেরোতে ইচ্ছে হল না। নিজের জন্যে এক কাপ চা করল। সামনের দরজা খুলে খবরের কাগজ নিয়ে ফিরে এসে দোতলায় হাঁটা চলার শব্দ পেল।

সিঁড়ি দিয়ে নীলা নেমে আসছে। চোখে এখনও ঘুম ঘুম ভাব। একরাশ সোনালী চুল রবার ব্যান্ড দিয়ে বাঁধা। দু' হাতের পাতায় মেহেন্দির কারুকাজ। ঈশানী বলল—" এত সকালে উঠে পড়লি?"

নীলা কোনো উত্তর না দিয়ে নিউইয়র্ক টাইম্‌স খুলে বসল, ঈশানী রান্নাঘরে গিয়ে মেয়ের জন্যে কফি তৈরি করতে করতে কাল রাতের ঘটনাটা ভাবছিল। বিয়েবাড়িতে প্রথমদিকে তো নীলার মন মেজাজ ভালোই ছিল। শর্মিলার মেয়ে দেবলীনা ওর ছোটবেলার বন্ধু। কাল সকালে দেবলীনার চার্চ ওয়েডিং-এ নীলা ব্রাইড্‌স্ মেইড হয়েছিল। সন্ধেবেলায় হোটেলে হিন্দু বিয়েতে ও হাতে মেহেন্দি টেহেন্দি লাগিয়ে নাচ, গান করল। কিন্তু হঠাৎ ডিনারের পর থেকে যে কি হল, একদম চুপচাপ। নীলার এই মুড বদলে যাওয়ার ব্যাপারটা ঈশানী ঠিক বুঝতে পারে না। ভয়ে ভয়ে থাকে। জানে, লোকজনের সামনে নীলা কোনো নাটক করবে না। তবু, আজকাল ওর মন মেজাজ বুঝে চলা যেন ক্রমশই কষ্টকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

কাল ফেরার পথে নীলাই গাড়ি চালাল। বিয়ের পার্টিতে সন্দীপন একটা-দুটো ড্রিংক নিয়েছিল। তাতেও ড্রাইভ করার কোনো অসুবিধে হত না। তার আগেই নীলা গাড়ির চাবি চেয়ে নিল। ওর সেই চোয়াল শক্ত হয়ে যাওয়া, টান টান ভাব লক্ষ্য করে ঈশানী পেছনের সিটে গিয়ে বসেছিল। সামনে মেয়ের পাশে বসে সন্দীপন বিয়েবাড়ির কথা বলছিল। নীলার চাপা বিরক্তি, অন্যমনস্ক ভাব কিছুই বোধহয় খেয়াল করেনি। বাবার সঙ্গে ওর সম্পর্কটা তবু বরং সহজ। ঈশানীর সঙ্গে ক্রমশই ভুল বোঝাবুঝি বাড়ছে।

রাতে বাড়িতে ফিরে আর কোনো কথা হয়নি। দু' দিন ধরে বিয়েবাড়ির পর্ব শেষ হতে ওরাও ক্লান্ত ছিল। যে যার মতো শুয়ে পড়েছিল। আজ সকালে উঠে নীলার নিরুচ্ছ্বাস ব্যবহার দেখে

ঈশানী আমার সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছে। আবার কি সেই এক অশান্তি শুরু হবে? আজ সন্দীপন বাড়িতে আছে। যা হবার ওর সামনেই হোক। ঈশানী আর মনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারছে না।

ফ্যামিলি রুমে বসে নীলা আর ঈশানী খবরের কাগজে পড়ছিল। একটু পরে সন্দীপন নীচে এল। ঈশানী বলল—"কী ব্যাপার? তোমারও কী ঘুম হয়ে গেল?"

সন্দীপন হাসল—"দূর। হতচ্ছাড়া অ্যালার্ম্ কী করে যে অন্ হয়ে যায়।"

নীলাও হাসিতে যোগ দিল—"আর উইক-ডে সকালে ঠিকমতো অন হয় না! বাবা, মা না ডাকলে কোনোদিন তুমি ঠিক মতো অফিসে যেতে পারতে না।"

নীলার ভার ভার মুখে হাসির আভাস দেখে ঈশানী একটু স্বস্তি পেল। আজ বিকেলে নীলা নিউইয়র্কে ওর অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে যাবে। দিনটা শান্তিতে কেটে গেলেই ভালো। তবে এই শান্তি যে কত ক্ষণস্থায়ী, ঈশানী দিনে দিনে তা বুঝতে পারছে। সন্দীপন সবই বোঝে। এখন ও নিজেকে এর মধ্যে জড়াতে চায় না। হয়তো আশা করে, ঈশানী আর নীলা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে নেবে। কিন্তু কেন? জীবনে যা ঘটে গেছে, তার সব দায়িত্বই কি ঈশানীকে নিতে হবে? অথচ সিদ্ধান্ত যা নেওয়ার, সে তো দুজনে মিলেই নিয়েছিল। এত বছর পরে আসন্ন সংঘাতের মুখোমুখি হওয়ার আশংকায় সন্দীপন যেন ওকেই সামনে ঠেলে দিতে চাইছে। নাকি নীলার সম্পর্কে ও এতই দুর্বল, এতই স্পর্শকাতর যে, কঠিন সত্যকে ভুলে আছে। সন্দীপনের কথা ভেবে ঈশানীর আরও কষ্ট হয়। কিন্তু কিছু তো করার নেই।

কফি শেষ করে টিভিতে রবিবারের ভারতীয় চ্যানেলে হিন্দি নাচ গান দেখতে দেখতে সন্দীপন জানতে চাইল—"আজ তোমাদের কী প্ল্যান? নীলা, আর ইউ গোইং ব্যাক টু-নাইট?"

—"অফ কোর্স আ অ্যাম। কাল অফিসে ফার্স্ট আওয়ারে মিটিং। গিয়েই তো ঘুম পাবে। তোমরা প্রত্যেক উইক-এন্ডে এখনও এত পার্টি করো কী করে? হেল্থ ওয়াইজ ইউ শ্যুড স্লো-ডাউন নাউ।"

ঈশানী মাথা নাড়ল—"তাও তো আজ লাঞ্চের নেমন্তন্নটা নিইনি। একেকটা বিয়ের আগে, পরে এত আর পারা যায় না।

সন্দীপন হাসল—" আমাদের উইক-এন্ডগুলো হচ্ছে ওভারটাইম। নেমন্তন্ন খেয়ে খেয়ে টায়ার্ড। সোমবার অফিসে গিয়ে খালি হাই ওঠে।"

নীলা নিজের হাতের পাতা দেখল—"ওঃ, এগুলো তো আবার তুলতে হবে। এনি ওয়ে, আমি চান করতে যাচ্ছি।"

সন্দীপন কাগজ পড়তে পড়তে বলল—"যদি চাও, আমরা একটু পরে বাইরে কোথাও ব্রেকফাস্ট করতে পারি।"

ইশানী, নীলা কেউই তখন বেরোতে রাজি হল না। স্নানে যাওয়ার আগে নীলা বলে গেল—"তারচেয়ে সন্ধেবেলা প্যারিস-ইন্-এ যাব। ডিনারের পরে আমাকে ট্রেনে তুলে দিও।"

সারাদিন ওরা যে যার মতো কাটাচ্ছিল। সন্দীপন গত সপ্তাহে অজস্র ফুলের চারা কিনে এনেছিল। সঙ্গে নতুন মাটি, সারের বস্তা আর ফুলের কেয়ারির চার ধারে জল ধরে রাখার জন্যে কাঠের কুচি। আজ মাটি ভর্তি ছোট ছোট কাগজের টব থেকে নীল, লাল, বেগুনি, গোলাপি ফুলশুদ্ধু চারাগুলোকে সামনের জমিতে সার দিয়ে পুঁতে যাচ্ছে।

ড্রাইভওয়ের দু' পাশ থেকে সিঁড়ির রেলিং-এর দু'ধারে রং-বেরঙের চারা বসে গেছে। মাঝে নীলা এসে হাত লাগিয়েছিল। ওয়াশিংটন থেকে সন্দীপনের বড় মেয়ে সুমির ফোন আসাতে সেই যে নীলা ভেতরে গেল, আর দেখা নেই। সন্দীপন একাই চালিয়ে যাচ্ছে। সারা সপ্তাহ ডাক্তারি করার পরে ছুটির দিনে যেটুকু সময় পায়, বাগান নিয়ে পড়ে। লন্ কেয়ার কোম্পানি থেকে বাগানের পরিচর্যা করলেও ফুলগাছের শখটা ওর নিজের। প্রতিবছর বসন্তকালের শুরুতে সন্দীপন মরশুমি ফুলের বীজ, চারা, সারটার নিয়ে ক'দিন খুব মেতে থাকে। বোল্তার কামড়, মশার কামড় খেয়েও সন্ধে অবধি খুরপি চালায়। রাতারাতি ফুলগাছের শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। আজ সেরকমই এক মেতে থাকার দিন। পড়ন্ত বিকেলের হলুদ আলো মেখে বিশাল ঘাসজমির এক প্রান্তে বসে সন্দীপন নিবিষ্ট মনে তার নৈসর্গিক সৃষ্টিকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিল। একসময় ঈশানীর ডাকাডাকিতে কাদামাখা স্নিকার্স্ গ্যারাজে খুলে রেখে বাড়ি ঢুকতে বাধ্য হল।

সন্ধেবেলা নীলা নিউইর্য়ক ফিরে যাবে বলেছিল। ওদের শহর গ্রেনীচ্ থেকে ম্যানহাটনের গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল স্টেশনে পৌঁছোতে ঘণ্টাখানেক লাগে। ট্রেনের সময় হিসেব করে সন্দীপনরা কাছাকাছি একটা মেক্সিক্যান রেস্তোরাঁয় ডিনার খেতে ঢুকল। নীলা আটটা দশের ট্রেন নেবে। হাতে ভালোই সময় আছে।

ভেতরে বসার পরে ঈশানী হঠাৎ নীলাকে জিজ্ঞেস করল—"কাল দেবলীনার বিয়েতে তোদের টেবিলে যে বাঙালী ছেলেটা বসেছিল, ওর নাম কি সায়ন?"

নীলা মেনিউ কার্ড থেকে চোখ তুলল না—"জানোই তো। জিজ্ঞেস করছ কেন?"

ঈশানী বিরক্ত—"ওভাবে কথা বলছিস কেন? ওর সঙ্গে তো তোর কাল আলাপ হয়েছে। কেমন মনে হল?"

নীলা উত্তর দেবার আগেই সন্দীপন জানতে চাইল—"কী ব্যাপার? কার কথা হচ্ছে? তোমরা রেগেই বা যাচ্ছ কেন?"

ঈশানী বলল—"শর্মিলাদের বন্ধুর ছেলে সায়ন বাসুর কথা বলছি। ও ক্যালিফোর্নিয়ার ছেলে। শর্মিলা প্রদীপরা যখন লস এঞ্জেলসে থাকত, তখন থেকে ওদের ফ্যামিলিকে চেনে। ছেলেটা নিউইয়র্কে মেকেন্সীতে চাকরি নিয়ে এসেছে।"

ওয়েটার আসতে খাবারের অর্ডার দিয়ে ওরা আবার আগের কথায় ফিরে এল। সন্দীপন নীলাকে জিজ্ঞেস করল—" ও-ই তোর সঙ্গে ড্যান্স ফ্লোরে নাচছিল। না? হ্যাঁ, এখন মনে পড়েছে। ছেলেটি মেকিন্সীর থ্রু দিয়ে কলম্বিয়া বিজনেস স্কুলে একসেকিউটিভ প্রোগ্রামে অ্যাডমিশন পেয়েছে। প্রদীপই বলছিল।"

নীলা বলল—"হী সীম্স্ নাইস্। আমার সঙ্গে এর আগেও দেখা হয়েছে।"

ঈশানীর ভুরু কুঁচকে গেল—"কোথায়? বলিসনি তো?"

নীলা মার চোখে চোখ রাখল—" রবিশংকরের কনসার্টের পরে শর্মিলামাসিরা ইনট্রোডিউস করে দিয়েছিলেন। সায়ন একদিন ডিনারে ইনভাইট করল। সেদিনই বলছিল দেবলীনার ওয়েডিং-এ দেখা হবে। ওদের সঙ্গে সায়নের বাবা, মার অনেকদিনের রিলেশন। ওর বাবা, মারও নাকি বিয়েতে আসার কথা ছিল। ফাইন্যালি দে কুডন্ট্ মেক্ ইট।"

ঈশানী হঠাৎ চুপ করে গেল। খাবার আসার পর ওরা একটু তাড়া করছিল। খেতে খেতে সন্দীপন জিজ্ঞেস করল—"আজ সুমি ফোন করেছিল না? কী বলল?"

ঈশানী কোনো উত্তর দিচ্ছেনা দেখে নীলা ন্যাপকিন দিয়ে ঠোঁট মুছতে মুছতে জবাব দিল—"ফাদার্স-ডে তে আসবে। ব্রডওয়ে শোর টাইম জানতে চাইছিল। বাবা, তোমার মনে আছে তো, আগের দিন এয়ারপোর্ট থেকে আমাকে পিক-আপ করতে হবে।"

সন্দীপন ঈশানীকে বলল—"তুমি আমায় সময়মতো রাজের ফ্লাইট স্কেজিউল্‌টাও দিয়ে দিও। ও তো নেক্সট উইকে আসছে? নীলা, তুই ফিরছিস জুন এইটিন্থ? কোন্ এয়ারলাইন্স্?"

—"নর্থ-ওয়েস্ট। ফ্রম ডেট্রয়েট। ফ্লাইট নাম্বার ফোনে জানিয়ে দেব।"

ঈশানী ঘড়ি দেখল—"আমাদের এবার ওঠা উচিৎ। তোর ট্রেন আটটা দশ-এ তো?"

ওরা যখন গ্রেনীচ স্টেশনে পৌছলো, তখনও বস্টন থেকে মেট্রো নর্থ আসতে একটু দেরি আছে। ট্রেনটা কানেটিকাটের বড় বড় শহর ছুঁয়ে নিউইয়র্কে ফিরে যায়। নীলা ম্যানহ্যাটন থেকে এই ট্রেনেই আসা-যাওয়া করে।

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে নীলা একটু রসিকতার সুরেই যেন ঈশানীকে বলতে চাইল—"কী হল? কথা বলছনা কেন? আমি তো আজ সুমিকে সায়নের কথা বললাম। কাল তুমি শর্মিলামাসিদের যা বলেছ, সেটাও বলে দিলাম।"

—"কী বলেছি শর্মিলাকে?"

—"সুমির ফোন নাম্বার আর ই-মেইল অ্যাড্রেস সায়নকে দিতে বলেছ। সুমি বাড়িতে এলে একদিন শর্মিলা মাসীদের সঙ্গে সায়নকে ইন্‌ভাইট করতে বলেছ।"

ঈশানী চেষ্টা করেও রাগ চাপতে পারল না—" অ্যান্ড ইউ ডিড নট লাইক ইট! কেন? সুমির বিয়ের জন্যে আমি খোঁজ নিতে পারি না? লোকে তো এ ভাবেই কনট্যাক্ট করে।"

নীলা কাঁধ ঝাঁকিয়ে উত্তর দিল—"ও.কে। ডু হোয়াটএভার ইউ ওয়ান্ট! আমার আর এ সব কথা ভালো লাগছেনা।"

সন্দীপন বিরক্ত হয়ে বলল—"এক্স্যাকটলি! সন্ধে থেকে তোরা ঝগড়া করছিস! কে এক সায়ন সায়ন করে বোর করে মারছিস! এদিকে ট্রেন আসার সময় হয়ে গেল।"

নীলা হেসে ফেলল—"ঠিক বলেছ বাবা! সায়ন বাসু ইজ ক্রিয়েটিং এ বিগ্ প্রব্‌লেম ইন আওয়ার ফ্যামিলি।"

স্টেশনে ট্রেন এসে গেল। নীলা ওদের জড়িয়ে ধরে গুডনাইট বলে ট্রেনের খোলা দরজায় পা রাখল।

দরজা বন্ধ হওয়ার মুহূর্তে ঈশানী বুকের মধ্যে কেমন এক শূন্যতা অনুভব করল। নীলা যেন ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। বিচ্ছিন্নতা বোধের অব্যক্ত যন্ত্রণায় তার চোখে জল এল।

মেট্রো নর্থের লাল আলো দূরের অন্ধকারে বিন্দুর মতো হারিয়ে গেছে। নির্জন স্টেশনে দাঁড়িয়ে সন্দীপন বলল—"কেন যে ছোটখাটো ব্যাপারে অশান্তি করো। ওদের এই বয়সে আর বকাবকি কোরো না। জানো তো, নীলা একটু বেশি সেন্‌সিটিভ।"

—"সেটাই হয়েছে আরও প্রব্‌লেম। কোনো কথা সহজভাবে নিতে পারে না। সবেতেই রাগ, অভিমান। আমারও মাথা গরম হয়ে যায়। সুমি, রাজ কেউ তো আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলে না। নীলা হঠাৎ হঠাৎ এত রেগে যায়, কী যে করব বুঝে উঠতে পারি না।"

গাড়িতে ওঠার পর সন্দীপন কোনো কথা বলছিল না। বাড়ির কাছাকাছি এসে ঈশানী বলল—"সন্দীপন, তুমি বোধহয় ব্যাপারটা রিয়্যালাইজ করছ না। নীলা কিন্তু শুধু শুধু আমাকে ভুল বুঝছে! কী রকম ডিট্যাচড্ হয়ে যাচ্ছে...."

ক্ষোভে দুঃখে ঈশানীর গলার স্বর বুজে আসছিল। এক হাতে স্টিয়ারিং ধরে অন্য হাত ঈশানীর কাঁধে রেখে সন্দীপন বলল—"আমি ওকে বোঝাতে চেষ্টা করব। ওর রাগ, কান্না কোনো কিছুই তো বেশিক্ষণ থাকে না। সুমি কিন্তু ওর থেকে অনেক বেশি রিজিড। নীলার অত জেদ নেই।"

—"জেদ নেই বলছ। তাহলে ওর বার্থ রেকর্ড দেখার জন্যে আমাকে পাগল করে মারছে কেন? বোঝাতে গেলে কথা শুনছে?"

গ্যারেজে গাড়ি রেখে সন্দীপন অন্যমনস্কের মতো ভেতরে ঢুকল। ঈশানী দোতলায় গিয়ে জামাকাপড় বদলে রাতের পোশাক পরে নেমে এল। এখনও ন'টা বাজেনি। নীলার-অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছোতে পৌঁছোতে সাড়ে-ন'টা বাজবে। পৌঁছে ফোন করলে ঈশানী নিশ্চিন্ত হবে। সেই কোন্ কালে ছেলে-মেয়েরা যখন ছোট ছিল, টিভির একটা চ্যানেলে রাত দশটা বাজলেই শোনা যেত—এখন রাত দশটা। তুমি কি জানো তোমার ছেলে মেয়েরা এখন কোথায়? ঈশানী তখন তিন ছেলে মেয়েকে কাছাকাছি দেখে কেমন এক নিশ্চিন্তভাব, মানসিক স্বস্তি অনুভব করত। ওরা বড়ো হবার পরে যখন কলেজে গেছে, ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে থেকেছে, তখনও মার কথায় রাত দশটার পরে কতো জায়গা থেকে ফোন করেছে। এখন আর কেউ কথা শোনে না। আজ নীলা দশটার মধ্যে ফোন না করলে ঈশানীই করবে। তারপর শুতে যাবে।

সন্দীপন তখনও নীচের ঘরে সোফায় বসেছিল। ঈশানীকে দেখে বলল— "ওরা তিনজনেই তো ফাদার্স-ডেতে আসছে। তখন যা বলার বলব। ঈশানী, কন্‌সিকোয়েন্স যেমনই হোক, নীলা যা জানতে চাইছে, আর তো লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়।"

—"না, প্লিজ ফাদার্স-ডে তে নয়। পরে অন্য সময় আমরা দুজনে মিলে নীলাকে সব কথা বলব। সুমি, রাজ, ওদের তো এত কিছু জানার দরকার নেই। সন্দীপন, তুমি অন্তত নিজে থেকে কিছু বোলো না।"

সন্দীপন অসহিষ্ণু হল—"তুমি ভুলে যাচ্ছ ওরা তিনজনেই অ্যাডাল্ট্ । একটা ফ্যামিলির মধ্যে এত লুকোচুরি থাকবে কেন? তাছাড়া, নীলা নিজে যখন জানবে, ওদের কাছে বলবে না ভাবছো?"

ঈশানী বোঝাতে চেষ্টা করল—"তাহলে নীলার ওপরেই ছেড়ে দাও। সুমিকে যদি বা বলতে পারি, রাজের সামনে এ ধরনের কথা কিছুতেই বলতে পারব না। ছেলে মেয়ের সঙ্গে সব কথা বলা যায় না সন্দীপন।"

রান্নাঘরে ফোন বাজল। ঈশানী গিয়ে রিসিভার তুলতে নীলার গলা ভেসে এল—"পৌঁছে গেছি মা।"

প্রায় দু'মাস বাদে নীলার সঙ্গে সায়নের দেখা হল। নীলা অফিস নিয়ে ব্যস্ত। ওদের কস্‌মেটিক্‌স কোম্পানির হেড অফিস প্যারিসে। ও আছে নিউইয়র্ক অফিসে, মার্কেটিং ডিভিশনে। নতুন প্রোডাক্ট বাজারে আসার আগে পরপর দু' বার প্যারিসে যেতে হল। ফিরে

এসেই লাস্ ভেগাসে দু'দিনের অ্যানুয়াল কনভেন্শন। এই সব ঘোরাঘুরির ফাঁকে ফাদার্স-ডে তে বাড়ির সবাইকে নিউইয়র্কের মালয়েশিয়ান রেস্তোরাঁয় ডিনার খাওয়াল। সুমি ওদের সকলের জন্য ব্রডওয়ে শোর টিকিট কেটেছিল। দুপুরের শো-তে "লায়ন কিং" দেখার পর সন্দীপন, ঈশানী, সুমি আর রাজ নীলার অ্যাপার্টমেন্টে খানিক সময় কাটাল। সুমি সেদিন রাতেও নীলার কাছে ছিল। পরদিন ট্রেন ধরে ওয়াশিংটন ফিরল। সুমি লইয়ার। জর্জ টাউন ইউনিভার্সিটি থেকে ল পাশ করে ওয়াশিংটনে "ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে" কাজ করছে। ও নীলার চেয়ে দেড়বছরের বড়ো। ওদের ছোট ভাই রাজর্ষি এখনও ছাত্র। ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগোতে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট পড়ছে। এখন গরমের ছুটিতে বাড়িতে এসে নিউইয়র্কে একটা কোম্পানিতে সামার জব নিয়েছে। রাজও একেক রাতে নীলার অ্যাপার্টমেন্টে থেকে যায়। এই সব ব্যস্ততার মাঝে নীলা আর সায়নের সঙ্গে দেখা করার অবকাশ পাচ্ছিল না। সায়নেরও প্রায় এক অবস্থা। নীলার মতো ওর আত্মীয় স্বজন না থাক, চাকরি আর পড়াশোনার চাপ আছে। ফুলটাইম চাকরির সঙ্গে এম.বি.এ-র কোর্স চলছে। ওদের একসেকিউটিভ প্রোগ্রামে ছুটির দিনেও ক্লাস থাকে। এক সেমেস্টারের পরীক্ষা শেষ হতেই অফিস থেকে সিঙ্গাপুর পাঠাল। সেখান থেকে দিল্লি। ঐ সুযোগে একদিনের জন্যে কলকাতায় গিয়ে সায়ন ওর ঠাকুমাকে দেখে এল।

এর মধ্যে নীলার সঙ্গে অনেকবার ফোনে কথা হয়েছে। সায়ন একদিন আসতে চাইল। নীলা তখন খুব সেজেগুজে ওয়ালডর্ফ অ্যাস্টোরিয়া হোটেলে একটা ফান্ড রেইজিং ডিনারে যাচ্ছে। ওদের কোম্পানি থেকে নানা সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানে প্রচুর ডোনেশন দেয়। তার মধ্যে ম্যানহ্যাটনে বড় বড় হোটেলে ফান্ড-রেইজিং ডিনার হয়। হলিউড থেকে, কখনও ব্রডওয়ে থিয়েটার থেকে সেলিব্রিটিরা আসে। মার্কেটিং ম্যানেজার হওয়ার পর নীলাও কখনও কখনও এ ধরনের ডিনারে যাওয়ার সুযোগ পায়। সেদিন অভিনেত্রী মেরীল্ স্ট্রীপ আসবে শুনে যাওয়ার আগ্রহ আরও বেশি ছিল। সায়নকে ফোনে সে কথা বলে, আর শিগগীরই দেখা হবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নীলা পার্টিতে চলে গেল। তারপর ক'দিন চুপচাপ। শেষপর্যন্ত সায়ন আজ নিজেই ফোন করে চলে এসেছে।

সায়নের আনা ফ্রেঞ্চ ওয়াইনের বোতল খুলে দুটো ওয়াইন গ্লাস ভরে নিয়ে ওরা গল্প করছিল। বাইরে তখন রোদ পড়ে আসছে। জানলা দিয়ে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর চূড়ায় রঙীন আলোর মুকুট জ্বলে উঠতে দেখে নীলার খেয়াল হল সন্ধে হয়ে গেছে। এবার রাতের খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। আগে দু-তিন বার সায়ন ওকে বাইরে ডিনার খাইয়েছে। আজ নীলার খাওয়ানো উচিত। হাতে সময় পেলে একটু রান্না করে রাখত। সায়ন সে সময়ও দেয়নি। আজ ওর পছন্দমতো খাবার বাড়িতেই আনিয়ে নেবে। নীলার কথায় সায়ন টেক-আউট কোরিয়ান ফুডে রাজি হয়ে গেল। নীলা ফোনে অর্ডার দেওয়ার আধঘণ্টার মধ্যে রেস্তোরাঁর লোক এসে ষোলো তলায় খাবার পৌঁছে দিয়ে গেল।

ছোট্ট খাবার টেবিলে মোমবাতি জ্বলছে। ঘরের বাতাসে পোড়া মোম আর ফুলের নির্যাসের মৃদু সুগন্ধ। ওরা মুখোমুখি খেতে বসে ঝুম্পা লাহিড়ির বই "নেমসেক্" নিয়ে আলোচনা করছিল। আমেরিকায় জন্মানো বাঙালি ছেলেমেয়েরা অনেকেই ঐ উপন্যাসের মধ্যে নিজেদের খুঁজে পেয়েছে। ঐ প্রসঙ্গে সায়ন বলছিল—"আই ক্যান অলসো আইডেনটিফাই

মাইসেল্‌ফ উইথ গোগোল গ্যাঙ্গুলী। আরও বেশি ফেমিলিয়ার লেগেছে গোগোলের মাকে। ঝুম্পার প্রথম শর্ট স্টোরি কালেক্‌শনে "মিসেস্ সেনস্" পড়েও মনে হয়েছিল ওর অবজারভেশন দারুণ। আমার মার প্রথম ড্রাইভিং শিখতে যাওয়া, রোড টেস্টে ফেইল্ করে কান্না, সবই মনে আছে তো! ঝুম্পার গল্পগুলো মা ও খুব এন্‌জয় করেছেন।"

নীলা হেসে উঠল—"অসীমা গাঙ্গুলী নিশ্চয়ই তোমাকে বাঙালি মেয়ে খুঁজে নিতে বলছেন?"

সায়নের খেয়াল হল বইটাতে গোগোলের মার নাম অসীমা গাঙ্গুলী। ও নীলার চোখে চোখ রেখে মৃদু হাসল—"এক্‌জ্যাকট্‌লি। রোজ ফোন করে এক কথা বলেন। লেট্‌লি বেশ রেগে যাচ্ছেন। দু'দিন ফোন আসেনি।"

—"কেন? ঝগড়া করেছ?"

সায়ন হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে জিজ্ঞেস করল—"নেক্সট্ উইক-এন্ডে কী করছ?"

নীলা একটু ভাবল—"এমনিতে কিছু নেই। তবে সুমি, মানে আমার বড় বোন আসতে পারে। ওর একটু প্রব্‌লেম যাচ্ছে। শী ওয়ান্ট্‌স টু ডিসকাস অ্যাবাউট দ্যাট।"

সায়ন কৌতূহল দেখাল না। শুধু এটুকু ধরে নিল নীলা ওকে তখন আসতে বলবে না। অথচ এই সুমি, সুমিতা লাহিড়ির নাম নিউইয়র্কে এসে পর্যন্ত শুনে যাচ্ছে। ওদিকে মা, এদিকে শর্মিলা মাসিরা সায়নকে কনভিন্স্ করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। সুমিতার ফোন নাম্বার, ই-মেইল অ্যাড্রেস পাঠিয়ে দিয়েছেন। সায়ন সেদিন মাকে ফোনে সোজা বলে দিয়েছে ওর এখন ডেট করার সময় নেই। বোধহয় সেই জন্যেই মা রেগে আর ফোন করছেন না। সায়নের তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই।

কিন্তু সেই সুমির আবার কী প্রবলেম হল? নাকি তাকেও বাড়ি থেকে বাঙালি ছেলের সঙ্গে ডেট করো বলে চাপ দিচ্ছে? নিশ্চয়ই দিচ্ছে। না হলে সবাই মিলে ওকে সায়নের সঙ্গে আলাপ করাতে চাইছে কেন? শর্মিলা মাসির মেয়ের বিয়েতেও সায়নের টেবিলে সুমিতা লাহিড়িকে বসানোর প্ল্যান ছিল। সে এল না কেন কে জানে? মাঝখান থেকে তার আমেরিক্যান বোন সায়নের বন্ধু হয়ে গেল। মা শুনলে হয়তো এখনই প্লেনে চড়ে ব্রুক্‌লীনে চলে আসবে। সমস্ত ব্যাপারটাই সায়নের কাছে ভারী নাটকীয় মনে হচ্ছিল। বাসনগুলো নিয়ে কিচেনে যেতে যেতে নীলা নিজে থেকেই কথাটা তুলল—"সুমির জন্যে বাবা, মা খুব আপসেট। আজকাল ও আর গ্রেনীচে আসতে চায় না। আই ডোন্ট নো হাউ শী উইল হ্যান্ডল দ্যা হোল থিং।"

সায়ন ওয়াইনের বোতলটা কাউন্টারে রেখে নীলার কথায় ঘুরে তাকাল—"ইজ শী হ্যাভিং এনি অ্যাফেয়ার? আমেরিকান বয়ফ্রেন্ডকে বাবা, মা অ্যাকসেপ্ট করতে চাইছেন না?"

—"আমেরিকান হলে কোনো প্রবলেম ছিল না। সেদিক থেকে ওরা অনেক লিবারেল। না হলে পঁচিশ বছর আগে আমাকে অ্যাডপ্ট্ করতেন না। সায়ন, হ্যাভ ইউ হার্ড অফ্ এনি বেঙ্গলি কাপল্ হু রেইজড্ অ্যান আমেরিকান অরফ্যান উইথ দেয়ার টু বয়োলজিক্যাল চিলড্রেন?"

—"প্রথমদিন ভেবেছিলাম তোমার একটা সাইড ইন্ডিয়ান। বাবা, মা, কেউ একজন বাঙ্গালি। তাই বাংলা শিখেছ। বাংলা শুনে অবাকই হয়েছিলাম। দেবলীনার ওয়েডিং-এ তোমার বাবার সঙ্গে আলাপ হল। মা কে দেখলাম।"

নীলা সায়নের কাছে এল—"তখন আরও অবাক হলে। নিশ্চয়ই ভেবেছিলে হয় বাবা, নয় মা কেউ আগে আমেরিকান বিয়ে করেছিলেন। আমি সেই আগের বিয়ের সন্তান। অনেকে এরকম ভেবেছিল জানো?"

নীলাকে জড়িয়ে ধরে সায়ন ওর ঠোঁটের ওপর ঠোঁট রাখল। দীর্ঘ চুম্বনের মাঝে একবার শুধু মৃদু স্বরে বলল—"না। আমি কিছুই ভেবে নিইনি। আই ওয়াজ জাস্ট এনজয়িং ইওর কম্পানি।"

—"জানি, তোমার কৌতূহল কম। তার আগেও দু'দিন দেখা হয়েছিল। তখনও কোনো পার্সোন্যাল কথা জিজ্ঞেস করোনি। তারপর যেদিন নিজে থেকে বললাম, কী সহজভাবে নিলে। অথচ সায়ন, আমি কেন নিজের আইডেনটিটি নিয়ে এত কষ্ট পাই? কেন আজও ঘটনাটার কোনো এক্সপ্ল্যানেসন খুঁজে পাই না?"

সায়ন অবাক হল—"কোন্ ঘটনার কথা বলছো?"

নীলার দীর্ঘঃশ্বাস পড়ল। নিজের কোমর থেকে সায়নের দু'হাত আলতো ভাবে সরিয়ে দিয়ে বসার ঘরে ফিরে গেল।

রাত বাড়ছিল। বাইরে গভীর অন্ধকারের পটভূমিতে আকাশ-ছোঁয়া বাড়িগুলোর অসংখ্য জানলায় একে একে আলো নিভে আসছে। অনেক নীচে জনবিরল রাস্তায় গাড়ির ভিড় নেই। সায়নের বাড়ি ফেরার সময় হল। তবু অসমাপ্ত কথার সুর ধরে ও আবার জিজ্ঞেস করল—"তুমি কী জানতে চাইছ নীলা? সাম্ টাইমস্ ইউ লুক্ সো ডিপ্রেস্ড্। কী হয়েছে আমাকেও বলতে পার না?"

নীলা ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল—" আজ থাক। এসব কথার কোনো শেষ নেই সায়ন। আজ অনেক রাত হয়ে গেছে। তোমাকেও তো ফিরতে হবে....।" কথা শেষ হবার আগেই ফোন বাজল। ওয়াশিংটন থেকে সুমি কথা বলছে। সায়ন ওঠার তোড়জোড় করছিল। নীলা এক হাতে রিসিভার ধরে অন্যহাত দেখিয়ে ওকে বসতে বলল। সায়ন আর অপেক্ষা করতে চাইছিল না। রাত দশটার সময় নীলা আর তার বোনের গল্পের মাঝখানে বসে থাকার কোনো মানে হয় না। গল্প না ঝগড়া তাও বোঝা যাচ্ছে না। নীলা রীতিমতো উত্তেজিত। কাল গ্রেনীচ্ চলে যাবে বলছে। সেখানে আবার কী হল? আগে শুনেছিল সুমির কী একটা প্রব্লেম হয়েছে। সে নাকি উইক এন্ডে এখানে আসছে। কে জানে কী ব্যাপার। সায়ন এখন মাঝপথে উঠতেও পারছে না।

নীলার কথা শোনার জন্যে সায়ন সারারাত বসে থাকতে পারে। কিন্তু সে কথা তো আজও শোনা হল না। নীলাই ওকে বাড়ি যাবার তাড়া দিল। এখন আবার ঈশারায় অপেক্ষা করতে বলছে।

নীলা গম্ভীর মুখে সোফায় এসে বসল। যেন নিজের মনেই বলল—"আমি জানতাম, এটাই হবে।"

সায়ন জানতে চাইল—" কী হল? ইজ দেয়ার এনি প্রবলেম?"

—"সুমি এনগেজড। এখন এত রাতে বাবা, মাকে ফোন করতে যাচ্ছিল। বারণ করলাম। কাল সন্ধেবেলায় জানাতে বলেছি। আমি অফিসের পরে গ্রেনীচ্ চলে যাব।"

—"এটা তো ভালো খবর। তুমি এত উত্তেজিত হয়ে পড়লে কেন?"

—"সায়ন, প্লিজ একটু বসে যাও। সুমির ব্যাপারটা তোমাকে বলা হয়নি। আগে একটু কফি নিয়ে আসি।"

সায়ন কফি খেতে চাইল না। ঘড়ি দেখে বলল—"তাড়াতাড়ি শুরু কর। আমি আর আধ ঘণ্টা পরে উঠে যাব। বেশ রাত হয়ে গেছে।"

নীলা সবিস্তারে আরম্ভ করল—"সুমির ফিয়াঁসের নাম আফতাব। ওর বাবা পাকিস্তানের ডিপ্লোম্যাট। ওয়াশিংটনে কয়েক বছর ছিলেন। আফতাব ইংল্যান্ডে বোর্ডিং স্কুলে পড়েছিল। তারপর ওয়াশিংটনে। জর্জ টাউন ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট। 'নাউ হি ইজ উইথ্ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক।"

—"তোমার বাবা, মা কি বিয়েটা চাইছেন না?"

—"নো। দে আর টোট্যালি আপসেট অ্যাবাউট দ্য হোল থিং। পাকিস্তানী ছেলেকে বিয়ে করাটা কিছুতেই মেনে নেবেন না। তবে ইন্ডিয়ান মুসলিম হলেও যে সহজে অ্যাকসেপ্ট করতেন, তা নয়। রিলিজিয়নের ব্যাপারেই ওঁরা বেশি আপ্‌সেট হয়েছেন। মার ধারণা বিয়ের জন্যে সুমিকে ওরা ইসলামে কনভার্ট করতে চাইবে।"

—"হাউ অ্যাবাউট সুমি? ও কনভার্ট করতে রাজি হয়েছে?"

নীলা মাথা নাড়ল—"না, একদমই নয়। আফতাবের ফ্যামিলি প্রথম দিকে সেরকম বলার চেষ্টা করেছিল। করাচিতে ওদের কার্পেটের বিজনেস। দে আর কোয়াইট রিচ পিপল্। ওরা চাইছিল করাচিতে বিয়ে হবে। ছেলেকে ভীষণ প্রেশারাইজ করছিল। আফতাব রাজি হয়নি। শেষপর্যন্ত ও আর সুমি কোর্টে সিভিল ম্যারেজ করবে ঠিক করেছে। কনভার্শনের কোনো ব্যাপার নেই। জানি না, এবার মা-বাবা হয়তো মেনে নেবেন। আই থিংক দে হ্যাভ নো চয়েস্।"

সায়ন হাসল—"এই সুমিতা লাহিড়ির সঙ্গেই আমাকে ইনট্রোডিউস করানোর জন্যে আমার মা শর্মিলামাসিকে ফোন করছিল। শর্মিলা মাসি খবর দিচ্ছিল তোমার মাকে।"

নীলা হেসে ফেলল—"আর আমার মা যখন শুনলেন সেই সায়ন বাসুর সঙ্গে আমার মাঝে মাঝে দেখা হচ্ছে, ভীষণ রেগে গেলেন।"

সায়ন আবক হল—"কেন? তুমিও তো ওঁর মেয়ে। তাছাড়া, তোমার বোনকে আমি চিনিই না। আর চিনলেই বা কী? ক্যালিফোর্নিয়াতেও কত বাঙালি মেয়েকে চিনি। দ্যাট ডাজ নট্ মীন, আই হ্যাভ টু ম্যারী ওয়ান অফ্ দেম?"

নীলার গলায় বিষণ্ণতার ছোঁওয়া লাগল—"মা ভাবেন ওঁদের অ্যাডপটেড, ব্লন্ড মেয়েকে আমেরিকান ছাড়া কেউ বিয়ে করবে না। কিন্তু ওঁর নিজের মেয়ে কেন মুসলিম বিয়ে করবে? সে জন্যেই তুমি বাঙালী বলে, হিন্দু বলে তোমাকে সুমির আইডিয়্যাল ম্যাচ বলে ভেবেছেন। সায়ন, আই ক্যান্ট ব্লেম্ হার।"

—"বাট এভ্‌রিথিং ওয়েন্ট রং"।

সায়নের মন্তব্যে নীলার ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটল—"নট এভরিথিং। কে জানে? আমার ব্যাপারে হয়তো মার ধারণা সত্যি হতেও পারে।"

কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে সায়ন দরজার কাছে গেল। নীলা কাছে এসে ওর হাত ধরে বলল—"সরি তোমার অনেক দেরি করে দিলাম। আসলে সুমির ফোন পেয়ে একটু নার্ভাস

লাগছিল। মা, বাবার কাছে গিয়ে কাল ওঁদের বোঝাতে হবে। অ্যাকসেপ্ট্ করা ছাড়া কী করার আছে বলো?"

এলিভেটরে ঢোকার আগে সায়ন বলে গেল—"নেক্সট্ উইকে আমি থাকব না। বিজনেস্ ট্রিপে যাচ্ছি।'

—"কোথায়?"

—"স্যান্ডিয়াগো। লস এঞ্জেলেস হয়ে ফিরব। আমার ভাই অয়নও সে সময় বাড়িতে আসবে। মা, বাবা খুব লুক ফরোয়ার্ড করছেন। এনি ওয়ে, পরে কথা হবে।"

রান্নাঘরে টুকিটাকি কাজ সেরে নীলা শুয়ে পড়ল। সুমির কথাটা মাথার মধ্যে ঘুরছে। ওরা যে শেষ অবধি বিয়ের ডিসিশন নিতে পারল, নীলা তাতে স্বস্তি পাচ্ছে। সুমির ওপর বড় মানসিক চাপ যাচ্ছিল। এই জেনারেশন ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামায় না। তার মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক ভেঙে দেবে কেন?

নীলা হঠাৎ বিছানার পাশ থেকে রিসিভার তুলে নিল—"সায়ন, শুয়ে পড়েছ? কখন পৌঁছোলে?"

—"এই তো ফিরলাম। কী হল?"

—"সায়ন, তুমি কি আমার কথায় কিছু ভেবে নিয়েছ?"

—"কোন কথায়? সন্ধে থেকে অনেক কথা বলেছ।"

—"ঐ যে, মা চাইছেন বলে আমিও হয়ত আমেরিকান বিয়ে করব....।"

—"নীলা, তোমার দিদির বিয়ে নিয়েই ফ্যামিলিতে ক্রাইসিস চলছে। এর ওপর তুমি আবার এখনই বিয়ে করতে চাইছ কেন? গিভ ইওর পেরেন্টস্ সাম ব্রিদিং টাইম।"

—"আমি মোটেই বিয়ের কথা ভাবছি না। তোমাকে একটা ভুল ইম্প্রেশন দিয়েছি ভেবে ফোন করলাম।"

—"ইউ ডিড দ্য রাইট থিং। এবার নিজে ঘুমোও। আমাকেও ঘুমোতে দাও।"

শুয়ে শুয়ে সায়ন ভাবছিল একটা স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তোলার আশায় কখনও বছরের পর বছর চলে যায়। তবু সিদ্ধান্তে আসা হয় না। অথচ কয়েক মাসের দেখাশোনায় ক্রমশই যেন ওরা পরস্পরের কাছে কিছু প্রত্যাশা, কিছু প্রতিশ্রুতির প্রচ্ছন্ন অনুভব নিয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে বাঁধা পড়ে গেছে। সায়ন আর অপেক্ষা করতে চায় না। এবার লস্ এঞ্জেলেসে যাওয়া শুধু এই কারণে। মা, বাবাকে জানাতে হবে। মা নিরাশ হবেন। দুঃখ পাবেন। বাবা কন্‌জারভেটিভ না হলেও নীলার ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন। এই সব বিরুদ্ধ পরিস্থিতির মাঝে সায়ন তার সিদ্ধান্তে স্থির থাকবে। এবং শেষপর্যন্ত জিতে যাবে। ছোটবেলা থেকে দেখে আসছে, অভিমান থাকলেও মার রাগ বলে কিছু নেই। বাবা এই রেগে ওঠেন, এই ভুলে যান। রাগ, জেদ, অভিমান কোনো কিছুই ওঁদের স্নেহকে ছাপিয়ে ওঠে না। সায়নের জন্যই নীলাকে ওঁরা মেনে নেবেন।

এনগেজমেন্টের তিনমাস পরে সুমি আর আফতাব ওয়াশিংটনে বিয়ে করল। সন্দীপন, ঈশানীর সঙ্গে নীলাও ছোট্ট রিসেপশনে গিয়েছিল। আফতাবের বাবা, বোন আর তার বরের সঙ্গে সন্দীপনদের আলাপ হল। মা করাচিতে। বিয়েতে আসতে পারেননি না আসতে চাননি বোঝা গেল না। তবে সুমির জন্যে দামী দামী গয়না, সালোয়ার সুট, ল্যাহেঙ্গা, জরির জুতো-

টুতো পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওঁরা খুবই ভদ্রতা করলেন। সন্দীপনও ওঁদের গ্রেনীচে আসার জন্যে বলে এল।

সুমিরা হানিমুন থেকে ফেরার পর সন্দীপন আর ঈশানী গ্রেনীচের হায়াট রিজেন্সিতে পার্টি দিল। সেখানেই সায়ন প্রথম সুমিকে দেখল।

সুমি ওর হাত ধরে হেসে ফেলল—"সো, ইউ আর দ্যাট বেঙ্গলি, হিন্দু, প্রফেশন্যাল গাই? ফাইন্যালি, আমার বিয়ের রিসেপ্‌শনে তোমার সঙ্গে দেখা হল!"

সায়ন কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসল—" হু নোস্? হয়তো নেক্সট্ টাইম আমাদের দেখা হবে আমার ওয়েডিং পার্টিতে।"

আফতাব চোখ টিপল—" তাই যেন হয়।"

জীবনে হঠাৎ হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটে যায়। ঈশানীর জীবনে এমন এক বিস্ফোরণের আগুন সময়ের ভস্মস্তূপের নীচে চাপা পড়েছিল। আজ এত বছর পরে আবার ধিকি ধিকি জ্বলে উঠেছে। নিঃশব্দ দহনে সংসারের সুখ শান্তি জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। নীলা, নীলা কেন বোঝে না অতীতের ছাইভস্ম ঘেঁটে কোনো মণিমুক্তো উঠে আসবে না। শুধু দুঃখ বাড়বে। জন্ম পরিচয় জেনে তুই কী করবি? আমাদের ছেড়ে চলে যাবি? আমরা তোকে নিজের মেয়ের মতো করে মানুষ করিনি? আজ আসল মা, বাবার নাম ঠিকানা চাইছিস। আমরা তাহলে তোর কেউ নয়?

ঈশানী একা বাড়িতে সারাক্ষণ গুমরে মরে। কখনও সুমিকে ওয়াশিংটনে ফোন করে। কখনও শিকাগোতে রাজকে নিজের দুঃখের কথা বলে। রাজের একটাই কথা—"নীলা যা চায়, তাই করো। শী হ্যাজ এভরি রাইট টু নো দ্য ট্রুথ্। তোমরা ওকে কষ্ট দিচ্ছ। নিজেরাও শান্তি পাচ্ছ না।"

সুমি বরং মার দুঃখ বোঝে—"তুমি ভয় পেয়োনা মা। নীলা আমাদের ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবতেও পারে না। ও শুধু ওর বায়োলজিক্যাল পেরেন্টেদের নাম জানতে চায়। হয়ত জানার পরে নিজেই আর খোঁজ নিতে চাইবে না। তারা কোথায় আছে, বেঁচে আছে কিনা, তাই বা কে বলতে পারে?"

ঈশানী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল—"জানি না। আমি আর ভাবতে পারছি না। তোর বাবা বলছে, আমাদের লইয়ার জর্জ ফস্টারের কাছে যাবে। নীলার বার্থ-রেকর্ড ফস্টারের অফিসে রাখা আছে।"

সুমির গলায় কৌতূহল—"মা, এখন তো আমাকে বলতে পার। নীলার একটা সাইড কি ইন্ডিয়ান?"

একটু থেমে থাকার পর ঈশানী উত্তর দিল—"যা বলার প্রথমে নীলাকেই বলব সুমি। ঘটনাটা বড় দুঃখের। পরে সব কিছু শুনিস।"

অক্টোবরের মাঝামাঝি দুর্গাপুজো হল। নীলার জন্যে বসে থেকে থেকে, শেষে অঞ্জলির দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে সন্দীপন আর ইশানী স্ট্যামফোর্ডের পুজোবাড়িতে চলে গেল। নীলা এল দুপুরের দিকে। সায়নের সঙ্গে হেমন্তের পাতা ঝরার রং বদল দেখতে ভারমন্টে যাচ্ছে। যাবার পথে পুজো বাড়িতে দেখা করে গেল। সায়ন আসাতে শর্মিলা, প্রদীপরা ওর বাবা, মার খবর নিল। প্রসাদের লাইনে ভিড় দেখে সায়ন আর দাঁড়াতে চাইছিল না। শর্মিলা ওদের জন্যে বড় বড় পেপার প্লেট ভর্তি করে খিচুড়ি তরকারি এনে দিল। শেষপর্যন্ত সন্দীপনের কথায়

আরও কিছুক্ষণ পুজোবাড়িতে থেকে, খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ওরা বেরিয়ে পড়ল। যাবার আগে ঈশানী জিজ্ঞেস করল—"কাল তোরা নিউইয়র্ক থেকে ফেরার পথে কি বাড়িতে একবার আসবি? তাহলে ফোন করিস। বাড়িতে থাকব।"

নীলা মাথা নাড়ল—"মনে হয় না সময় পাব। একবার বাড়ি এলে, সিটিতে পৌঁছোতে রাত হয়ে যাবে। সোমবারের ফ্লাইটে সায়ন লন্ডন যাচ্ছে। কাল আর দেরি করব না।"

সায়ন কিছু ভাবছিল। নীলার কথা শেষ হতে সন্দীপন আর ঈশানীকে বলল—"আই থিংক উই ক্যান্ মেক্ ইট। কাল সন্ধেবেলা গ্রেনীচে আসব। জাস্ট ফর অ্যান্ আওয়ার।"

নীলা একটু অবাক হয়ে গেল।

পুজোবাড়ি থেকে ফিরে এসে সন্দীপন বলল—"নীলার ব্যাপারটা তো স্টেডি বলেই মনে হচ্ছে। মন মেজাজও ভালো দেখলাম। এর মধ্যে তোমাকে আর বার্থ-রেকর্ডের কথা বলেছে?"

ঈশানী মাথা নাড়ল—"না, এখন আবার কিছুদিন চুপচাপ। অফিসের কাজে মাঝে মাঝে ট্র্যাভল্ করতে হচ্ছে। কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত আছে বলে বোধহয় মাথার ভেতর পোকাটা নড়ছে না।"

সন্দীপন জানলার বাইরে সূর্যাস্তের শেষ আভা দেখেছিল। হেমন্তের বিষণ্ণ সন্ধ্যায় দূরের ঝাউবন অস্পষ্ট হয়ে আসছে। ওর শুধু মনে হল এরকমই এক কুয়াশা জড়ানো বিকেলে নীলাকে নিয়ে ও হস্‌পিট্যাল থেকে বেরিয়েছিল। কত বছর? কত বছর বয়স হল ওর?

ঈশানীর কথায় চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল—"ভাবছি, এবার নিজেই কথাটা তুলব। তোমার সুবিধে মতো ওকে বাড়িতে আসতে বলব। অফিস আর হসপিট্যাল নিয়ে তুমি এত টায়ার্ড থাকো। তবু নীলার জন্যে তুমি যা করেছ, তোমার সামনেই সে সব কথা বলতে চাই।"

সন্দীপন ওর কাছে সরে এল—"আলাদা করে আমরা কম বেশি কিছুই করিনি ঈশানী। ভগবান আমাদের দিয়ে একসঙ্গে যা করার করিয়ে নিয়েছেন। সে সময় যদি ডিসিশনটা না নিতাম অনেক জটিলতা এড়ানো যেত। কিন্তু পরে হয়ত অনুশোচনা হত আমি জানি, সেদিন নীলাকে হাসপাতালে ফেলে চলে এলেও আমরা কোনো অন্যায় করতাম না। তবু পারলাম না তো! মায়া মমতা যাইই বলো, একটা ইমোশন সেদিন আমাদের দুজনের মধ্যে সমানভাবে কাজ করেছিল।"

সন্দীপনের পকেটে বীপার বেজে উঠল। হাসাপাতাল থেকে ডাকছে। আজ ওর অন-কল ডিউটি পড়েছে। এজন্যে পুজোতে বেশিক্ষণ থাকেনি। বাড়ি থেকে গ্রেনীচ হসপিট্যাল পনের মিনিটের পথ। সন্দীপন তখনই বেরিয়ে গেল।

রাত প্রায় দশটা। দুর্গাপুজোর ব্রোশিওরের পাতা খুলে ঈশানী ভাবছিল এবার পুজোয় সুমি, রাজ কারোর সঙ্গে দেখা হল না। রাজের পরীক্ষা চলছে। শিকাগো থেকে চট করে আসতেও পারেনা। সুমিও যখন কলেজে ছিল, ওয়াশিংটন থেকে দু-একবারই পুজোয় এসেছে। এখন ওর কলেজ নেই। পরীক্ষা নেই। একদিনের মধ্যে চলে আসতে পারত। কিন্তু মেয়ে বসে আছে পাকিস্তানে। আফতাবের আত্মীয় গুষ্টি নতুন বউকে দেখতে চায়। লাহোর, করাচি, দু' জায়গাতেই নাকি তারা পার্টি দেবে। জায়গাগুলোর নাম শুনলে ভয় করে। সুমিরা পাকিস্তান যাবে শুনে ইশানী একটু আপত্তি করেছিল। আফতাব বলল—"ভাবছ ওয়াশিংটন ডি.সি খুব

সেফ্ জায়গা? সুমিতার অফিস ফেডারেল বিল্ডিং-এ। বম্ব-থ্রেটের খবর পেয়ে এফ. বি. আই গতমাসে দু' বার সুমিতাদের অফিস ছাড়া করেছে। যখন তখন প্রাণের ভয়ে দৌড়োতে হবে বলে ও আজকাল ব্যাগে করে ফ্ল্যাট্ চটি নিয়ে যায় তা জানো? চিন্তা কোরো না। পাকিস্তানে আমরা ঠিকই থাকব।"

ঈশানী মনে মনে বলেছিল তুমি ঠিকই থাকবে। আমার মেয়েটা একে ইন্ডিয়ান, তার ওপর আমেরিকান সিটিজেন। পাকিস্তানীদের ডবল শত্রু। খুঁজে খুঁজে শ্বশুরবাড়ি জোগাড় করল বটে। এর চেয়ে ইংল্যান্ড কী জার্মানি হলেও ঈশানীর এত দুশ্চিন্তা হত না।

অনেক রাতে সন্দীপন হস্‌পিট্যাল থেকে ফিরল। ঈশানী ওপরে শুতে যাবার আগে রান্নাঘরের টেবিলে ছোট্ট হলদে কাগজে কী যেন লিখে রেখেছে। সন্দীপন কাগজটা তুলে দেখল। লেখা আছে—সুমি ফোন করেছিল। লাহোর থেকে। বিজয়ার প্রণাম নিতে বলল।

পরদিন সন্ধের দিকে ভারমট থেকে নীলারা এসে পৌঁছলো। সন্দীপনকে দরজায় দেখে দু' হাতে জড়িয়ে ধরে নীলা জিজ্ঞেস করল—"মা কোথায়?"

গাড়ির শব্দে ঈশানী বেসমেন্ট থেকে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছিল। নীলা একটু অপেক্ষা করল। সায়ন সন্দীপনের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে যেন কিছু বলতে চাইছে। নীলা মার কাছে গিয়ে বাঁ হাতের আঙুল উঁচু করে দেখাল—"কাল সায়ন আমাকে আংটি দিয়েছে। আমরা এন্‌গেজড।"

ঈশানী কতদিন নীলাকে এত উচ্ছ্বসিত দেখেনি। আনন্দে ওর চোখে জল এল। সায়ন ওদের সামনে এসে সন্দীপনকে বলল—"আমি নীলাকে বিয়ে করার অনুমতি চাইছি।"

সুমির বেলায় সন্দীপন এ সব আমেরিকান কায়দাকানুনের মধ্যে তৈরি ছিল না। আগে থেকে নীলা বলে দেওয়া সত্ত্বেও আফতাবকে সম্মতি দেওয়ার মতো সাজানো কথা দুটো বলতে দেরি হয়েছিল।

এবারও দেরি হল। সায়নকে কাছে টেনে নিয়ে সন্দীপন কেমন অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সেই ছোট্ট শিশু, যাকে ঘিরে নিকট জনের সন্দেহ, বিরাগ, সমাজে সংসারে অজস্র কৌতূহল, বড় হবার পর থেকে যে নিজেকে অনাথ, অবাঞ্ছিত সন্তান ভেবে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করছে, সেই নীলাকে, সন্দীপনের আদরের "নীলপরী"কে সায়ন ভালোবেসে গ্রহণ করছে। সন্দীপন এবারেও সেই সাজানো কথাগুলো উচ্চারণ করল না। শুধু বলল—"ভগবান তোমাদের আনন্দে রাখুন।"

সায়ন সেদিন খাওয়া-দাওয়ার পরে নিউইয়র্ক চলে গেল। নীলা বলল আজ রাতে আর ফিরবে না। কাল একটু বেলায় ট্রেন ধরে সোজা অফিসে যাবে। ঈশানী খুশি হল। নীলাকে কত কিছু জিজ্ঞেস করার আছে। এনগেজড হয়েছে মানে বছর খানেকের মধ্যে বিয়ে হবে। ঈশানীদেরও তো হাতে সময় পাওয়া দরকার। সুমির বেলায় তাড়াহুড়ো করে একটা রিসেপশন দিয়েছিল। এবার অনুষ্ঠান করে বিয়ে দেবে। সায়নের বাবা, মা খবরটা জানেন নিশ্চয়ই। মাঝে নীলা অফিসের কাজে লস এঞ্জেলেস্ গিয়েছিল। ওঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছে কি? এই একটা ব্যাপারে ঈশানীর ভয় আছে। তবে ওঁরা বাধা দিলেও কি সায়ন শুনবে? সুমি, আফতাব কেউ কি বাবা, মার মত নিয়ে এনগেজ্‌ড হয়েছিল? ওরা যা ঠিক করার করবেই। সায়নের বাবা, মারও মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কী? হয়তো ঈশানী বেশি বেশি ভয় পাচ্ছে। নীলা অ্যাডপ্‌টেড হলেও বাঙালি বাড়িতে মানুষ হয়েছে। সন্দীপন আর ঈশানীর পরিচয়েই ওর

পরিচয়। সায়নদের বাড়িতে হয়তো এ নিয়ে আর কথা উঠবে না। ঈশানী আজ মেয়ের কাছে এ সবই জানতে চাইছিল। রান্নাঘরের কাজকর্ম মিটিয়ে ওপরে গিয়ে দেখলে ওদের শোবার ঘরে সন্দীপন বিছানার একধারে বসে আছে। মেঝেয় কার্পেটের ওপর নীলা। সন্দীপনকে কেমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। নীলার মুখেও কিছুক্ষণ আগের সেই হাসি খুশি ভাব নেই। ঈশানীকে দেখে বলল—"মা, তোমার কাজ শেষ হয়েছে? এবার এখানে এসে বসো। আই নীড সাম টাইম্ টু টক টু ইউ অ্যান্ড বাবা।"

ঈশানী বুঝতে পারছিল বিয়ের কথা নয়, নীলা আজ অন্য কথা তুলবে। সেই জন্যেই সায়নের সঙ্গে ফিরে গেল না। এখন এই মুহূর্তে ওর জীবনের সেই অমোঘ ঘটনার কাহিনী ঈশানী আর মিথ্যের আবরণে ঢেকে রাখবে না। কত বছর ধরে বুকে এক পাষাণ ভার নিয়ে আছে। আজ নীলাকে সব কথা বলে ভারমুক্ত হবে। শান্তি না হোক, তবু একটু স্বস্তি পাবে।

ঈশানী হাত ধরে ডাকল—"আয়, খাটে এসে বোস। তোর কথাগুলো আগে শুনি। তারপর আমাদের যা বলার বলব।"

সন্দীপন বলল—"নীলার বার্থ রেকর্ড আর অ্যাডপ্‌শন ফাইলটা কোথায় রেখেছ? এখানে নিয়ে এস।"

চেস্ট অফ ড্রয়ার খুলে ঈশানী দুটো পুরোনো খাম নিয়ে এল। নীলার হাতে দিয়ে বলল—"এর মধ্যে সব আছে। মাউন্টসায়নাই হস্‌পিট্যালের বার্থ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট। নীলাক্ষী নাম আমরাই রেখেছিলাম।" ঈশানীর গলার স্বর কান্নায় বুজে এল—" এখানে তোর মার নাম লেখা আছে।"

নীলা দু' হাতে কাগজটা ধরে আছে। আবেগে, উত্তেজনায় শরীর কাঁপছে। বিহ্বল স্বরে জানতে চাইল—"বনানী মৈত্র কে মা? তোমরা তাকে দেখেছিলে? আর, বাবার নাম কোথায়? কিছু তো লেখা নেই?"

সন্দীপন উত্তর দিল—"তোমার মা তার নাম সার্টিফিকেটে দিতে চায়নি। ইনফ্যাক্ট, সে তোমার জন্মের কথা জানতেও পারেনি।"

নীলা ঈশানীর দিকে চেয়ে আছে—"মা, প্লিজ আমাকে সব কিছু বল। ওয়াজ শি অ্যান্ আন-ওয়েড মাদার? আমার বাবা, যেই হোক, আমেরিকান। কেন সে আমার জন্মের কথা জানতে পারেনি? বলো মা, কেন ওরা আমাকে অ্যাডপ্‌শনে দিয়েছিল?"

ঈশানী ওর মাথায় হাত রাখল—"সেদিন আর কোনো পথ ছিল না। তুই তোর মার প্রথম সন্তান। তবু তোকে নিয়ে তার সমাজে বাস করার উপায় ছিল না। হসপিট্যাল থেকে তোকে অরফ্যানেজে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। তোর মা তোকে বুকে নিয়ে কেঁদে কেঁদে পাগল। আমিও তো মা। সুমির তখন দেড় বছর বয়স। নিজেকে ঐ অবস্থায় ভাবতেও পারি না। বারবার মনে হচ্ছিল আমরা যদি তোকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারতাম। শেষপর্যন্ত তোর বাবা আর আমি ফস্টার পেরেন্টস হিসেবে তোকে হসপিট্যাল থেকে নিয়ে গেলাম। অ্যাডপ্‌শনের জন্যে আরও কয়েক মাস সময় লেগেছিল।"

—"আর আমার মা? সে কোথায় গেল? ডিড শি এভার ট্রাই টু কনট্যাক্ট্ ইউ?"

ঈশানী সন্দীপনের দিকে তাকাল। সন্দীপন শুধু বলল—"ইয়েস্, উই হ্যাভ্ কমিউনিকেশনস্। আমরা তাকে মাঝে মাঝে তোমার খবর জানাই।"

খাম থেকে একটা পুরোনো গ্রুপ ফোটো বার করে ঈশানী নীলার হাতে দিল। ছবির এক জায়গায় আঙুল রেখে মৃদু স্বরে বলল—"এই তোর মা।"

নীলা স্তব্ধ হোয়ে চেয়ে রইল। বিস্ময়ের আঘাতে বেদনায় বিবর্ণ সেই মুখ। প্রায় স্বগতোক্তির মতো উচ্চারণ করল—"মেজোমাইমা।"

নীলা নিউইয়র্কে ফেরার পর কয়েকদিন কারুর সঙ্গে যোগাযোগ করল না। ফোন করলে পাওয়া যায় না। মেসেজ রাখলে উত্তর দেয় না। ঈশানী চিন্তিত হয়ে ওর অফিসে ফোন করেছিল। নীলা বলল—"একটু সময় দাও মা। অফিসে এত কাজ। কোনো কিছুতে কনসেন্ট্রেট করতে পারছি না। সুমি, রাজ ওরাও ফোনে মেসেজ রেখেছে। তুমি ওদের বুঝিয়ে বোলো।"

ঈশানী ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল—"সায়নের সঙ্গে দেখা হয়েছে?"

—"কাল দেখা হবে। অফিসের পরে আসতে বলেছি।"

নীলা একটু পরে ফোন রেখে দিল।

হেমন্তের শেষে আশ্চর্য এক সন্ধ্যা নেমেছে। বাতাসে হিমের স্পর্শ। শহরের আকাশ রেখার ওপরে সোনালী চাঁদ কাছে কাছে দূরে মায়াবি জোৎস্নার জাল বিছিয়ে রেখেছে। জানলা দিয়ে নীচের পথঘাট, লোকজন দেখতে দেখতে নীলা সায়নের জন্যে অপেক্ষা করছিল। এত দেরি হওয়ার কথা নয়। হয়তো শেষ মুহূর্তে ওর কোনো কাজ পড়ে গেছে।

বিছানার ওপর পড়ে থাকা বার্থ-রেকর্ড আর পুরনো ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে নীলার বাবার কথা মনে পড়ল। সেদিন ওর জন্ম পরিচয় দেওয়ার পরে সন্দীপন বলেছিল—"লাইফের ডেফিনিশন সম্পর্কে একটা লেখা পড়েছিলাম।

"লাইফ্, এ বাব্‌ল দ্যাট বার্স্ট
এ স্যাড স্টোরি অফ্ থার্স্ট
এ বান্‌চ অফ্ সেন্টিমেন্টস
এ মেজ অফ প্রেডিকামেন্টস
লাইফ, এ বেবীস ইনোসেন্ট চাক্‌ল
এ বটল্ দ্যাট উইল স্লোলি ট্রিক্‌ল
লাইফ, এ চাইল্ড ক্রাইং ফর হার মাম্
লাইফ, এ ক্রুয়েল আয়রনি ফ্রম গড
লাইফ, ফাইন্যালি ইজ এ লাইন অন ইয়োর ফোরহেড ফ্রম গড।

নীলা, এই আমাদের জীবন। আমরা বলি ঈশ্বরের ইচ্ছের বাইরে কিছু হবার নয়। তার মধ্যেই একটু শান্তি খুঁজে নেওয়া। একটি শিশুর সরল হাসি দেখার আনন্দের মতো ছোট ছোট সুখের উপলব্ধি।"

সন্দীপনের গলায় স্বর বিষণ্ণতায় ডুবে গিয়েছিল। নীলা জানে, সেদিন জীবনের পরস্পর বিরোধী সংজ্ঞার মধ্যেই সান্ত্বনা খুঁজে নেওয়ার কথা বলেছিলেন বাবা।

সায়ন এল দেরি করে। অফিসে শেষ বেলায় মিটিং পড়ে যেতে সময়মতো উঠতে পারেনি। ট্যাক্সিতে বসে খেয়াল হল সেল্ ফোন ফেলে এসেছে। নীলার অ্যাপার্টমেন্টে রাতে থেকে যাবে বলে একটা ওভার-নাইট ব্যাগ এনেছিল। সেটাও অফিসে পড়ে আছে। সেগুলো আনতে গিয়ে আরও দেরি হল।

রাতে শোবার ঘরে বসে নীলা বলল—"অনেক কথা আছে সায়ন। কোথা থেকে শুরু করব জানি না। তোমার শোনার ধৈর্য্য থাকবে কিনা তা ও জানি না।"

ওর ম্লান মুখের দিকে চেয়ে সায়ন উত্তর দিল—"আমি তো আগেই আসতে চেয়েছিলাম নীলা। তুমি বলেছিলে সময় দাও। আই ওয়াজ ওয়েটিং ফর ইয়োর কল।"

নীলা কয়েক মুহূর্ত থেমে থাকার পর কথা শুরু করল—"সাতাশ আঠাশ বছর আগের কথা। বাবা, মা তখন ক্লীভল্যান্ডে ছিলেন। হসপিট্যালে রেসিডেন্সি শেষ করে বাবা সে সময় ফেলোশিপ করছেন। সুমি সবে জন্মেছে। ওর বোধহয় দু' মাস বয়স। ওকে নেবারের কাছে রেখে মা একদিন শপিং-এ গিয়েছিলেন। ফেরার পথে একটা ইন্টার সেকশনে লেফট সাইড থেকে একটা ভ্যান এসে প্রচণ্ড জোরে মারল। মার খুব সিরিয়াস ইনজুরি হয়েছিল। রিস্ট্, রীবস্, হেড ইনজুরি ছাড়াও লিভার, প্যানক্রিয়াসে লেগেছিল। মা হসপিট্যালে। সুমিকে চেনাশোনা ফ্যামিলিরা দেখছে। বাবা তো ভীষণ বিপদে পড়লেন। বুঝতেই পারছিলেন মার এখন সুস্থ হতে সময় লাগবে। সুমিকেই বা বাইরের লোকেরা কতদিন দেখবে? অনেকে অ্যাডভাইস করল ইন্ডিয়া থেকে কোনো রিলেটিভকে টুরিস্ট ভিসায় নিয়ে আসতে। বাবার এক বোনের আসার ইচ্ছে ছিল। মা রাজি হলেন না। শী স্টিল ক্যান্ট্ টলারেট দেম। ইনফ্যাক্ট বাবার বোনেরা খুব রুড। আমাকে কোনোদিন পছন্দ করেনি। এনি ওয়ে, যা বলছিলাম। মার ফ্যামিলি জামশেদপুরে থাকত। ওঁরা সব শুনে মার একজন বউদিকে পাঠিয়ে দিলেন। বাবা ওঁকে এক বছরের জন্যে স্পনসর করেছিলেন।"

সায়ন জিজ্ঞেস করল—"হাউ অ্যাবাউট হার ওন ফ্যামিলি? হাসবেন্ড, বাচ্চা-টাচ্ছাদের ছেড়ে অতদিন থেকে গেলেন?"

—"শি ওয়াজ এ উইডো। বাচ্চা-টাচ্ছা ছিল না। ওঁর হাসবেন্ড ইয়াং বয়সে মারা গিয়েছিলেন। মেজমাইমা জামশেদপুরে জয়েন্ট ফ্যামিলিতে থাকতেন।"

সায়ন হঠাৎ জিজ্ঞেস করল—"তুমি ওঁকে দেখেছ?"

নীলা সরাসরি ওর চোখের দিকে চেয়ে উত্তর দিল—"ছোটবেলায় দেখেছি, যখন জামশেদপুরে যেতাম।"

বড় হবার পর মা আমাকে আর ইন্ডিয়া নিয়ে যাননি। আসলে আমাকে অ্যাডপ্ট্ করাটা দু' বাড়ির কেউই ঠিক পছন্দ করেনি। ছেলে মেয়ে না হলে লোকে অরফ্যানেজ থেকে বাচ্চা নেয়। হঠাৎ একটা আমেরিকান বাচ্চাকে বাড়িতে ঢোকানোর কোনো লজিক ওরা খুঁজে পায়নি। কোথাও কোনো গণ্ডগোল আছে ভেবে বাবার সম্পর্কে বাজে কথা বলার চেষ্টা করেছে। মা এ জন্যে নিজেও ইন্ডিয়া যাওয়া কমিয়ে দিয়েছিলেন। আই ডিড নট্ ওয়ান্ট টু গো ইদার। সুমি, রাজাকে নিয়ে বাবা মাঝে মাঝে ঘুরে আসতেন।"

সায়ন বোঝাতে চেষ্টা করল—"ওঁদের রিলেটিভদের ওপরে তোমার রাগ হতেই পারে। বিকজ্ দে ডিডন্ট কেয়ার অ্যাবাউট ইউ। বাট থিংক অ্যাবাউট দ্য সিচুয়েশন। তখন ক্লীভল্যান্ডে তোমাদের মা অ্যাক্সিডেন্টের পরে রিকভার করছেন। সুমিকে দেখার জন্যে ইন্ডিয়া থেকে লোক আনতে হল। ঐ সময় কেউ একটা নিউবর্ন বেবিকে অ্যাডপ্ট্ করার কথা ভাবতে পারে? আন্লেস্ দেয়ার ওয়াজ সাম আদার রিজন, যেটা তোমার বাবা, মা এক্সপ্লেইন করতে চাননি।"

—"জানি। সেটাই সকলের সন্দেহ হয়েছিল। ইন্ডিয়ান ফ্যামিলিতে আমেরিকান বাচ্চাকে

অ্যাডপ্ট্ করা ওদের কাছে নর্মাল ইন্‌সিডেন্ট বলে মনে হয়নি। এখনও তুমি দ্যাখো, নিজের ছেলে মেয়ে না হলে, ইন্ডিয়ানরা অনেক ওয়েট করে তারপর অ্যাডপ্‌শনের ডিসিশন নেয়। তাও অন্য দেশের ছেলে মেয়ে নিতে চায় না। ঠিক সেই ইন্ডিয়ায় গিয়ে অরফ্যানেজ থেকে নিয়ে আসে।"

সায়ন হাসল—"তোমার গল্পটা কিন্তু থেমে আছে। আমি কফি করে আনছি। তুমি আবার ক্লীভল্যান্ডে সেই রিলেটিভ আসার পর থেকে শুরু কর।"

নীলা খাম থেকে ছবিটা বার করে সায়নের হাতে দিল—"শি ইজ দ্যা ওয়ান্ হু কেম্ টু হেল্‌প মাই মাদার। ওয়াজ ন্‌ট শি ভেরি প্রিটি অ্যাট দ্যাট টাইম্?"

ছবি দেখতে দেখতে সায়ন মুখ তুলে নীলাকে লক্ষ্য করছিল। না, কোথাও সাদৃশ্য নেই। তবু গল্পের শেষটা অনুমান করা যায়। মাথা নেড়ে বলল—"হ্যাঁ। দেখতে ভালোই ছিলেন।"

নীলা অ্যাডপশন ফাইলের পাতা খুলল—"ওঁর নাম এখানে দেখছি বনানী মৈত্র। আমি জানতাম বুলু।"

—"তোমার সঙ্গে লাস্ট টাইম কবে দেখা হয়েছে।"

—"প্রায় পনের বছর আগে। মেজমাইমাকে খুব ভালো লাগত, এত কেয়ারিং, ইন্ডিয়াতে আর কারুর কাছে ওরকম ব্যবহার পাইনি। জামশেদপুরে গেলে মা আর আমাদের দেখতেনই না। আমি আর সুমি সব সময় মেজমাইমার কাছে। শেষবার যখন চলে এলাম, আমাকে জড়িয়ে ধরে খুব কেঁদেছিলেন। ওঁর শাড়িতে ইন্ডিয়ান স্পাইসের গন্ধ, ভেজা চুল থেকে ফুলের মতো হেয়ার অয়েলের গন্ধ। এখনও আমার সেদিনটা মনে পড়ে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে নীলা উঠে দাঁড়াল। ছবি, কাগজপত্র ড্রয়ারে রেখে ঘড়ি দেখল। দুটো বেজে গেছে। পঁচিশ বছরের কথা বলতে বলতে বোধহয় ভোর হয়ে যাবে। সায়ন বিছানায় শুয়ে পড়েছে। নির্ঘুম রাত এভাবেই শেষ হোক।

সায়ন চোখ বন্ধ করে আছে। সারাদিন অফিসের পর এতক্ষণ জেগে থেকে দুজনেই ক্লান্ত। সায়নের ঘুম আসছে ভেবে নীলা জানলার ভারী পর্দা টেনে দিল। ঘরের আলো নিভিয়ে বিছানায় গিয়ে বসল।

মাথার ভেতরে কী যে অস্থিরতা বোধ, আজ কয়েক রাত ছেঁড়া ছেঁড়া তন্দ্রার ঘোরে কেটেছে। অবিন্যস্ত চেতনায় এক অশ্রুসিক্ত মুখ ফিরে ফিরে আসে। তার শাড়ির গন্ধ, মাথা থেকে অচেনা ফুলের সুবাস, সেই হারানো ঘ্রাণ বিষণ্ণ অনুসঙ্গের মতো স্মৃতিকে আচ্ছন্ন করে। নীলার সায়নকে সব কথা বলা হয়নি। এখনও বলা হয়নি নিজের সিদ্ধান্তের কথা। মা, বাবাও জানেন না। জানলে হয়তো বাধা দেবেন না। ওঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় নীলার চোখে জল এল।

অন্ধকারে সায়ন ওকে কাছে টেনে নিয়েছে। এক সময় শরীরের উন্মাদনা শান্ত হলে ওরা আবার সেই অর্ধসমাপ্ত কাহিনীতে ফিরে গেছে।

তখনও ভোরের আলো ফোটেনি। আধো অন্ধকারে সায়নের কাছাকাছি বসে নীলা বলছিল—"মেজমাইমা ক্লীভল্যান্ডে এসে মা, বাবাকে বেশ রিলিফ্ দিলেন। ইংলিশ বলতে অসুবিধে হয়, অ্যামেরিকান লাইফ স্টাইল্ জানেন না। তবু কিন্তু বেশ তাড়াতাড়ি অ্যাডজাস্ট করে নিয়েছিলেন। আসলে মা তো বাড়িতে থাকতেন। ওঁকে ইনস্ট্রাক্‌শন দিতেন। রান্না করা, সুমিকে দেখা, এগুলো তো শেখাতে হয়নি। জামশেদপুরের জয়েন্ট ফ্যামিলিতেও তাই করতেন।"

—"ওঁর হাসবেন্ড কি অনেক আগেই মারা গিয়েছিলেন?"

—"উনি বোধহয় বিয়ের আট-দশ বছরের মধ্যে মারা যান। মেজমাইমা যখন ক্লীভল্যান্ডে আসেন, দেন শি ওয়াজ অলমোস্ট ফর্টি। দো, শি ইউজ্ টু লুক ভেরি ইয়ং। মার কাছে ইংলিশ কন্‌ভারসেশন শেখা, ওয়েস্টার্ন ক্লোদিংস পরা, অল্প সময়েই মেজমামিমা এ দেশটাকে পছন্দ করে ফেললেন।"

সায়ন হাসল—"হয়তো পার্মানেন্ট্‌লি থেকে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। ইন্ডিয়াতে ওঁর কি লাইফ ছিল বলো? শি ওয়াজ টোট্যালি ডিপ্রাইভ্‌ড্ ফ্রম এভরিথিং। এখানে তোমাদের কাছে এসে, হয়ত নতুন লাইফ স্টাইল্‌টা এন্‌জয় করছিলেন।"

নীলা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে আবার কথা শুরু করল—"সুমির যখন ছ' মাস বয়স, মা হঠাৎ ঠিক করলেন মেজমাইমাকে ইন্ডিয়া পাঠিয়ে দেবেন। বাবা অবাক। এক বছরের ভিসায় আনিয়েছেন। চারমাস পরেই মা যদি মেজমাইমাকে ফেরৎ পাঠাতে চান, তবে আর এত খরচ করে এনে কী লাভ হল? মার শরীর ঠিক হয়ে গেলেও আর কয়েক মাস তো মেজমাইমার হেল্‌প পাওয়া যাবে। বাবা বাড়ির কাজকর্ম করতে পারেন না। সময়ও পান না। বাড়িতে মেজমাইমা থাকাতে কত সুবিধে হচ্ছিল। রোজ বাবার পছন্দের ইন্ডিয়ান রান্না, স্পেশ্যালি বাঙালী রান্না হচ্ছে। সুমিকে রেখে মা, বাবা মুভিতে যাচ্ছেন। পার্টিতে যাচ্ছেন। বাবা হঠাৎ মার এরকম ডিসিশন-এর কারণটাই বুঝতে পারলেন না। মেজমাইমাও খুব আপ্‌সেট। বাট শি ওয়াজ কোয়াইট ইনটেলিজেন্ট। মা কোনো কারণে বিরক্ত বুঝে উনি বাবার সঙ্গে কথাবার্তা বলাও কমিয়ে দিলেন। ফ্যামিলিতে একটু বেশি ইনভল্‌ভড হয়ে পড়েছিলেন। কিছুটা অ্যালুফ্ থাকার চেষ্টা করলেন। সুমিকে টেক্ কেয়ার করা ছাড়া আর কোনো ব্যাপারে ইনটারেস্ট দেখাতেন না। মাও বুঝেছিলেন, বাড়াবাড়ি করার দরকার নেই। ওঁর সন্দেহ বা মেজাজ বুঝে মেজমাইমা নিজেও অ্যালার্ট হয়ে গেছেন। বাবাকে বেনিফিট অফ্ ডাউট দিয়ে মা আরও কয়েকমাস মেজমাইমাকে রেখে দিতে রাজি হলেন।"

সায়ন জিজ্ঞেস করল—"এতদিন পরে তোমার কি মনে হয় তোমার মার সন্দেহের কোনো কারণ ছিল?"

—"আই ডাউট। মাই ফাদার ইজ ভেরি হ্যান্ডসাম। প্রফেশন্যালী খুব সাকসেসফুল। কিন্তু এ ধরনের কোনো ইনটেরেস্ট ওঁর ছিল বলে মনে হয় না। তবে বাবা একটু ইমোশন্যাল। দুঃখী মানুষের জন্যে ফিল্ করেন। হয়তো মেজমাইমার জন্যেও সেই ফিলিংটা ছিল। ওঁর রান্না অ্যাপ্রিশিয়েট করতেন। উনি সেজেগুজে থাকলে কম্‌প্লিমেন্ট দিতেন। মার ধারণা মেজমাইমার অলরেডি বাবার ওপর ইনফ্যাচুয়েশন ছিল। বাবা বুঝে অথবা না বুঝে মাঝে মাঝে বোধহয় একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলতেন। ঠিক তখনই মা ডিসিশনটা নিলেন। বাবাকে নিজের সন্দেহের কথা বললেন। মা কষ্ট পান, এমন কোনো কাজ বাবা করতে চান না। ঠিক করলেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেজমাইমার ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু দেরি হয়ে গেল।

ঘরে সকালের রোদ এসে পড়েছে। কুয়াশাহীন নীল আকাশ উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত। মহানগরীর চলমান জীবন স্রোত থেকে আপাত বিচ্ছিন্ন দুটি মানুষ নিজেদের কথায় মগ্ন হয়ে আছে। আজ শনিবার। কাজে যাওয়ার তাড়া নেই। নীলা স্নান সেরে ব্রেকফাস্ট তৈরি করল।

ওদের খেতে বসার আগেই ফোন বাজল। ওয়াশিংটন থেকে সুমির ফোন।

পাকিস্তান থেকে সবে মাত্র ফিরেছে। নীলার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। নীলা বলল কাল রবিবার গ্রেনীচে যাবে। সুমি জানাল ওরা তাহলে আজ সন্ধে নাগাদ ওখানে পৌঁছোবে। সুমি সায়নের খবর নিচ্ছিল। নীলা সায়নকে ডেকে দেওয়ার পর খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলে সায়ন ফোন রেখে ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসল।

গল্পের সূত্র ধরে সায়ন বলল—"বনানী মৈত্র শেষপর্যন্ত ফিরে গেলেন কবে? তোমার মা কি ওঁকে ও কোনো ইন্ডিকেশন দিয়েছিলেন?"

—"মা ওঁকে কোনো এক্সপ্ল্যানেশন দেওয়া দরকার মনে করেননি। কাজের জন্যে আনা হয়েছিল। কাজ শেষ হয়ে গেছে। মা নিজেই যখন সব করতে পারছেন, আন্‌নেসেসারি মেজমাইমাকে আটকে রাখবেন কেন। মার অ্যাটিচ্যিউড দেখে মেজমাইমা চলে যাবার জন্যে তৈরি হলেন। এদিকে বাবার খেয়াল হল দু' মাস পরে ওঁদের ইওরোপ যেতে হবে। জেনিভায় মেডিকেল কনফারেন্স্। মাকে নিয়ে সুইটজারল্যান্ডে কয়েকদিনের ট্যুর নেবেন। আগে ঠিক ছিল সুমি তখন মেজমাইমার কাছে থাকবে। ট্র্যাভ্‌ল্‌টা ওর পক্ষে বেশি হয়ে যাবে ভেবে ক্লীভল্যান্ডে রেখে যাওয়ার কথা হয়েছিল। কিন্তু মেজমাইমা ইন্ডিয়া চলে গেলে সুমি কোথায় থাকবে। সেজন্যে ওঁর যাওয়া পিছিয়ে দেওয়া হল। অথচ মা কিন্তু শেষপর্যন্ত সুমিকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। মেজমাইমা ক্লীভল্যান্ডে একাই থাকলেন।

দু-আড়াই মাস বাসে ওঁর ফেরার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মা তখন জানতে পারলেন মেজমাইমা ওয়াজ এক্সপেক্‌টিং। সায়ন, সিচ্যুয়েশনটা চিন্তা করো! মেজমাইমা প্রেগনেন্ট। ভয়ে, লজ্জায়, টেন্‌শনে কারুর নাম ডিস্‌ক্লোজ করতে চাইছেন না। মা ভীষণ অশান্তি করছেন। বাবা কোনো সলিউশন খুঁজে না পেয়ে মাকে দোষ দিচ্ছেন। জামসেদপুর থেকে মেজমাইমাকে আনার আইডিয়া তো মারই ছিল। মেজমাইমা তখন সব কিছু অ্যাড্‌মিট করলেন।"

নীলা ব্রেকফাস্টের বাসনপত্র রান্নাঘরে রেখে বসার ঘরে এল। খানিক অন্যমনস্কের মতো চেয়ে থেকে বলল—"লাইফ ইজ সো স্ট্রেঞ্জ! কারুর সম্পর্কে কোনো ধারণা তৈরি করাটাই হয়তো ভুল। মা, বাবা চিন্তাও করতে পারেননি, একজন উইডো মহিলার এত বছর পরেও এরকম সেক্‌শ্যুয়াল ডিজায়ার থাকতে পারে। তিনি প্রায় অচেনা পুরুষের সঙ্গে এতখানি ঘনিষ্ঠ হতে পারেন....."।

সায়ন মাথা নাড়ল—"আই ডোন্ট থিংক সো। তোমার মা অফ্ কোর্স বুঝেছিলেন। তাই রেগে যেতেন। নীলা, ব্যাপারটা অন্য পারস্‌পেক্‌টিভে দেখার চেষ্টা করো। বনানী তখন ইয়াং না হলেও তাঁর নর্মাল সেক্‌শুয়্যাল ডিজায়ার ছিল। অনেক বছর সাপ্রেশনের মধ্যে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। তার মানে এই নয় যে, তাঁর ইচ্ছে অনিচ্ছেগুলো মরে গিয়েছিল।"

—"জানি। ওঁর হাসবেন্ড ছিল না। ছেলে মেয়ে ছিল না। কারুর কাছে লয়্যাল থাকার কমিট্‌মেন্ট ছিল না। বাধ্য হয়ে উইডোর মতো থাকতেন। আমেরিকায় এসে এই পারমিসিভ সোসাইটি দেখলেন। টিভিতে দুপুর বেলা সোপ অপেরা দেখছেন। সেখানে বেডরুম সিনগুলো ভাব? রাস্তা ঘাটে, পার্কে যেখানেই যাচ্ছেন, ওপন সেক্‌স্, চুমু খাওয়া, জড়াজড়ি। এভাবেই হয়ত ওঁর লেটেন্ট সেক্‌শুয়্যালিটি জেগে উঠেছিল। তাই যেদিন একজন আমেরিকান পুরুষ

ওঁকে চাইল, শি কুডন্‌ট্‌ রেসিস্ট হারসেল্ফ। বাবা বলছিলেন, তখন মানুষের কাছে ভালো কাজ, খারাপ কাজের ব্যাপারটা রিলেটিভ হয়ে যায়। কারণ ভালো হয়ে থাকা বলতে যা বোঝায়, সেই মর‍্যালিটি তাকে এতদিন কোনো আনন্দ দেয়নি। সে কেন আর নিজেকে ডিপ্রাইভ্‌ করবে?''

সায়ন একটু ইতস্তত ভাবে প্রশ্ন করল—''আমেরিকান লোকটি কি বাড়িতে আসত? বনানী ওঁকে চিনলেন কী করে?''

নীলা ম্লান হাসল—''সেই লোকটি আমার নিজের বাবা। অথচ কেউ তাকে চিনত না। মেজমাইমা সুমিকে নিয়ে রোজ পার্কে যেতেন। লোকটি যেখানে জগ্‌ করতে আসত। বোধহয় কোথাও নাইট শিফ্‌টে চাকরি করত। বিকেলের দিকে পার্কে এলে ওদের দেখা হত। মেজমাইমার কাছে ব্যাপারটা অলমোস্ট অ্যাফেয়ারের মতো মনে হয়ছিল। লোকটি ওর অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে যেতে চাইত। কিন্তু সুমিকে সঙ্গে নিয়ে মেজমাইমা সেখানে যেতে রাজি হননি। অ্যান্ড দেন, ইউ গেস হোয়াট হ্যাপেন্‌ড্‌.....।''

সায়ন বলল—''তোমার বাবা, মা যখন জেনিভায়, লোকটি একা বাড়িতে সেই সুযোগ নিয়েছিল। তারপর বনানী কন্‌সিভ করেছে জেনে আর কনট্যাক্ট রাখেনি।''

—''সে বোধহয় জানতেও পারেনি। বাবা রাগের মাথায় তার নামে পুলিস রিপোর্ট করতে চেয়েছিলেন। মা বোঝাল, তাতে কোনো কাজ হবে না। মেজমাইমা অ্যাডাল্ট মহিলা। কন্‌সেন্‌শুয়্যাল সেক্স-এর এগেন্‌স্টে রেপ চার্জ আনা যায় না। মাঝখান থেকে লোক জানাজানি হবে। বাবা আর কোনো স্টেপ নেননি। ওঁদের তখন মেইন কনসার্ন ছিল মেজমাইমাকে নিয়ে। অ্যাবরশন লীগ্যালাইজড নয়। বাবা নিজে ডাক্তার হয়ে কোনো ইল্‌লিগ্যাল্‌ কাজ করবেন না। ক্লীভল্যান্ডে ছোট বেঙ্গলি কমিউনিটি ছিল। মা ভয় পাচ্ছিলেন বেশি দেরি হয়ে গেলে ঘটনাটা লুকিয়ে রাখা যাবে না। ঐ স্টেজে মেজমাইমাকে ইন্ডিয়ায় পাঠানোও পসিব্‌ল্‌ নয়। মা, বাবা ভীষণ চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন।''

একই ঘটনার কথা সন্ধে বেলা গ্রেনীচের বাড়িতে বসে সুমি শুনছিল ওর মার মুখে। ও আজ ওয়াশিংটন থেকে একাই চলে এসেছে। নীলার জন্যে মনটা খুব অস্থির লাগছিল। কাল নীলা আসবে। সায়নকে ওর জন্মের ঘটনা বলেছে। কাল সায়নও ওর সঙ্গে গ্রেনীচে আসবে। ঈশানীর ধারণা ওদের বিয়েটা বোধহয় পিছিয়ে যাবে। নীলা যে ঠিক কী করতে চায়, ঈশানী বুঝে উঠতে পারছে না। কেবলই ভয় হচ্ছে, এক কলংকিত অতীতের ঘটনার জের টেনে নীলা আর কতদূর যাবে? গোপনতার মধ্যে তবু আপাত শান্তি ছিল। ঈশানীর আজ আর পাপ পুণ্যের বিচার মনে আসে না। ব্যভিচার বলো, অবৈধ সম্পর্ক বলো, মেজবউদি কারুর সংসার ভেঙে দেয়নি। মুহূর্তের দুর্বলতায়, ভুল ভ্রান্তি যা কিছু ঘটেছে, আজও একাই তার শাস্তি ভোগ করছে। নিরুপায় ভীত সেই মানুষ কখনও মাতৃত্বের অধিকার চায়নি। নিজের সন্তানকে দেখার পরেও সমাজের লক্ষ্মণরেখা পার হবার সাহস ছিল না। আজ প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পৌঁছে সে তার নিজের পরিবেশে নিজের মতো করে বেঁচে আছে। নীলা কি সেই সামান্য স্বস্তিটুকুও কেড়ে নেবে?

কথা বলে বলে ঈশানীর ক্লান্তি আসছে। তবু সুমি আরও কিছু শুনতে চায়। ঈশানী গল্পের

শেষ পর্বে এল—"ক্লীভল্যান্ডে মেজবউদিকে বেশিদিন থাকতে হয়নি। তোর বাবার এক আমেরিকান ডাক্তার বন্ধু খুব হেল্প করলেন।তুই ওঁকে পরে দেখেওছিস। ডক্টর ম্যাক্‌ডুগ্যাল। ওঁর বোন ছিলেন নিউইয়র্কের মাউন্ট সায়নাই হস্‌পিট্যালে পিডিয়াট্রিশিয়ান। মারও যথেষ্ট টাকাপয়সা। মার বাড়িতে মাঝে মাঝে ফস্টার চাইল্ডরা থাকে। ওঁরা পুরো ঘটনা শুনে মেজ বউদিকে পাঠিয়ে দিতে বললেন। আমরা ম্যানহ্যাটনে পৌঁছে দিয়ে গেলাম। তখন থেকে ডেলিভারি পর্যন্ত উনি ওঁদের বাড়িতে ছিলেন। মাউন্ট সায়নাই হসপিট্যালে নীলা ডিউ ডেটের আগেই জন্মাল। তোর তখন দেড় বছর বয়স।"

সুমির তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি—"ভাবতেই পারছি না আমাদের ফ্যামিলিতে এরকম একটা সিক্রেট ছিল। মেজমাইমাকে কতবার দেখেছি। আশ্চর্য। ওঁর সঙ্গে নীলার কোনো সিমিল্যারিটিও তো নেই। আচ্ছা মা, তুমি আর বাবা ছাড়া ইন্‌সিডেন্টটা সত্যিই আর কেউ জানে না?"

—"তাহলে তুই আগে জানতে পারতিস। ভেবেছিলাম শুধু তোকে একদিন সব কথা বলবো। নীলার কি জানার কোনো দরকার ছিল বল? নিজে কষ্ট পাচ্ছে। আমাদের কষ্ট দিচ্ছে। এরপর যে কী করবে তাও জানি না।"

রবিবার সকালে গ্রেনীচের বাড়িতে নীলা একাই এল। সুমি জিজ্ঞেস করল—"কি রে? সায়ন কোথায়?"

নীলা হাসল—"ব্যাক টু ব্রুক্‌লীন। আজ সারাদিন পড়াশোনা করবে।"

সুমির সঙ্গে গল্প করতে করতে নীলা ঈশানীর কাছে এসে বলল—"মা, তোমরা নেক্‌স্ট কবে ইন্ডিয়া যাচ্ছ?"

—"ফেব্রুয়ারিতে যাব বোধহয়। দেখি, তোর বাবা কবে ভেকেশন নেয়।"

—"তার আগে আমার সঙ্গে চল। আমি ডিসেম্বরে যাচ্ছি।"

ঈশানী চমকে উঠল—"হঠাৎ ইন্ডিয়া যাচ্ছিস? আগে তো কিছু বলিসনি!"

—"হঠাৎই ঠিক করলাম। ক্রীসমাস ডে-তে রিজার্ভেশনও পেয়ে গেছি।"

ইশানী ক্ষুব্ধ হয়ে বলল—"তা হলে আর সঙ্গে যেতে বলছিস কেন?"

নীলা মার অভিমান ভাঙাতে চাইল—"তুমি বিজনেস ক্লাসে টিকিট পেয়ে যাবে। তুমি না গেলে জামশেদপুরের বাড়িটা আমি খুঁজে পাবো না।"

সুমি বোঝাতে চেষ্টা করল—"আই ডোন্ট থিংক ইউ মেড এ গুড ডিসিশন। নীলা, মেজমাইমার কথা একবার ভাবো। ওঁর জন্যেই মা এত বছর ধরে একটা সিক্রেট লুকিয়ে রেখেছেন। তুমি সব সময় আপসেট থাকতে। তবু মা অনেকদিন পর্যন্ত কিছু বলতে পারেনি। একটাই ভয়। তুমি মেজমাইমার কাছে চলে যেতে চাইবে। ইন্ডিয়াতে আত্মীয়রা সব কথা জেনে যাবে। নীলা, প্লিজ ডোন্ট ট্রাই টু ওপ্‌ন্ প্যান্ডোরাস্ বক্স্....।"

ঈশানীর বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে শান্ত অবিচল স্বরে নীলা উত্তর দিল—"ভেবেছিলাম তুমি আমার সঙ্গে যাবে। তুমি ছাড়া আমার কোনো আইডেনটিটি নেই। মেজমাইমার কাছে যাব উনি কেমন ভাবে বেঁচে আছেন জানার জন্যে। যদি বলেন ভালো আছেন, আমেরিকার এপিসোডটাই ভুলে থাকতে চান, তাই বিশ্বাস করে ফিরে আসব। উই নেভার হ্যাড এনি বন্ডিং

বিটুইন্ আস। দুঃখ হলেও অ্যাকসেপ্ট করে নিতে চেষ্টা করব। ওঁর জীবনে আমার একসিসটেন্স মিথ্যে হয়ে গেছে।"

সন্দীপন মেয়ের পিঠে রাখল—" যদি দেখিস উনি ভালো নেই, কষ্টে আছেন, তোকে দেখে অসম্ভব কোনো কিছু আশা করছেন, তখন কী করবি?"

নীলা চোখ মুছল—"তোমরা যা করেছিলে তাই করব। আমাকে অরফ্যানেজে পাঠাওনি। বাড়িতে নিয়ে এসেছিলে। মেজমাইমাকে নিজের কাছে নিয়ে আসব।"

ক্রিসমাসের ছুটিতে নীলা ঈশানীর সঙ্গে জামশেদপুরে গেল। নিউইয়র্কে ফেরার আগে সায়নকে ই-মেইল পাঠাল—মেজমাইমা ভালো নেই। আমি হয়ত স্বার্থপরের মতো ওঁর ভালো না থাকাটাই আশা করেছিলাম। টুরিস্ট ভিসায় সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। না হলে, ফিরে গিয়ে ইমিগ্রেশনের জন্যে স্পনসর করব। সায়ন, লাইফের ডেফিনিশন মনে পড়ছে। এ চাইল্ড ক্রাইং ফর হার মাম।

আকাশের মতো নীল চোখে সায়ন আর বৃষ্টি দেখতে চায় না। আশ্চর্য সুন্দর এক মুখ। তার ঠোঁটে উজ্জ্বল হাসির আভাস মনে পড়ে। লিংকন সেন্টারের সামনে নীলাকে প্রথম দেখার অনুভূতি, অনুসঙ্গ নিয়ে সায়ন তার ফেরার প্রতীক্ষায় থাকে।

আমেরিকায় সেজমেসো

ড্রয়ার পরিষ্কার করতে গিয়ে একটা ছেঁড়া খামে দুটো ছবি পেলাম। আঠার বছর আগে তোলা। নিউইয়র্কে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের সামনে সেজোমাসিমা আর মেসো দাঁড়িয়ে আছেন। অন্য ছবিটা ইউ.এন বিল্ডিং-এর সিঁড়িতে টুপি মাথায় মেসো। তখন গরমকাল। ওঁরা কলকাতা থেকে বড় মেয়ে, জামাই-এর কাছে ক্যালিফোর্ণিয়া গিয়েছিলেন। মাঝে কয়েকদিনের জন্যে ইস্ট্‌কোস্টে এসে আমাদের কাছে ছিলেন। ওঁরা আমার নিজের মাসি, মেসো নন। সম্পর্কে মাসি-শাশুড়ি আর শ্বশুর। ভবানীপুরের লোক। শাঁখারি পাড়ায় থাকতেন। মেসো প্রচণ্ড খাদ্যরসিক। নিজের ব্যাপারে নয়। অন্যকে খাইয়েই তাঁর মহা আনন্দ। যখনই ওঁদের শাঁখারি পাড়ার বাড়িতে গেছি, পাড়ার তেলেভাজা, বেগুনি, চপ, কাটলেট থেকে শুরু করে ভবানীপুরের তাবৎ সুখাদ্য এনে হাজির করতেন। মেসোর গলার আওয়াজটা একটু ফাটা মতো বলে দ্বিগুণ চিৎকার করে কথা বলতেন। চপ কাটলেটের মাঝে মাঝেই হুংকার—"আরে! কথা বলেই তো ঠান্ডা করে দিলে! গরম গরম ভাজিয়ে আনলাম। তোমাদের মাসির যত বাজে গল্প।"

আমেরিকায় বেড়াতে আসার বেশ ক'বছর আগেই মেসো রেলওয়ে থেকে রিটায়ার করেছিলেন। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। এবার নিশ্চিন্ত হয়ে দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছেন। রেল-এর পাস নিয়ে দেশে অনেক ঘুরে বেড়ালেও এই প্রথম বিদেশে আসছেন। ভবানীপুরের বাইরে কোনো জায়গাই উনি বাসযোগ্য মনে করেন না। আমরা তাই ভাবছিলাম এদেশে ওঁর কেমন লাগবে? খালি জগুবাবুর বাজারে যাওয়া, ব্যাঙ্কে যাওয়া, তেলেভাজা খাওয়া—এসব বন্ধ রেখে দু-তিন মাস মেয়ের কাছে থাকতে রাজি হলে হয়।

এখানে এসে দুজনেই বেশ খুশি দেখলাম। মাসিমা আমার জন্যে সুন্দর একখানা শাড়ি এনেছেন। চকোলেট আর ছাই রঙের ছাপা পিওর সিল্ক। আমার পছন্দ হয়েছে শুনে মেসো চিৎকার করলেন—"ম্যাড্রাসী মুর্শিদাবাদী। জমিটা দেখেছ।"

আমার হাসি পাচ্ছিল। প্রিন্টেড মাইসোর সিল্কের ভালোই নাম দিয়েছেন মেসো। কিন্তু মাসি ভুরু কুঁচকে বললেন—"কিছু জানো না। খালি বকা। তুমি শাড়ি চেনো?"

কর্ণাটক আর তামিলনাড়ুর ভূগোল নিয়ে গোলমাল বেধেছে দেখে আমি শান্ত করতে গেলাম—"মেসোমশাই, এটা মাইসোর সিল্ক। খুব ভালো শাড়ি।"

মেসো মাথা দোলাতে লাগলেন—"যাক্, তোমার পছন্দ হয়েছে। তোমার মাসিমা তো এক ঢাকাই কেনার তালে ছিল। আ....মি তখন এটা পছন্দ করলাম....।"

মেসোদের ভ্রমণযোগ চলতে লাগল। একেক দিন নিউইয়র্কে ঘুরে আসেন আর চমকপ্রদ সব বিবরণ দেন। ওঁর হাবভাব দেখে আমার স্কুলে পড়া মেয়ে খুব মজা পেত। একদিন

নিউইয়র্ক দেখে এসে ওকে বললেন—"আজ ট্রেড হাউস দেখে এলাম। ওঃ কী বিল্ডিং! ছাদে উঠে মনে হল কৈলাশে চড়েছি। তুমি কৈলাশ কোথায় জানো?"

মেয়ে জিজ্ঞেস করল—"ট্রেড হাউস আবার কোথায়? আমরা তো জানি না।"

মেসোর চেরা গলা সপ্তমে উঠল—"দ্যাখো কাণ্ড! বাবা, মা তোমায় ট্রেড হাউস দেখাতে নিয়ে যায়নি? আমেরিকার টলেস্ট্ টুইন্ টাওয়ার দ্যাখোনি? এ হে হে! আমরা জানলে তোমায় সঙ্গে নিয়ে যেতুম।"

মেয়ে হাসতে লাগল—'মেজদাদু, ওটা ট্রেড হাউস নয়। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার।"

মেসো দমলেন না—"ওই একই হল। ইন্টারন্যাশন্যাল টেডিং সেন্টার তো। ওয়াল্ স্ট্রিট হচ্ছে বম্বের দালাল স্ট্রিট। তুমি বম্বে গ্যাছো?"

মেয়ে বলল—"অনেক বার। কিন্তু তোমরা আর কী দেখলে নিউইয়র্কে?"

মেসো তারস্বরে ফর্দ দিতে লাগলেন—"ব্রড স্ট্রিট দেখলুম। একেবারে হাতিবাগান! চারদিকে থিয়েটার হল। তারপর রেডিও হাউসের পাশ দিয়ে গেলুম। এম্পায়ার বিল্ডিং-এ আর উঠিনি। সামনে থেকে দেখলুম। তাই লক্ষ্মীকে বলছিলুম "কিংকং" সিনেমাটা তো দ্যাখোনি। ওই এম্পায়ার বিল্ডিং-এর মাথায় চড়ে গরিলাটা কী কাণ্ড করেছিল। মেমসাহেবটাকে পুতুলের মতো বগলে চেপে দাঁত বের করে কী গর্জন।"

মেসোর লাগাতার গর্জন থেকে আমার মেয়ে তাঁর ক'দিনের নিউইর্য়ক ভ্রমণ পর্ব উদ্ধার করেছিল। মেসো ব্রড-ওয়েতে থিয়েটার ডিস্ট্রিক্ট্-এ গিয়েছিলেন। ব্রড-ওয়ে শোর পাড়ায়। সেটাই ওঁর "ব্রড স্ট্রিট"। রেডিও হাউস হচ্ছে রেডিও সিটি মিউজিক হল। পোর্ট অথরিটি বাস টার্মিন্যালকে বলছিলেন "বাস্ অথরিটি ডিপো"। আমাদের হাসি পেতো না। নতুন জায়গায় গিয়ে ওরকম হয়। কিন্তু একদিন মেসো অন্য একটা কথা তুললেন।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর গল্প হচ্ছিল। ওঁর জামাই-এর কথা উঠল। আমাদের সঙ্গে তার ভালোই চেনাশোনা। আমরা যখন প্রথম এদেশে এসে নিউইয়র্কে কুইনসে ছিলাম, তখন মাসিমার মেয়ে জামাইও ওখানে থাকত। খুবই আসা-যাওয়া ছিল। তারপর ওরা দেশে ফিরে গিয়েছিল। আবার এতদিন পরে আমেরিকায় এসে ক্যালিফোর্ণিয়ায় চাকরি নিয়েছে। জামাই বি.ই. কলেজের ইঞ্জিনিয়ার। নিউইয়র্ক থেকে মাস্টার্স করেছিল।

এবার মেসো হঠাৎ বললেন—"আমেরিকার অবস্থা কী হল বলো দিকিনি? ওরা যে কী করতে আবার এখানে ফিরে এল? দোকানদারি করার জন্যে কেউ আসে?"

আমরা অবাক! দোকানদারি আবার কী? ওর জামাই তো ওখানে নতুন কোম্পানিতে চাকরি নিয়েছে। তাহলে কি সঙ্গে ছোট ব্যবসা-ট্যাবসাও করে? কিন্তু সদ্য এসে এখনই দোকান খুলে বসেছে? আমরা জিজ্ঞেস করলাম—"দোকানদারি মানে? ও তো চাকরী করছে ওখানে।"

মেসো সখেদে গর্জন করলেন—"আরে এটাই তো চাকরি। দেখে শুনে মেয়েটার বিয়ে দিয়েছিলুম। শিবপুরের ইঞ্জিনিয়ার। এখন শপ্ কিপিং করছে!"

কথাটা শুনে খট্‌কা লাগল। বুক কিপিং জানি। শপ কিপিং আবার কী চাকরি? এদিকে বলছেন কোম্পানিতে আছে।

আমার স্বামী জিজ্ঞেস করলেন—"শপ কিপিং কথাটা কে বলেছে আপনাকে?"

—"কে আবার? নিজেই বলেছে। এখন কিছুদিন ওদিকে শপ্‌কিপার হয়ে থাকবে। তারপর নাকি ক্যারোলিনা না কোথায় পাঠিয়ে দেবে। সেখানেও শপ কিপিং.....।"

সেজমাসিমা বললেন—"তাই তো বলছিল। একটা কী কোম্পানি ওদের এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পাঠাচ্ছে। তবে মাইনে দিচ্ছে অনেক। বলছে আগে নিউইয়র্কে থাকতে যা রোজগার করত, এখন তার ডবল পাচ্ছে।"

এতক্ষণে ব্যাপারটা স্পষ্ট হল। আমার স্বামী হেসে উঠে বললেন—"মেসোমশাই, আপনাকে শপ কিপিং বলেছিল? না জব শপিং?"

মেসো একটু ভেবে বললেন—"অ্যায়! কথাটা তাই কী যেন তুমি বললে? জব কিপিং?"

—"জব শপিং। জব শপিং। তাই বলুন! কী বলে যাচ্ছেন তখন থেকে! জামাই দোকানদারি করবে কেন। চাকরিই করছে।"

মেসো সন্দিগ্ধ—"কিন্তু কী চাকরি বলো তো? শপিং কথাটা আসছে কোত্থেকে? আর, একটা জায়গায়ও তো থাকছে না। বলছে ক্যারোলিনাতে আর এক কোম্পানিতে পাঠাবে। কারা পাঠাবে?"

তখন মেসোকে ব্যাপারটা বোঝানো হল। জব শপিং কোনো কোম্পানির স্থায়ী চাকরি নয়। স্থায়ী চাকরির মতো নানা সুখ সুবিধে, উন্নতির সুযোগ নেই। তবে রোজগার যথেষ্ট। এক সময় জব শপিং করে অনেক বাঙালি সারা আমেরিকা ঘুরে অনেক রোজগার করেছেন। পেশাগত উচ্চাশা পূর্ণ না হোক, ভালো মাইনে পেয়েছেন। জব শপিং কোম্পানিগুলি এঁদের নিয়ে অন্য কোম্পানিতে কাজ করায় বলে এঁদের "জব শপার" বলে। মেসোমশাই-এর জামাই ক্যালিফোর্ণিয়ায় এসে হয়তো সাময়িক ভাবে এ কাজ করছে। বেশিদিন আমেরিকায় থাকবে কিনা তাও মনস্থির করেনি। এরপর নর্থ ক্যারোলাইনা যাওয়ার কথা। মেসো ওই অবধি শুনে এসে ধন্দে পড়ে গেছেন। শিবপুরের জামাই দোকানে বসছে ভেবে ভীষণ হতাশ।

যাই হোক্, তাঁর চিন্তা দূর হল। এবার নায়াগ্রা ফল্‌স যাওয়ার ব্যবস্থা। চন্দন নামে একটি ছেলে নিউইয়র্কে থাকে। ওঁদের জামাই-এর চেনা। সে ওঁদের নায়াগ্রা নিয়ে যাবে। রওনা হবার আগের দিন চন্দন আমাদের কাছে চলে এল। পরদিন ভোরে রওনা হওয়া। ইতিমধ্যে আগস্ট শেষ হয়ে আসছে। নায়াগ্রা ফলসে একটু ঠান্ডা পড়তে পারে। মেসোদের সঙ্গে পাতলা গরম জামা বা জ্যাকেট থাকা দরকার। সে কথা বলাতে মাসিমা বললেন কার্ডিগান নিয়ে নেবো। কিন্তু মেসো কিছুতেই ওভারকোট বা ভারী সোয়েটার নিতে রাজি নন। বললেন—"সন্ধের দিকে জোলো হাওয়া ছাড়বে নাকি? তার জন্যে সারাদিন গরম জামা বইবে কে?"

আমরা বললাম একটা কিছু নিতেই হবে। নইলে ঠান্ডা লাগবে। তখন মেসো হঠাৎ দোতলায় চলে গেলেন। তারপর একটু বাদেই সিঁড়ির মাথায় অবতীর্ণ। পরনে একটা ছাই ছাই রঙের ড্রেসিং গাউন। কোমরে কর্ড বেঁধে কমল মিত্র স্টাইলে দাঁড়িয়ে আছেন। নিজেকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে মেসো হাঁক ছাড়লেন—"কেমন একখানা জিনিস এনেছি দ্যাখো। গরম কাপড় কিনে করালুম। তোমাদের এখানে তো পরাই হল না।"

বললাম—"পরলেই তো পারেন। সকালের দিকে একটু ঠান্ডা থাকে। শুধু গেঞ্জি পরে ঘোরেন...।"

ড্রেসিং গাউন দুলিয়ে নামতে নামতে মেসোর চিৎকার—"এইবার পরব। কাল নায়াগ্রা

ফল্‌সে গিয়ে বউনি করব। কী জব্বর জিনিস বলো? ওঃ এখনই কান, মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে।"

আমার মেয়ে চোখ ঘুরিয়ে বলল— "তার মানে? তুমি এটা পরে বাইরে বেরোবে? নায়াগ্রা ঘুরবে? কিছুতেই না। নো ওয়ে।"

মেসো একটু দমে গিয়েছেন—"কেন? এটা তো বেশ গরম। শার্ট, প্যান্টের ওপর চাপিয়ে নেওয়া যাবে না?"

মেসোর পৃথিবী কোন যুগের ভবানীপুরের গলিতে শাঁখারি পাড়ায় মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে যে বাড়ির বাইরে যাওয়া যায় না, সেটাও খেয়াল নেই। আমাদের সমবেত বকাবকিতে এত অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন যে বলার নয়। ড্রেসিং গাউন খুলে ফেলে ঝপ করে আমার স্বামীর ঘাড়ে ফেলে দিয়ে বললেন—"তবে তুমি নিয়ে নাও। এ আমার কোন্ কর্মে লাগবে? আমেরিকার জন্যেই তো করিয়েছিলুম।"

আমার স্বামী বোঝালেন—"কেন? বাড়িতে সকাল, সন্ধে পরবেন। এখনও তো কিছুদিন আছেন। দেশেও শীতকালে পরবেন।"

—"ধু...উ...উ...র। কলকাতায় আবার শীতকাল!"

আমরা বললাম—"তা হোক। ভালো জিনিসটা করিয়েছেন। এদেশে তো অন্তত পরুন। না হয় পরে জামাইকে দিয়ে যাবেন।"

মেসো ক্ষুণ্ণ মনে গাউন বগলে দোতলায় উঠে গেলেন।

পরদিন ভোর থেকে হাঁকাহাঁকি। চন্দন বলেছিল একটু দেরিতে রওনা দেবে। আমাদের এখান থেকে বাফেলো আট ঘণ্টার রাস্তা। সেখানে থেকে নায়াগ্রা গিয়ে রাতটা আমেরিকার বর্ডারে হোটেলে থেকে যাবে। পরদিন ক্যানাডা বর্ডার পার হয়ে ওদিক থেকে নায়াগ্রা দেখবে। সন্ধেবেলা নায়েগ্রায় আলোর খেলা দেখে আবার আমেরিকার ওই হোটেলেই ফিরে আসবে। পরদিন সকালে রওনা দিয়ে বিকেল নাগাদ এখানে এসে পৌঁছাবে। মেসোমশাই তাড়া দিয়ে চন্দনকে ডেকে তুললেন। বেশ একটা শুভস্য শীঘ্রম ভাব। দেখি কোট মাফলার সঙ্গে নিচ্ছেন। সাধের ড্রেসিং গাউনের হেনস্থা দেখে এবার একেবারে নব সাজে চলেছেন। ভালোই হয়েছে। বয়স্ক মানুষ ওঁরা, গরম জামাকাপড় সঙ্গে থাকা দরকার। স্টিয়ারিং-এ লাল টি-শার্ট পরা রোগাপটকা চন্দন। পাশে মোটা কোট পরা মেসো। পেছনের সিটে পা তুলে বসে কার্ডিগান পরা মাসিমা। দুর্গা দুর্গা বলে ওঁরা রওনা হয়ে গেলেন।

দুদিন পরে ওঁরা ফিরলেন। চন্দন ওঁদের নামিয়ে দিয়ে নিউইয়র্ক চলে গেল। নায়াগ্রা দেখার পর মাসিমা, মেসোমশাইকে বেশ উচ্ছ্বসিত দেখব ভেবেছিলাম। কিন্তু মাসিমা যেন অন্য কিছু ভাবছেন। কেমন দেখলেন জানতে চাওয়ায় বললেন—"খু...উ...ব ভালো করে দেখলাম। স্টিমারে করে যখন ফল্‌স্-এর নীচে নিয়ে গেল, বাবাঃ ঝাপটা খেয়ে মরি!"

—"রাত্তির বেলার ইলিউমিনেশনটা কী দারুণ না? ক্যানাডার দিক থেকে দেখেছেন তো?"

হঠাৎ মাসিমা বললেন—"ওই জন্যেই তো রাত্তিরে হোটেলে থাকতে হল। তখনই যদি বেরিয়ে পড়তাম ভালো হত।"

—"তাহলে সারারাত ধরে আসতে হত। কী দরকার? তার চেয়ে একরাত হোটেলে রেস্ট পেয়ে গেলেন।"

মেসো বাড়ি এসেই বাথরুমে ঢুকেছিলেন। বেরিয়ে আমার গলা পেয়ে সহর্ষে যোগ দিলেন—"ওরে বাবা! কী জিনিসই দেখলুম রে! নায়েগ্রা নায়েগ্রা শুনেই এসেছি চিরকাল। ওঃ, সামনে থেকে দেখে বুঝলুম প্রকৃতির কি লীলা। আহা! যেন আকাশ থেকে গঙ্গা নেমে আসছে।"

সন্ধে হয়ে আসছিল। ওঁরাও সারাদিন জার্নি করে এসে ক্লান্ত। ভাবলাম তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া মিটিয়ে দেব। মেসো বললেন—"পেটটা ভুট্‌ভাট করছে। রাত্তিরে বেশি কিছু দিও না।" তারপর বাগানে পায়চারি করতে গেলেন। মাসিমা এতক্ষণ যেন কিছু বলার জন্যে উশখুশ করছিলেন। এবার বললেন—"জানো? কাল ভূত এসেছিল। নায়েগ্রা ফল্‌সের ভূত। — "সেকি? কোথায় ভূত দেখলেন?"

মাসিমার গলায় শিহরণ—"হোটেলের ঘরে। সারারাত জ্বালিয়েছে। শেষে ভোরের দিকে পালিয়ে গেল।"

রহস্যের গন্ধ পেয়ে আমার তো নড়েচড়ে বসা উচিত। কিন্তু সেজমাসিমার ভূত দর্শন সম্পর্কে একটু সন্দেহ হচ্ছে। আমার ধারণা আমার শাশুড়ির বাপের বাড়িতে ভূত হচ্ছে নিয়মিত অতিথি। ওঁরা যখন যেখানে থেকেছেন দিদিমা প্রত্যেক বাড়িতে ভূত দেখেছেন। তাও আবার শুধু দিশি ভূত নয়। ভাগলপুর না গয়া কোথায় যেন দিদিমা "কাফ্রি ভূত" দেখেছিলেন। ঝাঁকড়া-চুলো নিগ্রো ভুত জানলা দিয়ে শরীর গলিয়ে ওঁর ছোট্ট ছেলের ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখছিল। দুই দিকে দুই "থাবা"। সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে দিদিমা ফিট হয়ে গিয়েছিলেন। মাঝরাতে কুয়োপাড়ে বেহারি বউ-এর কান্না, রান্নাঘরে ঝন্‌ঝন্ বাসন পড়ার শব্দ, দিদিমা না কি শুনেছেন। কলকাতায় এসেও রেহাই পাননি। ওঁদের ভবানীপুরের রায়েড স্ট্রিটের বাড়িতে ছিল এক আশ্চর্য আর্ম চেয়ার। রাত আটটা বাজলেই কে যেন সেটা দখল করত। নয়তো কোনো দরকারে তাঁদেরই উঠে পড়তে হত। চেয়ার চলে যেত ভূতের কবলে। মাসিরা কোনোদিন বসতেনই না ওখানে। রয়েড স্ট্রিটের বাড়িতে একটা বউ ভূতও ছিল। সে শুধু সন্ধের পরে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করত। ঘোমটা দেওয়া সেই পেত্নিকে বাড়িতে প্রায় সবাই এক আধবার দেখেছিলেন। সিঁড়ির দেওয়াল ঘেঁষে শট করে নেমে যেত। একমাত্র আমার শাশুড়িকে কখনো তাঁর বাপের বাড়িতে ভূত, পেত্নিরা দেখা দেয়নি।

যাই হোক, আমেরিকায় এসে মাসিমা ভূত দেখেছেন শুনে অবাক হলাম না। একেবারে অবিশ্বাসও করা যায় না। গল্পটা শুনতে হচ্ছে।

মাসিমা শুরু করলেন—"রাত্তিরে তো খেয়ে দেয়ে শুয়েছি। দুখানা খাট দিয়েছিল। তোমার মেসো ওদিকের খাটে শুয়ে পড়েছেন। জোর নাক ডাকছে। আমি তখনো জেগে। একটা পাগলা ওখানে ঝাঁপ দিয়েছে ক'দিন আগেই। গত বছর একটা মেয়ে আত্মহত্যা করেছে। চন্দনই সব খবর দিচ্ছিল। তা শুয়ে শুয়ে তাদের কথা ভাবছি। কত দুঃখে ওইভাবে মরতে আসে মানুষ।"

গল্পের ফাঁকে আমার মেয়ে এসে বসে গেছে। ভূতের গল্পে তার ভীষণ উৎসাহ। মাসিমা বলে যাচ্ছেন—"একসময় ঘুম এসে গেল। হঠাৎ দেখি কে যেন আমার খাটে এসে বসল। ঘরে একটা বদ গন্ধ। শরীর শিউরে উঠল। চোখ বন্ধ করে পাশ ফিরে মড়ার মতো পড়ে আছি। খারাপ আত্মা এলে এরকম পচা গন্ধ বেরোয়। মনে মনে রাম নাম জপছি। ভূতটা সারা

ঘর ঘুরছে। বেশ বুঝতে পারছি ধারে কাছে হাঁটছে। আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। ওপাশ ফিরে যে ওঁকে চিৎকার করে ডাকব সে ক্ষমতা নেই। গলা আড়ষ্ট। মনে হল ওঁর নাক ডাকা থেমে গেছে। ঘরে যে কী হচ্ছে টেরও পাচ্ছেন না। ভূতটা এবার জিনিসপত্রে হাত দিচ্ছে। খুট করে কা যেন খুলছে। আমার জপ করার ক্ষমতাও চলে যাচ্ছে। চাদরের নীচে হাত লুকিয়ে গুরুর নাম জপ করতে গিয়ে হাতের আঙুল বেঁকে যাচ্ছে। কর ছুঁতে পারছি না। ভূতেই হাত বেঁকিয়ে দিচ্ছে। সে কী অবস্থা। অনেক কষ্টে তো কর ছুঁয়ে ছুঁয়ে জপ করতে লাগলাম। গন্ধটা ফিকে হয়ে এল। বুঝলাম ভূতটা পালিয়েছে। ঘরে আবার একটু একটু ওঁর নাক ডাকার আওয়াজ পাচ্ছি। তাই শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম।"

আমরা বললাম—"বাবাঃ! এ তো সাংঘাতিক কাণ্ড! মেসোকে বলেছেন?"

মাসিমা একটু রেগে গেলেন—"বলিনি? সকালে উঠেই বলেছি। কিন্তু বিশ্বাস করলে তো? আমরা নাকি গুষ্টিবর্গ ভূতের ভয়ে কাঁপি। ছোট থেকে ভূতুড়ে গল্প শুনে শুনে যেখানে সেখানে ভূত দেখি। সমানে লেক্‌চার দিলেন ওই চন্দনটার সামনে। সেও হাসছিল। আমার গা জ্বলে গেল। তুই তো জোর করে আমাদের ভূতুড়ে হোটেলে তুললি। নায়াগ্রার আত্মহত্যার গল্প শোনালি! তারপর মেসোমশাই-এর সঙ্গে যোগ দিয়ে কী হাসি। এত সাহস বলে কিনা—"মাসিমা, মোগলাই পরোটা খেয়ে আপনার পেট গরম হয়েছিল। দুঃস্বপ্ন দেখেছেন! কথার কী ছিরি।"

মেসোমশাই বাগান থেকে ফিরে আসতেই আমরা চেপে ধরলাম। ততক্ষণে আমার স্বামীও অফিস থেকে ফিরে এসেছেন। মাসিমা আবার গল্পটা বলেছেন। হাতের কর বেঁকে যাওয়ার পূর্ণ ডেমনস্ট্রেশন দিয়েছেন। মেসো শুনেটুনে বললেন—"কী আর বলি বলো? এত খরচ করে তোমাদের মাসিকে আমেরিকা বেড়াতে নিয়ে এলুম। এখানেও ভূত দেখছে! চাটুজ্যে বাড়ি যেখানে যাবে, ভূত দেখবে। আরে বাপু! কাল মাঝরাতে তো আমারও ঘুম চটে গেস্‌ল। ভূত দেখেছি?"

আমরা জিজ্ঞেস করলাম—"কিন্তু আপনারই বা হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল কেন? কিছু ফিল্ করেছিলেন?"

মেশোর কানফাটানো জবাব—"পেটের মধ্যে যা ফিলিং হচ্ছিল, এত গ্যাস বহুদিন হয়নি। পেটটা মনে হচ্ছিল গ্যাসের কারখানা!"

আমার স্বামী বললেন—"রাত্তিরে কী খেয়েছিলেন? এত ইন্‌ডায়জেশন হল কেন?"

—"আলিবাবায় খেলুম যে। আরে ঐ ছেলেটা, চন্দনই তো নাচাল। নিজে শ্যামবাজারের ছেলে। আমি হলুম ভবানীপুরী। লুচি, পরোটার অভ্যেস। এখানে এসে সুবিধে হচ্ছিল না। তোমরাও তো দেখি ভাজাভুজির পাট রাখো না। তা নায়াগ্রায় গিয়ে চন্দন যখন বললে, মোগলাই খাওয়াবে, রাজি হয়ে গেলুম। তোমার মাসিমা আমেরিকান খাবার খাবে না। চাইনিজ খাবে না। তা যাব কোথায়? আলিবাবাতেই খাওয়া হল।"

মাসিমা ভুরু কুঁচকে বললেন—"কেন? আমি তো পিতজা খেতে রাজি ছিলুম। অত রাতে গরগরে মাছ, মাংস ইচ্ছেই করছিল না। তুমি তো পরোটা মাংসের লোভে ওখানে গিয়ে বসলে। তার সঙ্গে আবার সিঙাড়া, কাবাব, আমের লস্যি। গ্যাস, অম্বল হবে না। আমাকে

ডাকোনি কেন? গ্যাস যদি বুকে উঠে যেত। দ্যাখ, নোটো, এখন আমাকে এসব কথা ভাঙছে।"

আমরা বললাম—"সত্যি মেসোমশাই, এটা একদম ঠিক করেননি। অত কষ্ট হচ্ছিল। সেজমাসিমাকে ডাকলেন না কেন? চন্দনকেও ডাকা উচিত ছিল। বয়স হচ্ছে সেটা ভাববেন তো?"

মেসো বললেন—"ডাকতে গেছিলুম তো।"

—"কাকে? চন্দনের ঘরে ডাকতে গিয়েছিলে? অথচ আমাকে ডাকতে পারলে না?" মাসিমার গলায় প্রচ্ছন্ন অভিমান।

মেসো হাত নেড়ে বললেন—"আরে দূর। ওকে ডাকতে যাব কেন? তোমার খাটের দিকে গেসলুম। ভাবলুম জেগে আছ কিনা দেখি। নয়তো নিজেই পুদিনহরা খেয়ে নেব।"

মাসিমা বললেন—"কই। টের পাইনি তো? তখন ক'টা হবে গো? আমি তো সেরকম ঘুমোইওনি।"

—"না, না। খুব ঘুমোচ্ছিলে। ওপাশ ফিরে মড়ার মতো কী ঘুম। আমি ঘরময় ঘুরঘুর করছি। ড্রয়ার খুলে পুদিনহরা খুঁজছি। শেষে বাথরুমে গিয়ে বসলুম। তুমি জানতেই পারোনি।"

এতক্ষণে রহস্যভেদ হল। মাসিমার ভূতের গল্প শুনে এজন্যেই মেসোমশাই হাসাহাসি করেছেন। আমরাও হাসতে শুরু করেছি। সেজোমাসিমা কিন্তু রি-লেট করতে পারলেন না। শুনেছি পরে দেশে ফিরেও অনেককে নায়াগ্রার ভূতের গল্প করেছেন। সে রাতে নাকি গুরুবলে বেঁচে ছিলেন। ওঁর হাতের চেটো বেঁকিয়ে দিয়েও ভূতটা জপ করা ঠেকাতে পারেনি। শেষে বাথরুম দিয়ে পালিয়েছে। ঘরের পচা গন্ধ ফিকে হয়ে গেছে।

মাসিমারা আর দুদিন বাদে চলে যাবেন। এরই মাঝে একদিন কলকাতার সাংবাদিক চিরঞ্জীবের ফোন এল। ওঁর আসল নাম চিত্ত বিশ্বাস। আগে "আনন্দবাজারে" ছিলেন। পরে "খেলার আসর" কাগজের সম্পাদক। আমি তখন "পরিবর্তন" পত্রিকার আমেরিকার করেসপন্ডেন্ট। "খেলার আসর", "সুকন্যা", "কিশোর মন" নামে ওদের অন্য কাগজগুলোতেও লিখি। চিত্তবাবু ওই বছর লস্‌এঞ্জেলেস ওলিম্পিক্স-এর প্রস্তুতি পর্বের খবর নিতে এসেছেন। নিউইয়র্কের হোটেল লেকসিংটন থেকে ফোন করে দেখা করতে চাইলেন। তারপর আমাদের বাড়ি এলেন। মেসোর তো ভীষণ উৎসাহ। কলকাতার "খেলার আসর" নিয়মিত পড়েন। আনন্দবাজারেও চিরঞ্জীবের লেখা পড়তেন। এবার আলাপ হবে ভেবে বেশ খুশি। আসলে উনি কলকাতার রাজনীতির খবর চান। দেশ থেকে সাংবাদিক আসছেন মানেই হাতে গরম খবরটবর পাওয়া যাবে। মেসো বিকেল থেকে সেজেগুজে বসে আছেন। ভদ্রলোক এলে আমি আলাপ করাচ্ছি—"মেসোমশাই, ইনি হলেন চিত্ত বিশ্বাস। খেলার আসরের সম্পাদক।"

চিত্ত বিশ্বাস অমায়িক হাসি হেসে নমস্কার করলেন। কিন্তু মেসোমশাই তাঁকে সরু চোখে দেখছেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন—"আপনি তো মশাই সম্পাদক নন। সহ সম্পাদক। অতুল মুখুজ্জে হচ্ছেন সম্পাদক। কেমন? ঠিক বলিনি?"

আমাদের একটু লজ্জা করছিল। চিত্তবাবু কিন্তু কিছু মনে করেননি। সঙ্গে সঙ্গে হেসে বললেন—"একেবারে ঠিক কথা। আমি সম্পাদক নই। অতুলবাবু সম্পাদক। মিসেস মুখার্জি হয়তো বলতে গিয়ে খেয়াল করেননি।"

মেসোর হুংকার—"খেয়াল করা উচিত। তুমি খেলার আসরের লেখিকা। ইউ, এস. করেস্পন্ডেন্ট। এদিকে এডিটরের নাম জানো না।"

কী আর তর্ক করব? অতুল মুখার্জি যে সম্পাদক ঠিকই জানি। কিন্তু সহ-সম্পাদককেও কি ওইভাবে পরিচয় দেওয়া যায় না? যাইহোক, চিত্তবাবুর সঙ্গে মেসোমশাই-এর ভীষণ গল্প জমে গেল। খেলাধুলোর বিষয়ে মেসোর অদম্য উৎসাহ আর জ্ঞানের বহর দেখে চিত্তবাবু অবাক। পুরোনো দিনের ফুটবল প্লেয়ারদের কথা আর শেষ হয় না। চিত্তবাবু বললেন—"আপনি কি ছাত্র জীবনে ভালো খেলতেন?"

মেসো নীরব। এক মুহূর্তে পরে বললেন —"ছাত্র জীবনে মানে? রেলওয়েতে কম দিন খেলেছি? চাকরিটাই পেয়েছিলাম খেলার জন্যে?"

—"তাই বলুন। আপনার কথা শুনেই মনে হচ্ছিল স্পোর্টস্‌ম্যান ছিলেন।"

—"কাউকে তো বলি না। কত শিল্ড্ জিতেছি। সেসব কী আজকের কথা মশাই! তাও অসময়ে খেলা ছেড়ে দিতে হল। সেটাই বড় দুঃখ রয়ে গেছে।"

চিত্তবাবু জিজ্ঞেস করলেন—"কেন? খেলাধুলা বন্ধ করলেন কেন?"

মেসো নাটকীয় ভাবে একটা পা তুললেন। সবাইকে ঘুরিয়ে দেখিয়ে বললেন—"এই হাঁটুর জন্যে। স্পোর্টস ইনজুরি। একেবারে জখম করে দিয়েছিল। খেলাধুলো সব শেষ।" চিত্তবাবু সখেদে মাথা নাড়লেন।

খেতে বসে আবার সেই অতুল মুখার্জির কথা আমাকে বললেন— "অতুল মুখুজ্জে কে বলো তো?" আমি সঠিক উত্তর দিলাম। মেসো বললেন— "আরে কাগজের কথা হচ্ছে না। উনি তো তোমার শাশুড়ির আত্মীয়। ওঁদের সেই দেবেন কাকা আছেন না, তাঁর.....।" এইসব গল্পে গল্পে এত রাত হয়ে গিয়েছিল যে মেসোকে জোর করে শুতে পাঠানো হল।

মেসোমশাইরা শেষের দিকে বেহালায় থাকতেন। এর পেছনে একটি ছোট বঞ্চনার কাহিনি আছে। ওঁদের শাঁখারি পাড়ার বাড়িতে নিজের অংশ কেন মেসো জীবনসত্ত্বও পাননি। ওঁর বাবা অন্য ছেলেকে বাড়ি লিখে দিয়ে যান। সেই দাদার অবস্থা ভালো নয় বলে তিনি বাড়িটা পেলেন। মেসোকে নাকি বস্তিশুদ্ধু খানিকটা জমি দিয়েছিলেন। কিন্তু মেসো আর কোথাও বাড়িঘর করলেন না। ভবানীপুর ছেড়ে, শাঁখারি পাড়ার বাড়ির নিজের অংশ ছেড়ে যেতে তাঁর খুব দুঃখ আর অভিমান হয়েছিল। কিছুদিন নফর কুণ্ডু লেনে একটা ঘুপ্‌চি বাড়িতে থাকলেন। তারপর বেহালার একেবারে ইনটিরিয়রে একটা বাড়ির দোতলায় উঠে গেলেন। আমরা যতবার দেখা করতে যেতাম ক্রমশ ওঁর সেই ভগ্নস্বাস্থ্য আর বিষণ্ণ চেহারা দেখে মন খারাপ হত। তারই মধ্যে আমাদের নেমন্তন্ন খাওয়ানোর জন্যে অস্থির। মাঝে মাঝে বলতেন—"নিউজার্সিতেই আছ তো? ওই বাড়িতেই তো? থাকো। এক জায়গায় থাকো। শেকড় তুলে নিও না!"

আমাদের বাড়ি বদল করার কথা সেজমেসোকে বলিনি। বললেও ওঁর বোঝার ক্ষমতা ছিল না। অ্যালজাইমার হয়ে ক্রমশ ওঁর স্মৃতিশক্তি চলে যাচ্ছিল। শেষবার যখন দেখতে গেলাম

অনেক কষ্টে মাথা তুলে দেখলেন। সেজমাসিমা বললেন—"দ্যাখো কারা এসেছে! চিনতে পারছ? আমেরিকা থেকে। কারা বলতো?"

মেসোমশাই ভাঙা গলায় বললেন—"আলো, নোটো? তোমরা নিউজার্সিতে থাকো না?"

বললাম—"ওখানেই তো থাকি। এখন কলকাতায় এসেছি। আপনাকে দেখতে এলাম। কেমন আছেন মেসোমশাই?"

কোনো উত্তর দিলেন না। আমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন। হঠাৎ বললেন— "ববি কোথায়?"

সেজমাসিমা বললেন—"দ্যাখো! তোমার মেয়ের কথা জিজ্ঞেস করছেন। এরকম হঠাৎ হঠাৎ অনেকের খোঁজ করেন আবার ভুলে যান। মানুষটার কী যে হল।"

ওই দুঃখের পরিবেশে একটা কথা বড় মনে লেগেছিল। চলে আসছি যখন, মেসোমশাই আমার স্বামীর হাতটা ধরে বললেন—"গাড়ি এনেছো? আমাকে ভবানীপুরে নামিয়ে দেবে? বাড়ি যাব।"

এত বছর পরে মেসোমশাই যখন বেঁচে নেই, দুটো ছবি দেখে অনেক কথা মনে পড়ল। ব্যাক্তিগত কী পারিবারিক ঘটনা নিয়ে বেশি তো লিখি না। এবারই অন্যরকম। শাঁখারিপাড়ার হারানো ঠিকানার গল্প।

দেখা

বেশ আছি আমি। রোদ-বৃষ্টি-আলো আঁধারের বৃত্তে ফিরে ফিরে আসা দিন-ক্ষণ সময়ের অনেকটাই শুধু নিজের সঙ্গে কেটে যায়। নির্জনতা ভালো লাগে। নৈঃশব্দ্য উপলব্ধি করি।

অজস্র গাছপালার আড়ালে টিলার মাথায় এই বিশাল ভিক্টোরিয়ান বাড়িটায় বছর খানেক হল এসেছি। নতুন শহরে ট্রান্সফার হয়ে এসে কল্যাণ আর আমি যতগুলো বাড়ি দেখেছিলাম, তারমধ্যে এই সাদা পুরোনো বাড়িটাই বেশি পছন্দ হয়েছিল। হাইস্কুলও দূরে নয়। দিয়ার তখন স্কুল শেষ হতে এক বছর বাকি। আমাদের ছেলে অভীক পড়ে বোস্টনে। ওরা কেউ তো সারা বছর এখানে থাকবে না। কলেজের ছুটিছাটায় আসবে। হয়তো সেই জন্যেই আমরা যে একটু বনবাদাড়ে বাড়ি কিনছি, তা নিয়ে আপত্তি করল না। এ বছর দিয়া ব্রাউন ইউনিভার্সিটিতে চলে গেল। সেও মাত্র দেড় ঘণ্টার পথ। সেদিক থেকে ওদের কাছাকাছিই আছি।

ভালোই লাগছে এখানে। সময় কাটানোর জন্যে মাঝে-মাঝে লাইব্রেরিতে যাই। দোকান বাজার করি। কিন্তু বাড়িটা যেন টানতে থাকে। কী জানি? বোধহয় ঘরকুনো হয়ে পড়ছি। অপরিচিত শহরে একা-একা বেশিক্ষণ ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করে না।

অথচ বাড়িতেও তো সেই একাই। তবু ফিরে আসতে ভালো লাগে। কী এক আশ্চর্য আকর্ষণ ক্রমশ যেন এই ইট, কাঠ, পাথরের মায়ায় আমাকে বেঁধে ফেলতে চাইছে। এরই নাম বোধহয় বিষয় বন্ধন। কী অদ্ভুত ব্যাপার! এত বছর আমেরিকায় আছি, ঠিক এরকম অনুভূতি কখনও হয়নি।

এ বাড়িটায় কী যেন আছে। এই যে সারাদিন একা-একা থাকি, হঠাৎ মনে হয় আরও কেউ কাছাকাছি আছে। গভীর রাতে স্বপ্নের মতো সে আসে। আধো ঘুমে আধো জাগরণে তার অস্তিত্ব অনুভব করি। একবার নয়। এমন মাঝে মাঝেই হয়। একদিন লাইব্রেরি থেকে ফিরছি। অঝোরে বৃষ্টি নেমেছে। দিনের শেষে ছায়াঘন অন্ধকারে চতুর্দিক আচ্ছন্ন। গাড়ি নিয়ে ড্রাইভ-ওয়েতে ওঠার সময় হেডলাইটের আলোতে দেখলাম গ্যারেজের পাশে অস্পষ্ট ছায়ার মতো এক শরীর। চমকে উঠে ব্রেক-এ পা রেখেছি। পর মুহূর্তে কেউ নেই। চোখের ভুল হবে হয়তো। তবু একটু অপেক্ষা করে গ্যারাজে গাড়ি তুললাম।

সেদিনের ব্যাপারটা কল্যাণকে বলা হয়নি। কিন্তু পরের ঘটনাটায় আমি কেমন ভয় পেয়ে গেলাম। ঠিক ভয় নয়, বিস্ময় আর অস্বস্তি মেলানো এক বিচিত্র অনুভূতি। এ বাড়িতে এসে পর্যন্ত একটা বছর শুধু ব্যস্ততায় কেটেছে। বাড়ি রং করানো, নতুন ফার্নিচার কেনা, গোছগাছ, তারই মধ্যে দিয়ার হাইস্কুল গ্র্যাজুয়েশন, কলেজ অ্যাডমিশনের ব্যবস্থা করা। প্রায় ঝড়ের মতো দিন কেটেছে। সব মিটে যাবার পর এই এতদিনে বেশ নির্ঝঞ্ঝাট লাগছে। বাড়িটা ভোগ করতে শুরু করেছি। আর এখনই এমন কিছু ঘটছে, যাকে ঠিক মনের ভুল বলে উড়িয়ে দিতে পারছি

না। অথচ ভয়ও তো করছে না। আমি কি রাতারাতি সাহসী হয়ে উঠছি? নয়তো সেদিন ওভাবে বেরিয়ে পড়েছিলাম কেন?

কয়েক সপ্তাহ আগেরই তো ঘটনা। কল্যাণ অফিসের কাজে স্কটল্যান্ডে গেল। বইটই পড়ে সময় কাটাচ্ছি। ক্লিনিং লেডি স্যালি এসে সারা দুপুর ধরে বাড়ি পরিষ্কার করে গেল। সাউথ আমেরিকান এই মহিলা তেমন ইংরেজি জানে না বলে নীরবেই কাজকর্ম সারে। স্যালি চলে যাওয়ার পর বইটই নিয়ে পেছনের কাচ-ঘেরা বারান্দায় গিয়ে বসেছিলাম। বিকেল হয়ে আসছে। জানলা দিয়ে লালচে আলো এসে পড়েছে। কাঠের মেঝেতে শেষবেলার রোদের আলপনা।

হঠাৎ মনে হল বাগানে ঝরা পাতার স্তূপ মাড়িয়ে কেউ আসছে। অনেক দূর থেকে ফার্ন আর বুনো লতাপাতায় ঢাকা ভিজে সুঁড়িপথ পার হয়ে পায়ের শব্দ কাছাকাছি এল।

বই থেকে চোখ তুলে চেয়ে আছি। কেউ কোথাও নেই। তবে কি হরিণ এসেছে? দেবদারু বনের আড়ালে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে? আমার সাড়া পেলেই নিমেষে বিদ্যুৎগতিতে হারিয়ে যাবে?

কী মনে হল, দরজা খুলে বাগানে নেমে গেলাম। যদি সত্যি হরিণ হয়, এখনই ডালপালা নড়ে উঠবে। শুকনো পাতায় তার ছুটে যাওয়ার শরশর শব্দ শোনা যাবে। সুঁড়ি পথ ধরে, ছোট্ট কাঠের সাঁকো পার হয়ে নীচে ঝিলের দিকে মিলিয়ে যাওয়ার আগে হয়তো একঝলক তার দেখা পাব। এই টিলার ওপর থেকে বহুদূর অবধি দেখা যায়।

কিন্তু কোথায় হরিণ? গাছের আড়ালে সে নেই। পাতার ঝোপে কোনো শব্দ উঠল না। ফার্নের ভেজা পথ দিয়ে ছোট্ট সাঁকোর ওপর গিয়ে দাঁড়ালাম। নীচে তিরতির করে নালা বইছে। নাঃ ধারেকাছে কারও চিহ্ন নেই। এপথ দিয়ে মানুষজন আসে না। অনেকখানি উঁচু জমির ওপর এই বাড়ি। এতদূর খাড়াই ভেঙে ঝোপ জঙ্গলের দিক থেকে কে আসবে?

শব্দ-রহস্য ভেদ করতে না পেরে যখন বাড়ি ফিরে আসছি, শুনলাম কিচেনে ফোন বাজছে।

দিয়ার ফোন। ধরতে দেরি হল দেখে আনসারিং মেশিনে মেসেজে রেখে দিচ্ছিল। ছুটে গিয়ে ফোনটা ধরলাম। দিয়া জিজ্ঞেস করল—"এতক্ষণ রিং হচ্ছিল। বাথরুমে ছিলে?"

—"না রে। ব্যাক-ইয়ার্ডে ছিলাম। সময় কাটছে না তো। তুই কি উইক-এন্ডে আসবি?"

দিয়া কী ভেবে বলল—"দেখি। ড্যাড ফিরছে কবে?"

—"নেক্সট উইকের মাঝামাঝি। বোধহয় বুধবার।"

—"তুমি ড্যাডের সঙ্গে গেলে পারতে। এডিনবার্গে তোমার কে কাজিন আছে না?"

—"নাঃ, প্লেন ভাড়া দিয়ে এক জায়গায় কতবার যাব? তারচেয়ে বাড়িতে বেটার আছি। রিল্যাক্স করছি। তুই ফ্রাই-ডে তে চলে আয় না।"

শুক্রবারে ক্লাস শেষ করে দিয়ার আসতে বেশ রাত হল। ডিনারের পরে দুজনে নীচে বসে টিভি দেখছিলাম। অভীক ফোন করল। বাবা এখানে নেই। মা একা আছে বলে খোঁজ নিচ্ছে। দিয়া এসেছে জানত না। দু-চার কথার পরে আমাকে 'টেক কেয়ার' বলে ফোন রেখে দিল।

শুতে যাবো যাবো করছি। হঠাৎ দোতলায় কাচ ভাঙার মতো ঝনঝন আওয়াজ হল। দিয়া সোফা থেকে লাফ দিয়ে উঠেছে—"কী হল মা? কী পড়ে গেল? অ্যাটিকে র‍্যাকুন ঢোকেনি তো?"

দুজনে তাড়াতাড়ি ওপরে গেলাম। বাইরে প্রচণ্ড হাওয়া। বাথরুমে একটা জানলারও কাচ নামানো নেই। ঝোড়ো হাওয়ায় সিল্ক ফ্লাওয়ার সুদ্ধ পোর্সেলিনের ফুলদানিটা মেঝেতে আছড়ে পড়েছে। বাথটবের ভেতরে, বাইরে ফুলপাতা আর পোর্সেলিনের টুকরো ছড়ানো।

দিয়াই সব পরিষ্কার করল। শুতে যাবার আগে আমার ঘরে বিছানায় এসে বসেছিল। ঘরের চারদিকে দেওয়ালের ছবি, ঠাকুরের আসন দেখতে দেখতে বলল—"হঠাৎ এত বড় বাড়িটা কেন কিনলে মা? আগে তো বলতে বেশি বড় বাড়ি কিনব না। মেইনটেন করা যায় না...।"

—"তখন তাই মনে হত। আসলে ওসব দিকে বাড়ির দামও তো অনেক বেশি ছিল। এখানে প্রপার্টি ভ্যালু কত বাড়বে জানি না। কিন্তু দামও কম। সে জন্যেই কিনে ফেললাম। কেন? তোরাও তো দেখে ভালো বললি।"

—"ইয়া। আই লাইক দিস হাউস। কিন্তু এখনও ঠিক নিজেদের বাড়ি বলে মনে হয় না। ওয়েস্ট ফিলডের বাড়িটাকে খুব মিস করি মা।"

একথা-সেকথায় পর দিয়া শুতে চলে গেল। ওয়েস্ট ফিলডের বাড়িটার কথা আমারও মনে হয়। কুড়ি বছর ওখানে ছিলাম। অভীক, দিয়া ওখানেই বড় হয়েছে। কল্যাণ ট্রান্সফার না হলে নিউ জার্সি ছেড়ে আসতাম না। পুরোনো প্রতিবেশী, বাঙালি বন্ধুবান্ধব কারুর সঙ্গেই আর যোগাযোগ রইল না।

রবিবার বিকেলে দিয়া কলেজে চলে গেল। কল্যাণ ফিরল বুধবারে। সেই রাতেই ওকে বাগানের ঘটনাটা বললাম। ড্রাইভ-ওয়েতে দেখা আবছা ছায়ামূর্তির কথাও বললাম। কল্যাণ বিছানায় শুয়ে পা নাচাতে নাচাতে বলল—"তাহলে কী করবে? ফেংশুই না বাস্তু? আজকাল রিয়েল্‌টররাও নাকি এসব সাজেস্ট করছে? ভুতুড়ে বাড়িতে দুটোই লাগিয়ে দাও...।"

কল্যাণ হাসছে দেখে সেদিন আর কথা বাড়ালাম না। নিজেকে ভিতু প্রমাণ করতে চাই না। আর ওই বাস্তুশাস্ত্র-টাস্ত্র কী ব্যাপার জানিও না। গতবার কলকাতায় গিয়ে দেখলাম লোকেরা এসব নিয়ে খুব মাথা ঘামাচ্ছে। আমার বউদি দু'ঘরে দুটো উইন্ড চাইম দুলিয়ে দিয়েছে। আমাদের তিন পুরুষের বাপের বাড়িটা নাকি বাঁকা জমির ওপর তৈরি। বাস্তুশাস্ত্র অনুযায়ী পজিশন সুবিধের নয়। বউদি বোঝাল—ওই জন্যেই নাকি এ বাড়িতে টাকা থাকে না। এক দরজা দিয়ে আসে। অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। তাই অনেক খরচ করে বউদি ওই চীনে ঘণ্টা দুটো কিনেছে। ফলাফল অবশ্য এখনও বোঝা যাচ্ছে না। এই তো সেদিন মার হার্ট ভালভ সার্জারির জন্যে ঝপ করে ওদের লাখখানেক বেরিয়ে গেল। ঠুনঠুন ঘণ্টা কিচ্ছু করতে পারেনি। বউদির কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস এবার কাজ হবে।

আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাস কিছুই নেই। অন্তত এ বাড়িতে কিছু টাঙাতে যাবো না। এটা ঠিক যে প্রথম বয়সে খুব ভূতের ভয় ছিল। বিয়ে হল এমন বাড়িতে, যার দু'পাশে দুটো ভুতুড়ে বাড়ি। একটায় সেই কুখ্যাত রোশনলাল মার্ডার কেস হয়েছিল। শংকরের 'কত অজানারে' বইতে যখন গল্পটা পড়েছিলাম, তখন কি জানি ওই খুনে সার্জেন যে বাড়িতে তার শালী আর শাশুড়িকে কুচি কুচি করে কেটেছিল, তার পাশেই আমার শ্বশুরবাড়ি হবে? শোবার ঘরের জানলা দিয়ে তিনতলায় সেই মড়াকাটা ঘরটাও সারাক্ষণ দেখা যাবে? তখন কল্যাণ আর ওর ভাইরা আমাকে আরও বেশি করে ভয় দেখাত। এক তো রোশনলালের শালী আর শাশুড়ির জোড়া পেত্‌নির আতঙ্ক, তার ওপর ডানপাশের বাড়িটার হিসট্রিও কিছু কম নয়। তাদের

ছোটবউ কোনকালে আত্মহত্যা করেছিল। কিন্তু তাদের বড়মেয়ে বাপের বাড়িতে এসে যা করেছিলেন সে খবর কাগজেও বেরিয়ে গিয়েছিল। হাসপাতালে অসুস্থ স্বামী মারা গেছেন শুনে, নিজে বিষ খেলেন। দুটো ছোট মেয়েকে বিষ খাইয়ে মারলেন। ওই বাড়ি থেকে চারখানা ডেডবডি শ্মশানে যাচ্ছে, এ তো কল্যাণদের স্পষ্ট মনে আছে।

ডানে, বাঁয়ে ভূত-বাংলো নিয়ে বড্ড ভয় পেতাম। সন্ধেবেলায় ছাদে ঠাকুরঘরে যেতে হলে গা-ছমছম করত। তখন শাশুড়ি একটা কথা বলতেন। যে বাড়িতে ভগবান আছেন, সেখানে ভূত থাকে না। কথাটা আমাকে সাহস জোগাত। তারপর দেশ-বিদেশে ঘুরতে ঘুরতে, বহুবার একা থাকতে থাকতে ভূতের ভয় কোথায় চলে গেল। এখন তো কিছু মনেই হয় না। এ বাড়িতে আসার পর একটু অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে ঠিকই। তা বলে ভয় পাবো কেন?

দিন কেটে যাচ্ছে। আর ক'দিন পরেই ক্রিসমাস। এবছর সময়ের আগেই শীত এসে গেল। বাগানে সারাদিন পাতা পড়ছে। গাছে গাছে ঝোড়ো হাওয়ার উদ্দাম মাতামাতি। কখনও ঝিরঝিরে বৃষ্টি নামে। দূরের ঢালু জমি, পথঘাট, ঝিল কুয়াশায় ঢেকে যায়। এইসব দিনে খুব একা লাগে। ওয়েস্ট ফিলডের কথা মনে হয়। ওখানে এখন দল বেঁধে ক্রিসমাস শপিং, অফিসের পার্টি, ক্লাবের পার্টি, নিউ-ইয়ার্স ইভ্-এর গেট-টুগেদার। অভীক, দিয়া যখন ছোট, তখন থেকে আমরা কয়েকটা ফ্যামিলি মিলে ক্রিসমাসের আগের দিন নিউইয়র্কে যেতাম। সেন্ট প্যাট্রিক ক্যাথিড্রালে মিড-নাইট ম্যাসের পর বাড়ি ফিরতাম। গতবছর থেকে সব বন্ধ। নতুন জায়গায় চেনাশোনা হতে সময় লাগে। হলেও আগের মতো বন্ধুত্ব কি আর হবে? এবারের ক্রিসমাসে তাই নিউ জার্সি থেকে অরুণদা, দীপংকর আর মৃণালদের সবাইকে ডেকেছি। অভীক, দিয়ার দু-তিনটে বন্ধুও এসে থাকবে। এবারের ক্রিসমাস আর গতবারের মতো একা-একা কাটাব না। বাড়িটাও তো কেউ দেখেনি। এসে দু'দিন থাকলে ওদের ভালোই লাগবে।

বাড়িঘর সাজাচ্ছি। রান্নাবান্না এগিয়ে রাখছি। দু'দিন হল অভীক এসেছে। দিয়া এল গতকাল। এসেই হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে গেছে। বাজার থেকে ক্রিসমাস ট্রি কিনে এনেছে। ভেবেছিলাম এবছর পুরনো প্ল্যাস্টিকের ক্রিসমাস ট্রিটা দিয়ে চালিয়ে দেবো। দিয়া বলল—"কিছুতেই না। প্ল্যাস্টিকের গাছটা এবার ফেলে দাও। গতবার কেন যে কিনেছিলে জানি না।"

—"কিনতে যাবো কেন? এ বাড়ির গ্যারাজে একটা বাক্সে পড়ে ছিল। ওটাই বসিয়ে দিয়েছিলাম।"

কল্যাণ খবরের কাগজের পাতা উলটে মন্তব্য করল—"তোর মা এ বাড়িতে খালি অ্যান্টিক্ খুঁজে বেড়াচ্ছে। গ্যারাজ থেকে শিশি, বোতল, ভাঙা চেয়ার, যা পাচ্ছে তুলে আনছে।"

ওরা হাসছিল। দিয়া ক্রিসমাস ট্রি সাজাতে গিয়ে জিজ্ঞেস করল—"ট্রিমিং আর অর্নামেন্টস- এর বক্সগুলো কোথায় মা? তাড়াতাড়ি দাও। আমাকে আবার গিফ্‌ট কিনতে বেরতে হবে।"

অভীককে তিনতলার অ্যাটিকের ঘরে পাঠালাম। ওখানেই বাক্সগুলো রাখা আছে। ক্রিসমাস ট্রি সাজানোর জন্যে কত বছর ধরে প্ল্যাস্টিক, কাঠের আর কাচের অর্নামেন্টস জড়ো করেছি। গতবছর কিছুই সাজানো হয়নি। এবার লোকজন আসছে। দিয়ার তাই খুব উৎসাহ।

কিন্তু অভীক সেই যে কাঠের ঝুলন্ত সিঁড়ি বেয়ে অ্যাটিকে ঢুকেছে, আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। দুটো বাক্স নামাতে এত সময় নিচ্ছে কেন? নাকি খুঁজেই পাচ্ছে না? দিয়া তাড়া

লাগাচ্ছে। শেষে কল্যাণ ওপরে গেল। অ্যাটিকের ভেতর আলো জ্বলছে। খুটখাট শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কল্যাণ চেঁচিয়ে বলল—"অভি। বক্স দুটো পেয়েছিস? দ্যাখ তো, সামনের দিকেই কোথাও আছে বোধহয়।"

অভীক কী উত্তর দিল নীচ থেকে শুনতে পেলাম না। একটু পরে অ্যাটিকের কাঠের মেঝেতে ধুপধাপ আওয়াজ করে বাক্স নিয়ে নেমে এল।

ওর কপালে, মাথায় ঝুল লেগে আছে। শার্ট থেকে মাকড়শার জালের মতো কিছু সরিয়ে দিতে দিতে বলল—"স্ট্রেঞ্জ! দে লেফ্‌ট সো মেনি থিংগ্‌স্! বুকস, ফ্যামিলি পিক্‌চার্স...."

কল্যাণ বলল—"বাড়িটা অনেক বছর ভাড়া দিয়ে রেখেছিল। জিনিসগুলো ওনারের, না যারা রেন্ট করেছিল তাদের কে জানে? মোটকথা সব আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গেছে। আগে দেখলে ডিসপোস করে দিতে বলতাম।"

জিজ্ঞেস করলাম—"আর কী আছে রে? শুধু বই?"

রহস্যের হাসি হেসে অভীক উত্তর দিল—"শুধু বই নয় মা। বাঙালির বই। বাঙালির ফ্যামিলি পিক্‌চার।"

দিয়া বলল—"অভি! গল্প বানিও না। মা কিন্তু বিশ্বাস করে ফেলছে।"

—"বিলিভ মি, আ অ্যাম নট মেকিং আপ আ স্টোরি! ইউ ওয়ান্ট টু সি দোজ বুকস?"

অভীক রসিকতা করছে বলে মনে হচ্ছে না। ও বেশ সিরিয়াস ধরনের ছেলে। হঠাৎ বানিয়ে বানিয়ে এসব বলবে কেন?

দিয়া মাথা নাড়ল—"আমি ওই ধুলোর মধ্যে যাচ্ছি না। তুমি গিয়ে বইগুলো নিয়ে এসো।"

—"অলরেডি নিয়ে এসেছি। ওপরে স্টাডি রুমে রেখেছি। দেখতে চাও দ্যাখো।"

আমার কৌতূহল সবচেয়ে বেশি। আমেরিকানদের কাছ থেকে বাড়ি কিনেছি। যারা ভাড়া ছিল, তারাও আমেরিকান। এ বাড়ির ছাদের ঘরে বাংলা বই পড়ে আছে? কী করে সম্ভব?

স্টাডিতে গিয়ে দেখি কার্পেটের ওপর ধুলোমাখা বইগুলো পড়ে আছে। মলাট ছেঁড়া 'গীতাঞ্জলি'। পাতায় পাতায় জলের দাগ ধরা 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'। একটা পুরোনো শারদীয়া আর কয়েকটা 'নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিন'-এর বহু পুরোনো ইস্যু। বাংলা বইগুলো উলটে পালটে কোথাও কারও নাম দেখতে পেলাম না। প্রথম দিকের পাতাগুলো ছিঁড়ে গেছে বলেই বোধহয় নামধামও নেই।

কিন্তু 'নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ্ মেডিসিন'-এর মলাটে অস্পষ্ট হলেও গ্রাহকের নামটা পড়া যাচ্ছে। টাইপ সেটে লেখা আছে বিমান রে এম. ডি। নীচে আমাদের এই বাড়ির ঠিকানা। ভলিউমটার তারিখ দেখলাম ফেব্রুয়ারি আট উনিশশো সত্তর।

আমি যতই অবাক হই, দিয়ারা আর তেমন মাথা ঘামাল না। দিয়া ঝটপট ক্রিসমাস ট্রি সাজাতে লাগল। কল্যাণের পর পর কয়েকটা ফোন এল। ও দীপংকর আর মৃণালদের এ বাড়িতে আসার ডিরেকশন দিচ্ছিল। শুধু কম্পিউটারে বসার আগে অভীক ভুরু কুঁচকে বলল—"দ্যাট প্রুভ্‌স্ উই আ দ্য থার্ড ওনার অফ দিস হাউস। ফার্স্ট টাইম কোনো বাঙালি ডাক্তার বাড়িটা কিনেছিল।"

কল্যাণ ফোন রেখে বলল—"সেটাই অবাক লাগছে। পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে এসব দিকে ক'জনই বা ইন্ডিয়ান ছিল? কিন্তু বাঙালিই যে, সেটা সিওর হলি কী করে?"

আমি বললাম—"বিমান নাম নন্-বেঙ্গলিদের হয় না। এই ছবিটা দ্যাখো।"

ছেঁড়া ম্যাগাজিনের ভেতর থেকে পাওয়া ময়লা খাম খুলে ছবি দুটো কল্যাণকে দেখালাম। সমুদ্রের ধারে একজন লোক তার বউ আর দুটো বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে দাঁড়িয়ে। সকলেই সুইমিং কসটিউম পরা। সমুদ্রের হাওয়ায় চুল উড়ছে। লোকটির চেহারা দেখে বাঙালি মনে হয়। বউয়ের মুখ তো পুরো বাঙালি। নিজের জাতের লোক চিনব না?

কল্যাণও ছবি দেখে কথাটা মেনে নিল। দ্বিতীয় ছবিটায় লোকটি নেই। তার বউ ঝলমলে শাড়ি গয়না পরে ছেলেদের নিয়ে বসে আছে। বোধহয় কোনো ফাংশনে তোলা।

ধুলো ঝেড়ে বই আর ছবি দুটো প্ল্যাস্টিকের ব্যাগে ভরে গ্যারাজে রেখে এলাম। পরে ফেলে দেবো। এমনিতেই স্টাডিরুমের তাকে বইপত্র আর আঁটছে না। নোনা ধরা ছেঁড়া বই কোথায় রাখব!

ক্রিসমাসের আগের দিন নিউ জার্সি থেকে অরুণদা, কাজরীদি, দীপংকর, সুজয়া, মৃণাল, স্বপ্নারা ছেলে মেয়েদের নিয়ে এসে পৌঁছলো। পরদিন দুপুরে প্রভিডেন্স থেকে শুভ আর চান্দ্রেয়ী। অভীকের কলেজের বন্ধু স্টিভ তার গার্ল ফ্রেন্ডকে নিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে ঘুরে গেল। দিয়ার বন্ধু মেলিসা, ডনা আর সঙ্গীত বিকেলে এসে গিফ্‌ট দিয়ে গেছে। সারাদিন ডোর-বেল্-এর টুংটাং শব্দ। বাইরে গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ। হোয়াইট ক্রিসমাস হলে দিয়া এখনও ছোটবেলার মতো খুশি হয়। ওরা দল বেঁধে ফায়ার প্লেসের কাছে বসে গল্প করছে।

অনেকদিন পরে এ বাড়ির ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। কোথাও অন্ধকার নেই। মোমবাতির সুগন্ধ, খাবারের গন্ধ। পুরোনো রেকর্ডে 'সায়লেন্ট নাইট হোলি নাইট' শুনতে শুনতে ডিনার টেবল সাজাচ্ছি। মনের মধ্যে আপাত পূর্ণতাবোধের মতো অনুভূতি। এই যে একটা বছর ভালোয় ভালোয় শেষ হয়ে এল। কাছের মানুষ দূরের মানুষ সবাইকে নিয়ে আজ ছোট্ট আয়োজন করেছি। ঘরে ঘরে হাসি, গল্প। জীবনের অনেক অপূর্ণতা, শত অনিশ্চয়তার মাঝেও এইসব মুহূর্তে সেই অদৃশ্য নিয়ন্ত্রকের কাছে মাথা নত হয়ে আসে।

হঠাৎ পেছনে ভয়ার্ত চাপা স্বর—"মা, আ হ্যাভ সিন সামথিং...." দিয়ার চোখমুখ ভয়ে বিবর্ণ।

—"কোথায়? কী দেখেছিস? বাইরে গিয়েছিলি?"

জিজ্ঞেস করেই খেয়াল হল স্যালি জলের জাগ নিয়ে ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়িয়েছে। আজ ওকে রান্নাঘরে সাহায্য করতে ডেকেছি। দিয়ার মুখ দেখে ঠিক বুঝেছে কিছু একটা ঘটেছে। স্যালির সামনে কথা বলব না বলে দিয়াকে চট করে লন্ড্রি রুমে নিয়ে গেলাম। বাড়ি ভর্তি লোক। দিয়া যা-ই দেখে থাক, অন্যদের জানতে দিতে চাই না। আসলে বুঝতে পারছিলাম দিয়া এমন কিছু বলবে, যা শুধু আমাদের মধ্যে থাকা দরকার।

দিয়া তখনও উত্তেজিত। লন্ড্রি রুমের দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—"কী হয়েছে? এত ভয় পেলি কেন?"

—"মা। তোমাকে আগে বলিনি। ইট হ্যাপন্‌ড টোয়াইস! আ হ্যাভ সিন দ্য সেম উওম্যান...।"

এই প্রথম আমার ভয় হল। এতদিন যা অস্বীকার করতে চেয়েছি, আর বোধহয় সেই

সাহসটুকু থাকবে না। দিয়া ফিস ফিস করে বলে যাচ্ছে—"গিফট র‍্যাপগুলো ফেলব বলে গ্যারাজে গেলাম। লাইট জ্বালিনি। বেসমেন্টের দরজা থেকে একটু আলো আসছিল। হঠাৎ মনে হল একটা অন্য গাড়ি। তার স্টিয়ারিং হুইলে মাথা রেখে কে বসে আছে। চমকে গেছি। ওটা কার গাড়ি? কে ওভাবে বন্ধ গ্যারেজে গাড়িতে বসে আছে? পাশ থেকে তার মুখটাও যেন দেখতে পেলাম। অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না। স্ট্রেঞ্জ! নেকস্ট্ মোমেন্টে কেউ নেই! ওখানে শুধু তোমার গাড়িটা রয়েছে।'

—"শুধু শুধু ভয় পাস না দিয়া। কী দেখতে কী দেখেছিস।"

দিয়া মাথা নাড়ল—"আই ডোন্ট নো। হয়তো হ্যালিউসিনেশন। কিন্তু দু'বারই ভুল দেখলাম?"

—"দু'বার কী দেখেছিস? কাকে দেখেছিস তুই?"

—"একজন মেয়েকে। সেদিন তোমরা বোস্টনে গিয়েছিলে। আমি বাড়িতে ছিলাম। অনেক রাত পর্যন্ত টিভি দেখে ওপরে শুতে যাচ্ছি, হঠাৎ দেখলাম তোমাদের বেডরুমের পাশে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। নেক্সট্ মোমেন্টেই দেখতে পেলাম না। ঠিক আজকের মতো।"

শুনে আমার গা শিউরে উঠল। লন্ড্রি রুমের দরজায় ঠুক ঠুক শব্দ। খুলে দেখি কাজরীদি আর স্বপ্না। অপ্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে বললাম—"সরি। একটা জিনিস নিতে এসে এখানেই আটকে গেছি। চলো, এবার ডিনার দিয়ে দিই।"

ক্রিসমাসের রাতটাই কেমন বদলে গেল। ডিনার টেবিলে সবাই গল্পগুজব করছে। রান্নার প্রশংসা করছে। শুধু আমি আর দিয়া ঠিক স্বস্তি পাচ্ছি না। মাথায় সেই এক চিন্তা। একেই বোধহয় ভূতের চিন্তা বলে। অরুণদা, মৃণালরা যখন বলছে এবার সামারে ওরা নিউ জার্সি থেকে বিরাট দল নিয়ে আসবে, কল্যাণ খুশি হয়ে বলল—"চলে এসো। বনবাসে একটা পিক্‌নিক্ লাগিয়ে দাও।"

আমি জোর করে হেসে সায় দিলাম—"বনবাসই বটে। শুধু ভাল্লুক আসাটা বাকি আছে।"

হঠাৎ চান্দ্রেয়ী বলে উঠল—"আমি কিন্তু এত নির্জনে একা বাড়িতে থাকতে পারব না। বাসবীদির সাহস আছে!"

অরুণদা হেসে উঠলেন—"ওঃ তুমি তো চোর, ভূত, বেড়াল কাকে না ভয় পাও। তা, এ বাড়িটা কী মনে হচ্ছে? হন্টেড হাউস?"

দেখলাম দিয়া খাওয়া থামিয়ে বসে আছে। আমার দিকে একঝলক তাকাল। ছোট থেকে ওর ভয় বলে কোনো জিনিস ছিল না। অথচ আজ চোখেমুখে যে আতঙ্কের ছায়া দেখেছি, ব্যাপারটা আমায় ভাবিয়ে তুলেছে। কিন্তু আজ কল্যাণ আর অভীককে কোনো কথা বলা যাবে না। এত শখ করে বাড়ি কিনেছি। বাইরের লোকজনকে কিছু জানাতে চাই না। তার আগে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে হবে। দিয়া যদি এরকম ভয় পেতে শুরু করে, এখানে থাকব কী করে? সেটা সম্ভব নয়। দরকার হলে বাড়ি বিক্রি করে দেবো। শুধু দিয়া নয়। আমিও তো একদিন বৃষ্টির মধ্যে ড্রাইভওয়েতে অস্পষ্ট ছায়া-শরীর দেখেছিলাম। বাগানে, দূরের ফুট-ব্রিজে পায়ের শব্দ শুনেছিলাম। সেদিনও বা হঠাৎ দোতলায় ফুলদানিটা আছড়ে পড়ে ভাঙল কেন? কেন এরকম ঘটছে?

পরদিন বাড়ি খালি হয়ে যেতে কল্যাণ আর অভীককে দিয়া গতরাতের ঘটনাটা বলল। যা

হয়—ওরা বিশ্বাসই করছে না। অভীক চোখ ঘোরাল করে দিয়াকে জিজ্ঞেস করল—"আর ইউ টেকিং এনি মেডিকেশন?"

দিয়া মাথা নাড়ল দেখে ভুরু কুঁচকে বলল—"এক্স্যাম্ আর টার্ম পেপারের জন্যে খুব রাত জেগেছ? তাতেও হ্যালুসিনেটিং এফেকট হতে পারে।"

দিয়া বিরক্ত হল—'ডোন্ট টক ননসেন্স! বলছি না, এরকম দু'দিন হল। আগে কখনও ভয় পেয়েছি? নিজেদের বাড়িটাকে নিয়ে স্টোরি তৈরি করব কেন? মাকে জিজ্ঞেস করো। মারও তো আনক্যানি ফিলিং হয় মাঝে মাঝে।"

কল্যাণ বলল—"ঠিক আছে। তোমাদের তার মানে এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না। দিয়া তো তিন-উইক বাদে কলেজে ফিরে যাবে। তুমিই সারাদিন একা থাকো। এত ভয় পেলে তো খুব মুশকিল।"

—"দেখি, বাড়িতে একটা পুজো-টুজোর ব্যবস্থা করি। এসে পর্যন্ত তো সময় পাইনি। করা উচিত ছিল।"

জানুয়ারির মাঝামাঝি ছেলেমেয়েরা কলেজে ফিরে গেল। বাড়িতে পুজো করাব ভেবে চল্লিশ মাইল দূরে হিন্দু টেম্পলে ফোন করলাম। শুনলাম ওদের যে পুরোহিত লোকের বাড়ি পুজো করেন, তিনি ইন্ডিয়া গেছেন। মাসখানেক বাদে যেন খোঁজ নিই। তারপর পুজোর ডেট পাওয়া যাবে।

সেই ভালো। ততদিনে ঠান্ডাও হয়তো কমে আসবে। পুজো মানে বাড়িতে কয়েকজন লোকও তো ডাকব। ওয়েদার ভালো থাকলে অভীক দিয়াও যদি আসতে পারে। মাস দেড়-দুই বাদেই না হয় পুজো করব।

দু'দিন ধরে সমানে বরফ পড়ছে। রোদের দেখা নেই। শেষবেলার বিষণ্ণ আলোয় দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে থাকি। সামনের পথঘাট, পেছনের ঢালু জমি সাদা হয়ে আছে। সারি দেওয়া বার্চ, এভারগ্রিনের সবুজ পাতায় বরফের সূক্ষ্ম কারুকাজ। দূরে ঝিলের জল জমাট বেঁধে আছে। বিকেলের পর একটা পাখিরও সাড়া পাই না। এই নিঃসঙ্গ মুহূর্তে দিয়ার কথা মনে হয়। মেয়েটা এবার মন খারাপ নিয়ে ফিরে গেল। ওর ধারণা বাবা ওর কথা বিশ্বাস করছে না। উনিশ বছরের মেয়ের ভয় দেখে বিরক্ত হচ্ছে। অভীকও তো সমানে রাগাচ্ছিল দিয়াকে।

হঠাৎ মনে হল ঘরে কেউ আছে। জানলার দিক থেকে ঘুরে দেখি অস্পষ্ট ছায়ায় মতো সে এসে দাঁড়িয়েছে। বুকের কাছে চাদরে জড়ানো একটি শিশু। মেয়েটি আরও কাছে এল। রুক্ষ চুলে ঘেরা শীর্ণ মুখ। দু'চোখে জলের ধারা।

একে কোথায় দেখেছি? এই দুর্যোগে বরফের টিলা ভেঙে বন্ধ বাড়িতে কোথা থেকে উঠে এল? আতঙ্কে গলা দিয়ে আমার স্বর বেরচ্ছে না। শিরদাঁড়ায় ঠান্ডা স্রোত। ছুটে পালানোর শক্তি নেই। চোখ বন্ধ করে মাটিতে বসে পড়ার মুহূর্তে কাচের জানলায় ঝনঝন শব্দ উঠল। তখনই মনে হল যে করেই হোক, আমাকে বাইরে যেতে হবে। এ বাড়িতে আর এক মুহূর্ত নয়। যে এসেছিল, সে বারবার আসবে। আমাকে এখনই এখান থেকে চলে যেতে হবে।

সিঁড়ি দিয়ে ছুটে নীচে নেমে এসেছি। সামনের দরজা খুলে বাইরে যেতে গিয়ে খেয়াল হল ওভারকোট পরা হয়নি। বুট ছাড়া বরফে হাঁটা যাবে না। কনকনে হাওয়া আর বরফের গুঁড়োয় শরীরে প্রচণ্ড শীত ঢুকে যাচ্ছে। কোনোমতে কোট আর জুতো পরে ড্রাইভ-ওয়েতে এলাম।

কিন্তু হেঁটে হেঁটে উঁচু-নিচু বরফের স্তূপ মাড়িয়ে কোথায় যাব? পাশের বাড়িটাও খুব কাছে নয়। তবু ওখানেই যাব। বরফে পা পিছলে যাচ্ছে। মাথা, মুখ ভিজে যাচ্ছে। আরও খানিকটা যেতে হবে।

চোখে হেড-লাইটের আলো পড়তে থমকে দাঁড়ালাম। গাড়িটা থেমে গেছে। দরজা খুলে কল্যাণ প্রায় ছুটে এল—"এ কী? কোথায় যাচ্ছ তুমি? কী হয়েছে বাসবী?"

ওর হাত আঁকড়ে ধরে বললাম—"আমরা আর এখানে থাকব না কল্যাণ। আজ যা দেখেছি, ও বাড়িতে কিছুতেই থাকতে পারব না..."

—"চলো, গাড়িতে ওঠো। ঠান্ডার মধ্যে কী পাগলামি শুরু করেছ!"

কল্যাণ জোর করে আমাকে গাড়িতে বসাল। আমাদের ড্রাইভ-ওয়েতে ঢোকার মুখে বাধা দিয়ে বললাম—"তুমি আমার কথা শুনছ না কেন? দিয়া যা বলেছিল বিশ্বাস করোনি। কিন্তু আজ তো নিজের চোখে দেখলাম। সত্যি বলছি! একটা মেয়েকে স্পষ্ট দেখলাম।"

—"কোথায়? আবার সেই গ্যারেজে গাড়িতে বসে আছে? দিয়ার কথায় তুমি এত ভয় পেলে বাসবী?"

—"না। দিয়ার কথায় নয়। তুমি জানো, ভয়টয় আমার অনেকদিন চলে গেছে। দিনের পর দিন একা থাকি। মাঝে মাঝে আনক্যানি ফিলিং হয়। তবু ভয় করেনি। ভেবেছি, যদি কিছু থাকে থাক। আমাদের তো কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। তোমাকে বলেওছি সে কথা।"

গ্যারাজে গাড়ি তুলে কল্যাণ জিজ্ঞেস করল—"এখনও ভয় করছে? কাল থেকে একা থাকবে কী করে?"

সেই চিন্তাটাই শুরু হয়েছে। কিন্তু ইমপালসের মাথায় তো কিছু করা যায় না। ক্রমশ উত্তেজনা থিতিয়ে আসছিল। সত্যি? রাতারাতি কোথায় যাবো আমরা? মনে সাহস ফিরিয়ে আনতে হবে। তারপর যা হয় ডিসিশন নেব। এটা সত্যি যে, এখানে আসার পর খারাপ কিছু ঘটেনি। হয়তো ভালোয় ভালোয় চলে যেতেও পারব। কিন্তু দেরি করা যাবে না। শুধু মাঝের ক'টাদিন একটু সাহস করে থাকা। এই যুক্তি দিয়েই ভয় কাটাতে চেষ্টা করছিলাম।

পরদিন নিজেই বাড়ি বিক্রির কথা তুললাম। কল্যাণ বলল—"তোমার জন্যেই একগাদা দাম দিয়ে বাড়িটা কেনা হল। খরচ করে কিচেন রিফার্নিশ করালাম। ল্যান্ডস্কেপিং-এও কম খরচ হয়নি। এখন বলছ বাড়ি বিক্রি করে দাও। বাসবী, এটাও তো ইনভেস্টমেন্ট। এত তাড়াতাড়ি বিক্রি করলে বাড়ির দাম কিন্তু কিছুই অ্যাপ্রিশিয়েটেড হবে না। এরপর আবার নতুন বাড়ি কিনতে হবে।"

আমারও খারাপ লাগছে। কল্যাণ যা বলছে, প্র্যাক্টিক্যাল চিন্তা থেকেই বলছে। সত্যি! আমিই তো পছন্দ করে বাড়িটা কিনেছিলাম। কত শখ করে ঘরদোর সাজিয়েছি। ভেবেছি এখানে থাকতে থাকতেই অভীক, দিয়ার বিয়ে হবে। সামারে দিল্লি থেকে বাবা-মা-র আসার কথা। বাবা বাগান করতে ভালোবাসেন। এত জমিটমি দেখে খুশি হবেন। আরও কত ইচ্ছে ছিল। অথচ আজ মনে হচ্ছে এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচি। সব সময় একটা চাপা আতঙ্ক। আমি, দিয়া দুজনেই তাকে দেখেছি। সেই অশরীরী ছায়া বিষাদের প্রতিচ্ছবির মতো কেন দেখা দেয়? এ বাড়িতে কিছু কি ঘটেছিল? ভাবতে ভাবতে শিউরে উঠি। কল্যাণকে আবার বলি—"জানি, অনেক লস হবে। তাও বাড়িটা মার্কেটে দিয়ে দাও। আমি কন্‌ভিন্সড্ এ বাড়িতে স্পিরিট আছে। উই শ্যুড নট লিভ হিয়ার এনি মোর।"

কল্যাণ ফোনে অভীক আর দিয়ার সঙ্গে আলোচনা করল। দুজনেরই এক কথা। মা যা চাইছে তাই করো। এ বাড়িটাকে ঘিরে ওদের কোনো শৈশব-স্মৃতি নেই। মায়াও নেই। তার ওপর আমি ভয় পাচ্ছি জেনে সোজাসুজি বাড়ি বিক্রি করে দিতে বলল।

কল্যাণ বলল—"ঠিক আছে। রিয়েলটরের সঙ্গে কথা বলি। তবে উইনটারে আর কে বাড়ি কিনতে আসবে? হয়তো এপ্রিল অবধি অপেক্ষা করতে হবে।"

মার্চের প্রথমে বাড়ি মার্কেটে দেওয়া হল। আগের রিয়েল এস্টেট এজেন্টের কাছেই ফিরে গেছি। তার নাম যোসেফ ব্র্যাডলি। দেড় বছরের মধ্যে বাড়ি বিক্রি করছি দেখে সে অবাক। আমরা বললাম কল্যাণের অফিস বড় দূর হয়ে গেছে। তাছাড়া জমি, বাগান মেইন-টেইন করাও মুশকিল হচ্ছে। এবার অল্প জমিসুদ্ধু নতুন বাড়ি কেনার ইচ্ছে।

কল্যাণ তো সময় পায় না। আমি যোসেফের সঙ্গে গাড়িতে ঘুরে ঘুরে নতুন নতুন ডেভেলপমেন্ট দেখতে যাচ্ছি। পুরোনো বাড়ির সামনে 'ফর সেল' লেখা পোস্টার বসানো। মাঝে মাঝে লোকজন দেখতে আসছে। দাম কমানোর চেষ্টা করছে। যোসেফ বলছে—"ধরে বসে থাকো। মাস দুই পরে রিয়েল এস্টেট সিজন শুরু হলে অনেক বায়ার আসবে। এ বাড়ি পড়ে থাকবে না।"

তাই যেন হয়। এখান থেকে আমার মন উঠে গেছে।

কলেজের স্প্রিং ব্রেক-এ ক'দিনের জন্যে অভীক, দিয়ার ছুটি ছিল। অভীক বাড়ি এসেই পরের দিনের ফ্লাইটে বন্ধুদের সঙ্গে ফ্লোরিডা গেল। দিয়া যাচ্ছে মন্ট্রিয়লে ওর ছোট পিসির কাছে। ওর হাতে একদিন সময় আছে দেখে বললাম—"চল না। যোসেফের সঙ্গে কয়েকটা বাড়ি দেখে আসবি। এ-বাড়ি বিক্রি হোক না হোক, আমরা জুনের মধ্যে নতুন বাড়িতে চলে যাব। এবার তোরাই ডিসিশন নে, কোন জায়গায় বাড়ি কিনব। আমার যা এক্সপেরিয়েন্স হল!"

দিয়ার গলায় কৌতূহল—"আচ্ছা মা, আর কোনদিন কিছু খেয়াল করেছ? মাঝে মাঝে মনে হয় আমি ওভার রিঅ্যাক্ট্ করিনি তো? কিন্তু দু'বারই ভুল দেখলাম....।"

—"তোর বাবার ধারণা আমরা খুব উইক-মাইন্ডের লোক। ভূতের গল্প আছে বলেই ওসব কল্পনা করে নিই। নয়তো, বাবা কেন দেখল না? অভীক কেন দেখল না? যাক গে। আমি আর তর্ক করি না। এক কথায় বাড়ি বিক্রি করতে রাজি হয়ে গেল তো।"

আমি আর দিয়া যোসেফের সঙ্গে গাড়িতে যাচ্ছি। দিয়া হঠাৎ জিজ্ঞেস করল—"মিস্টার ব্র্যাডলি, আমাদের প্রথম বাড়িটা তো তুমিই কিনিয়েছ। ওনারের কী নাম ছিল?"

যোসেফ ভুরু কুঁচকে মনে করার চেষ্টা করছে দেখে বললাম—"আমি জানি তো। রবার্ট অ্যান্ড বারবারা রে। বোধহয় বোস্টনে থাকে। বাড়ি কেনার সময় তাদের কাউকেই দেখিনি। ওদের রিয়েলটর আর লইয়ারই ক্লোসিং করাল।"

যোসেফ মাথা নাড়ল—"আমিও তাদের দেখিনি। বাড়িটা অনেকদিন মার্কেটে ছিল। আমাদের কথাবার্তা যা হত ওদের এখানকার রিয়েল এস্টেট এজেন্টের সঙ্গে।"

দিয়া জানতে চাইল—"তাহলে এ বাড়িতে কারা থাকত?"

—"বহু বছর ধরে ভাড়া দেওয়া ছিল। মাঝে মাঝে টেনেন্ট বদল হয়েছে। এইটুকুই জানি।"

কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে নতুন ডেভেলপমেন্ট ঘুরছি। হার্টফোর্ডের কাছাকাছি কয়েকটা বাড়ি বেশ পছন্দ হল। কল্যাণের অফিস থেকেও বেশি দূরে হবে না। উইক-এন্ডে ওকে নিয়ে

আবার আসব। আর দেরি করতে চাই না। একটাই চিন্তা, ও বাড়িটা যে কতদিনে বিক্রি হবে। অসমান জমির ওপর গাছপালা সুদ্ধু অত পুরোনো বাড়ি অনেকে কিনতেও চায় না। আমার মাথায় তখন যে কী ভর করেছিল....

রাত্তিরে আমরা ফ্যামিলি রুমে কফি নিয়ে বসেছি। দিয়া বলল—"তার মানে অনেক বছর আগে কোনো বাঙালি টেনেন্ট এখানে ছিল। ওই যে, অভীক যাদের বইটই খুঁজে পেল।"

হঠাৎ প্যাকেটটার কথা মনে পড়ল। ছবি দুটোর কথাও। কী যেন নাম ছিল লোকটার? পদবিটা মনে পড়ছে, রায়। ডাক্তার ছিল। কে জানে এখন কোথায় আছে তারা। হয়তো ওরাও এ বাড়িতে টিকতে পারেনি। নাকি তারপরে কিছু ঘটেছিল?

আমাদের দুই প্রতিবেশীর বাড়িই বেশ দূরে দূরে। মাঝে অনেকটা করে জমি। একজনদের সঙ্গে ওপর ওপর আলাপ। অন্যদের সঙ্গে দু-একবার আসা-যাওয়া হয়েছে। মহিলার নাম অ্যাম্যান্ডা। সেদিন হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞেস করল—"তোমরা মুভ্ করে যাচ্ছ? বাড়ি সেল-এ দিয়েছ দেখলাম।"

আমি মেইল-বক্স দেখতে বেরিয়েছিলাম। অ্যাম্যান্ডার গাড়ির কাছে গিয়ে বললাম—"হ্যাঁ, হার্টফোর্ডের দিকে চলে যাচ্ছি। এখান থেকে আমার হাজবেন্ডকে বড্ড ড্রাইভ করতে হয়।"

অ্যাম্যান্ডা জিজ্ঞেস করল—"কতদূরে অফিস?"

—"প্রায় কুড়ি মাইল। উইনটারে এদিকের রাস্তাঘাট এত খারাপ থাকে, আগে ঠিক বুঝতে পারিনি।"

নিজের কানেই কথাগুলো অযৌক্তিক শোনাচ্ছিল। এক তো এদেশে কুড়ি মাইল কোনো দূরত্বই নয়। আধঘণ্টার পথ। এরচেয়ে অনেক বেশি ড্রাইভ করে লোকে অফিসে যায়। তাছাড়া, এটা পাহাড়ি এলাকাও নয় যে শীতকালে পথঘাট খারাপ থাকবে। আসলে, কী কারণ দেখাব? নিজের বাড়িতে ভূত আছে, একথা পাড়ায় রটালে বাড়ি সহজে বিক্রি হবে?

অ্যাম্যান্ডা বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থেকে যেন নিজের মনেই বলল—"স্ট্রেঞ্জ! এত সুন্দর বাড়িটা কেউ বেশিদিন এনজয় করতে পারে না। কত লোক রেন্ট করল। আবার চলেও গেল।"

অ্যাম্যান্ডা কি কিছু জানে? কোনো ভাড়াটে কি কিছু বলে গিয়েছিল? তার তো বাড়ি বিক্রির চিন্তা ছিল না। ভয়টয় পেয়ে থাকলে ওদের কাছে বলতেও পারে। আমিও তো সেদিন আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে ওদের কাছেই ছুটে যাচ্ছিলাম। কল্যাণ না এসে পড়লে অ্যাম্যান্ডাদের কাছেই সব বলতাম।

অ্যাম্যান্ডা গাড়ি স্টার্ট দিয়ে চলে যাবার সময় বলে গেল—"মুভ্ করার আগে একদিন এসো। কোনো হেলপ লাগলে জানিও।"

আমাদের নতুন বাড়ি কেনার কন্ট্র্যাক্ট সই হয়ে গেল। দু'মাস পরে চলে যাব। এ বাড়ি দেখতে লোকজন প্রায়ই আসছে। যোসেফ আশা দিচ্ছে শিগগিরই ভালো অফার পেয়ে যাব। কল্যাণ বাড়ির ওরিজিন্যাল প্ল্যান, কবে কী রেনোভেশন হয়েছে, কয়েকটা ইনসপেকশনের রেকর্ড, বাড়ির দলিল, সব কিছুর কপি করে রাখছিল। তখনই হঠাৎ পুরোনো ওনার রবার্ট আর বারবারা রে-র ফোন নম্বরটা চোখে পড়ল। বোস্টনে নয়, এরা ম্যাসাচুসেট্স্-এর ফ্রেমিংহ্যামে থাকে। ফোন নম্বরটা লিখে রাখলাম।

শীত প্রায় চলে যাবার মুখে। বাগানে টিউলিপ্ মাথা তুলেছে। গোলাপের কুঁড়ি দেখা দিয়েছে। সময়ের আগেই ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে ম্যাগনোলিয়ার ঝোপ। আবার বাগানে এসে

পাখিদের খাবার ছড়িয়ে দিই। দু'হাতে পাইনের ফল আঁকড়ে কাঠবেড়ালি বসে থাকে। মাথার ওপর ঝলমলে রোদ। নীল আকাশে রুপোর ডানা মেলে উড়ে যাওয়া এরোপ্লেন। নিঃঝুম দুপুরে সাঁকোর ওপর এসে দাঁড়াই। নীচে জলের ক্ষীণ ধারা নেমে যাচ্ছে। প্রকৃতির বৈভবের মাঝে দাঁড়িয়ে হঠাৎই মনে হয়—তবে কি দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম? দৃষ্টিবিভ্রম হয়েছিল? অবচেতনে লুকিয়ে থাকা ভয় এমনই বিভীষিকা হয়ে ফিরে এল, যে, এই পরিবেশ উপভোগ করতে পারলাম না। বাড়িটা ভোগ করতে পারলাম না। ভাবনার টানাপোড়েনের মাঝে এভাবেই দিন চলে যায়।

কল্যাণ অফিসের কাজে বোস্টনে যাচ্ছে। আমাকেও যেতে বলছে। ভাবলাম ঘুরে আসি। ও অফিসের মিটিং নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও অসুবিধে নেই। অভীকের অ্যাপার্টমেন্টে চলে যাব। ওর সব দিন সকালে ক্লাস থাকে না। নয়তো সন্ধেবেলায় দেখা হবে।

বোস্টনে এসেছি। অভীককে ফোন করলাম। ও এসে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে গেল। ওর সঙ্গে আর একটা ছেলে থাকে। অভীক বলল—"আমাকে একবার ল্যাবে যেতে হবে। তুমি টিভি দেখতে পারো। নিউজ পেপার রয়েছে। ফিরে এসে তোমাকে লাঞ্চে নিয়ে যাব।"

—"ঠিক আছে। তুই ঘুরে আয়।"

বসে বসে 'বোস্টন গ্লোব' পড়ছি, অন্য বেডরুম থেকে সেই আমেরিকান ছেলেটা বেরিয়ে এল। ও যে বাড়িতে আছে বুঝতে পারিনি। কলেজ যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। আমাকে দেখে কাছে এসে হ্যান্ড-শেক করল—"হাই মিসেস মিট্রা! হাউ আর ইউ?"

ওর নাম এরিক। কথা বলতে বলতে দুজনের জন্যে কফি নিয়ে এল। বোধহয় বেরনোর তেমন তাড়া নেই। কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলাম—"তোমার বাড়ি কোথায় এরিক? বাবা-মা কোন শহরে থাকেন?"

—"আমরা ম্যাসাচুসেটস-এর লোক। এদিকেই বড় হয়েছি। বাবা-মা ফ্রেমিংহ্যামে থাকেন।"

ফ্রেমিংহ্যাম! নামটা ভীষণ চেনা লাগছে। কাদের ফোন নম্বর এই সেদিনই যেন লিখে রাখলাম? ভাবতে ভাবতে নাম দুটো মনে পড়ে গেল।

—"তুমি ওই শহরেই বড় হয়েছ, না?"

—"হ্যাঁ। কলেজে আসার আগে এইটিন্ ইয়ার্স ওখানেই থেকেছি। এখনও ছুটিতে যাই।"

—"তোমরা রবার্ট আর বারবারা রে বলে কোনো ফ্যামিলিকে চেনো?"

এরিক অবাক হয়ে গেছে—"শিওর! ডক্টর রে আমাদের পেডিয়াট্রিসিয়ান ছিলেন। আমরা ভাইবোনেরা ছোটবেলায় ওঁর কাছে গেছি। মিসেস রে আমাদের জুনিয়র হাইস্কুলে মিউজিক শেখাতেন। বাট হাউ ডু ইউ নো দেম? ওরা কি তোমাদের আত্মীয়?"

ভাবতেই পারিনি এভাবে রবার্ট রে-র খবর পেয়ে যাব। পুরনো ওনারদের সঙ্গে দেখা হলে হয়তো বাড়িটার রহস্য ভেদ হতে পারে। কেন ওরা কখনও সেখানে থাকেনি? কেনই বা ভাড়াটেরা বেশিদিন থাকত না? ওরা নিশ্চয়ই কিছু জানে। একবার কথা বলা যায় না?

—"এরিক, আমি একবার ওদের ফোন করতে চাই। তুমি কি তোমার বাবা-মাকে ফোন করে নাম্বারটা জোগাড় করে দিতে পারো?"

—"দেখি, মাকে অফিসে ফোন করি। নয়তো অপারেটরকে কল করলে পেয়ে যাব।"

—"তোমার ক্লাসের দেরি হয়ে যাচ্ছে বোধহয়? আমিই বরং অপারেটরকে কল করি।"

এরিক ওর মাকে ফোন করতে মহিলা কিছুক্ষণ ধরিয়ে রাখলেন। তারপর ফ্রেমিংহ্যামের ফোন-বুক দেখে নম্বর দিয়ে দিলেন।

ক্লাসে বেরিয়ে যাওয়ার আগে এরিক বলল—"ডঃ রের মেয়ে আমার বোনের বন্ধু ছিল। তার নাম মীরা। এখন ডার্টমাথ-এ পড়ছে।"

—"ইন্ডিয়ান নাম রেখেছে! আজকাল অবশ্য আমেরিকান ফ্যামিলিতে এরকম নাম শুনি।"

এরিক দরজার ওপার থেকে বলল—"বাট হি ইজ নট অ্যান আমেরিকান!"

—"কার কথা বলছ?"

—"ডঃ রে। উনি তো ইন্ডিয়ান। ওঁর স্ত্রী আইরিশ আমেরিকান।"

আমাকে অবাক করে এরিক এলিভেটরে ঢুকে গেল। রবার্ট রে তাহলে আমেরিকান নয়? ইন্ডিয়ান ডাক্তার নিজের নামটাকে রবার্ট বানিয়েছে!

ফোন নম্বর তো জোগাড় হল। সত্যিই কি ফোন করব? দেড় বছরের ওপর বাড়ি কিনেছি। তখন এদের চোখে দেখিনি। লইয়ার পাঠিয়ে কাজ সারল। আজ হঠাৎ কী সূত্রে ফোন করব? যে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো, তার ইতিহাস জেনেই বা কী হবে?

অথচ ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে। মন বলছে ও বাড়ির কোনো রহস্যময় অতীত আছে। মুহূর্তের জন্যে যাকে দেখেছিলাম, তার মুখ আজও মনে আছে। সেই অস্পষ্ট ছায়া শরীর, দিয়ার ক্রিসমাসের রাতের অভিজ্ঞতা—সবই কি দুর্বল মনের অবাস্তব চিন্তা? কল্যাণ ভাবে আমরা অন্ধকারে ছায়াটায়া দেখে ভয় পেয়েছিলাম। প্রেতাত্মার কথাটথা মানতেই চায় না। আশ্চর্য! ওদের কিন্তু একবারও কোনো আনন্যাচারাল এক্সপেরিয়েন্স হল না। তার মানে মিডিয়াম অন্যরকম। সকলে আত্মটাত্মা দেখতে পায় না। সে জন্যে বিশ্বাসও করতে চায় না।

শেষ পর্যন্ত ফ্রেমিংহ্যামে ফোন করলাম। বাড়ির মেইড ফোন ধরল। বলল মিসেস রে এখনও স্কুল থেকে ফেরেননি। আমি যেন বিকেল তিনটের পর ফোন করি।

তখন আর কথা হল না। দুটো নাগাদ অভীক ফিরে এলে আমরা লাঞ্চ খেতে বেরোলাম। তারপর আমার হোটেলে ফেরার কথা। কিন্তু একবার হোটেলে ফিরে গেলে ফোন করা মুশকিল হবে। কল্যাণ যদি ঘরে আসে, কিছুতেই রবার্ট রেদের ফোন করতে দেবে না। নিজেও জানি ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যে করে হোক যোগাযোগ করতেই হবে। অভীককে বললাম এত তাড়াতাড়ি হোটেলে যাব না। ওর অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে একটু রান্নাটান্না করে দেব। বিকেলের দিকে সাব-ওয়ে দিয়ে নিজেই হোটেলে ফিরে যাবো।

অভীক বলল—"রান্নাটান্না করতে হবে না। শুধু শুধু অ্যাপার্টমেন্টে বসে থাকবে কেন? আমার তো ল্যাব থেকে ফিরতে দেরি হবে। তুমি এখনই সাব-ওয়ে নিয়ে নাও।"

ছেলের তাড়নায় হোটেলে ফিরে আসতে হল। কল্যাণ তখনও ঘরে আসেনি। এই সুযোগে ফোনটা করে ফেলি।

বারবারা রে ফোন ধরলেন। পরিচয় দেওয়ার পর বললাম—"আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই। বাড়ির ব্যাপারে কিছু কথা আছে।"

বারবারা বললেন—"বাড়ি তো আমরা বিক্রি করে দিয়েছি। কোনো প্রবলেম হলে আমাদের তো এখন আর দায়িত্ব নেই।"

—"প্রবলেমের কথা বলছি না। আপনাদের অনেক জিনিস বাড়িতে রয়ে গেছে। ডিসপোজ করার আগে জানিয়ে দিতে চাইছিলাম।"

বারবারা আশ্বস্ত হলেন—"কী জিনিস আছে এত? সেগুলো আমাদের না কি অন্য টেনেন্টরা ফেলে গেছে?"

—"অ্যাটিক ভর্তি বাক্স। গ্যারাজে, বেসমেন্টে পুরনো ফার্নিচারও আছে। দুটো-একটা অ্যান্টিক ল্যাম্প। এগুলো তো আপনাদেরই নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। রিয়েলটর তাই বলেছিল। কিন্তু এখন দেখছি সব পড়ে আছে।"

—"হতে পারে। আমরা তো ক্লোসিং-এর সময় যেতে পারিনি। ঠিক আছে। আপনি একটা লিস্ট করে নিয়ে আসুন। দেখি, কী করা যায়?"

এবার কল্যাণকে সব খুলে বলতে হবে। কাল আমাদের বিকেলের পর বাড়ি ফেরার কথা। এরমধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে ফ্রেমিংহ্যাম যাবো কী করে? গাড়িই বা পাবো কোথায়? ফোন-টোন যা করার করেছি। এরপর কল্যাণ সঙ্গে থাকলেই ভালো।

মিটিং সেরে কল্যাণ ঘরে এসে বলল—"কখন ফিরলে? অভীক লাঞ্চে নিয়ে গিয়েছিল?"

—"হ্যাঁ, একটা সি-ফুড রেস্টুরেন্টে গেলাম। তুমি লাঞ্চে কী খেলে?"

—"বেরোতেই পারিনি। মিটিং-এর মধ্যে ব্রেক্ দিয়ে স্যান্ডউইচ খাওয়া হল। রাত্তিরে অবশ্য হায়াটেই ডিনার আছে। সাতটার ভেতর রেডি হয়ে নিও।"

টিভি চালিয়ে দিয়ে কল্যাণ বিছানার ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। এবার সাহস করে কথাটা তুলতে হবে। বিছানার একপাশে গিয়ে বসলাম। কল্যাণ বলল—"একটু শুয়ে নাও না। এখনও সময় আছে। সাতটার সময় নীচে গেলেই হবে।"

—"নাঃ, শোওয়ার দরকার নেই। ...জানো, আজ একটা ব্যাপার হয়েছে। কী অদ্ভুত যোগাযোগ ভাবতে পারবে না!"

—"কী আবার হল?"

—"অভীকের বন্ধু এরিকের কাছে সেই রবার্ট রের ফোন নম্বর পেয়ে গেলাম। ভদ্রলোক ইন্ডিয়ান। এরিকদের চেনা ডাক্তার।"

কল্যাণ ভালো করে শুনছে না। টিভি-র খবর দেখতে ব্যস্ত। তাও জিজ্ঞেস করল—"এরিক, রবার্ট, কাদের কথা বলছ। বুঝতেই তো পারছি না।"

—"এরিককে চেনো না? অভীকের অ্যাপার্টমেন্টে থাকে। আজ ওর সঙ্গে দেখা হল তো। ও-ই আমায় রবার্ট আর বারবারা রের খবর দিল। কারা বুঝতে পারছ? যারা আমাদের ভূতের বাড়ি গছিয়ে দিয়েছে। আমরাও ছাড়ব না..."

কল্যাণ ঘুরে তাকাল—"তার মানে? সেই আগের ওনারদের খোঁজ পেয়েছ? এরিক কী করে রিলেট করতে পারল? অভীক কিছু বলেছে?"

ভাবলাম অভীকের নামেই চালিয়ে দিই। কিন্তু, না। বাবা আর ছেলেতে কথা হলেই ধরা পড়ে যাব। কায়দা করে উত্তর দিলাম—"না না, অভীক জানেই না। এমনিই, কথায় কথায় বেরিয়ে গেল। ফ্রেমিংহ্যামে কত ইন্ডিয়ান আছে, বলতে বলতে এরিক রবার্ট রের নাম বলল। আমারও তখন নাম দুটো মনে পড়ে গেল। এরিক তো বলছে ভদ্রলোক ইন্ডিয়ান।"

কল্যাণ টিভির চ্যানেল বদলাচ্ছে। কথাগুলো শুনছে। কোনো ভাবান্তর নেই। একটু চুপ

করে থেকে শুরু করলাম—"আজ আমি ওদের ফোন করেছি। রবার্টের বউ বারবারাকে ধরেছিলাম। অ্যাটিক আর গ্যারাজ থেকে জিনিসপত্র সরিয়ে নিতে বলেছি।"

কল্যাণ অবাক—"হঠাৎ ফোন করে এসব বললে? কবে বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছে! এতদিন পরে কিছু করবে ভেবেছ? মহিলা কী বললেন?"

—"লিস্ট নিয়ে দেখা করতে বলেছে। হয়তো পার্সোনাল আইটেমগুলো ফেরত নিয়ে আসবে। কাল একবার ওদের বাড়ি যাবো। আমরা এখান থেকে কাল ক'টায় বেরোচ্ছি?"

কল্যাণ সন্দিগ্ধ চোখে চেয়ে আছে—"বাসবী, তুমি কিন্তু সত্যি কথাটা বলছ না। ওদের অ্যান্টিক জিনিসপত্র নিয়ে তো বাড়ি সাজিয়ে বসে আছো। এখন বলছ ওগুলো গারবেজ? আমি ঠিক জানি, কেন তুমি ওদের ফোন করেছিলে।"

—"তুমি তো সব জানো! বলো, কেন ফোন করেছিলাম?"

—"কেন আবার? ভূতের গল্প উদ্ধার করবে বলে। কোনো মানে হয়? চিনি না শুনি না কে রবার্ট রে! তাদের বাড়ি উজিয়ে গিয়ে এখন ঝগড়া লাগাই, কেন মশাই ভূতের বাড়ি গছিয়েছেন? আমার বউ, মেয়ে দিনদুপুরে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে।"

একপ্রস্থ তর্কাতর্কির শেষে কল্যাণ ফ্রেমিংহ্যাম যেতে রাজি হয়ে গেল। রাত হয়ে যাচ্ছে। আমরা সেজেগুজে হোটেলের ব্যাংকোয়েট হলে চলে গেলাম।

পরদিন হায়াট রিজেন্সি থেকে চেকআউট করে বেলা একটা নাগাদ ফ্রেমিংহ্যাম রওনা দিলাম। পথে কোথাও লাঞ্চ সেরে নেব। বারবারা তিনটের পরে যেতে বলেছেন। কল্যাণ কিন্তু আজ আর গজগজ করছে না। ভূতের ইতিহাসে ওর অবশ্য কোনো ইনটারেস্ট নেই। তবে বাড়ি বিক্রির আগে এরা যদি সত্যিই ভাঙাচোরা ফার্নিচার আর প্যাকিং বাক্সটাক্সগুলো বার করে নেয়, আমাদের পরিশ্রম বাঁচবে। আমরা বলেই হাবিজাবি জিনিস সুদ্ধু বাড়ি কিনেছিলাম। আমেরিকানরা হলে সব ঝেঁটিয়ে তুলে নিতে বলত। আসলে দু-একটা সুন্দর অ্যান্টিক জিনিস পেয়ে আমিও অত গা করিনি। যাক গে। ফেরত নিয়ে নেয় নেবে।

ফ্রেমিংহ্যামে ওদের রাস্তার নাম ব্র্যান্ডিওয়াইন ড্রাইভ। কল্যাণ হাসছে—"মধুশালায় ঢুকছি! তোমার পাল্লায় পড়ে কোথায় না যাচ্ছি।"

রবার্ট রের বাড়ির দরজার পৌঁছে পিয়ানোর শব্দ পেলাম। মেইড দরজা খুলে বাইরের ঘরে বসাল। বলল মিসেস রে ছাত্রীকে পিয়ানো শেখাচ্ছেন। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে বলেছেন।

পিয়ানোতে 'চ্যারিয়ট্স্ অফ্ ফায়ার' ছবিটার টাইটল্ মিউজিক শুনতে শুনতে ম্যাগাজিন ওল্টাচ্ছি। কল্যাণ ঘরের এদিক-ওদিক দেখে বলল—"পেইনটিং-এর কালেকশন ভালো। বিকাশ ভট্টাচার্যের ছবিটা বোধহয় নিউ ইয়র্কের 'ক্রিস্টিস' থেকে কেনা। এক্সিবিশনে রাখা ছিল মনে আছে?"

মেইড কফি নিয়ে এল। তারপরেই পিয়ানোর ক্লাস শেষ করে বারবারা এলেন। ফোনে বয়সটা আন্দাজ করতে পারিনি। দেখে মনে হল পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে। রোগা রোগা গড়ন। চশমা পরা বুদ্ধিদীপ্ত মুখ। হাসিমুখেই অভ্যর্থনা করলেন।

দু-চার কথার পর লিস্টটা ধরিয়ে দিলাম। আজ সকালে হোটেলের ঘরে বসে লিখেছি। এদের যে জিনিসগুলো নিয়ে নিয়েছিলাম, সেগুলোও লিখে দিয়েছি।

বারবারা লিস্টটা পড়ে নিয়ে বললেন—"এর কোনোটাই কি আপনাদের রাখার ইচ্ছে নেই? না হলে ডিসপোস করে দিতে পারেন। এত দূর থেকে আমরা কী করতে পারি বলুন।"

বুঝলাম জিনিসপত্র ফেলে দিতেই বলছেন। এরপর তো আর কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছি না। কল্যাণ জিজ্ঞেস করল—"আপনার হাসবেন্ড বোধহয় ইন্ডিয়ান? আমার ছেলের বন্ধু বলছিল। এরিক। আপনাদের চেনে।"

ভুরু কুঁচকে বারবারা বললেন—"এরিক? এরিক ম্যাকগাভর্ন? ওদের ফ্যামিলিকে আমরা চিনি। কাছেই থাকে। হ্যাঁ, আমার হাসবেন্ড ইন্ডিয়ান। বেঙ্গলি।"

কল্যাণ নড়েচড়ে বসল—"রিয়েলি? আমরাও তো তাই। দেখা হলে ভালো লাগত।"

—"রব এখানে নেই। মেডিকেল কনফারেন্সে অ্যাটল্যান্টা গেছে। কাল ফিরবে।"

খেজুরে আলাপ বেশিক্ষণ চালানো যাবে না। দরকারি কথা শেষ হয়ে গেছে। মহিলা একবারও জানতে চাইছেন না, নতুন বাড়িতে আমাদের কেমন লাগছে। কিংবা শহরটা কেমন লাগছে। বুঝতে পারছি গায়ে পড়ে আর বেশি প্রশ্ন করা ঠিক নয়। কল্যাণ বেরিয়েই বলবে আমরা শুধু শুধু সময় নষ্ট করলাম। বাড়ি পৌঁছোতেও অনেক দেরি হয়ে যাবে। ঝোঁকের মাথায় চলে এসে কোনো লাভ হল না। এবার উঠে পড়ি।

ওঠার আগে বারবারাকে জিজ্ঞেস করে ওদের টয়লেটে গেলাম। ফ্যামিলি রুমের ভেতর দিয়ে গিয়ে প্যাসেজের একপাশে টয়লেট। ফেরার সময় ফ্যামিলি রুমে ঢুকে ফায়ার প্লেসের ওপর ছবিটা দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছি। এ ছবি এখানে কেন? বাঙালি মা সেজেগুজে দুই ছেলেকে পাশে নিয়ে বসে আছে। এ তো সেই অ্যাটিকে, খুঁজে পাওয়া পুরনো ছবিটার কপি। রবার্ট রে তাহলে কে? পেছনে বারবারা এসে দাঁড়িয়েছেন। আমার দৃষ্টি লক্ষ্য করে বললেন—"রবের মা-র ছবি। পাশে রব আর ওর ছোটভাই ডেভ।"

—"এর একটা কপি ওই বাড়িতে পড়ে আছে। অ্যাটিকে একগাদা মেডিকেল জার্নাল আর ম্যাগাজিনের সঙ্গে ছিল। বিমান রায় কে?"

বারবারা তখনও ছবিটার দিকে তাকিয়ে। আমি আবার জিজ্ঞেস করাতে বললেন—"রবের বাবা।"

—"ওরা কি এখানে থাকেন?"

—"রবের ড্যাড ফ্লোরিডায় থাকেন। আশির ওপর বয়স হয়ে গেছে। মা নেই। কম বয়সে মারা গেছেন।"

—"ছবিতে খুব ইয়াং লাগছে। কী নাম ছিল ওঁর?"

—"মীরা। আমাদের মেয়ের নামও মীরা রেখেছি।"

মনে পড়ল এরিক তাই বলেছিল। কিন্তু আমার যে আরও প্রশ্ন আছে। আজ না জানতে চাইলে আর কখনও সুযোগ হবে না। দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠে কথাটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি, মেইড এসে বলল, কল্যাণ ডাকছে। খুব দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে তাড়া দিচ্ছে।

শেষ মুহূর্তে বলে ফেললাম—"আমার কয়েকটা কথা ছিল বারবারা। ফিরে গিয়ে আপনাকে ফোন করতে পারি?"

আমার হাত ধরে বারবার বললেন—"নিশ্চয়ই। আমাকে কল করবেন। যদি কিছু জানতে চান, উত্তর দিতে চেষ্টা করব।"

সপ্তাহ খানেক পরে রিয়েলটর যোসেফ খবর দিল আমাদের বাড়ির জন্যে তিনটে অফার এসেছে। তারমধ্যে একটা চার্চ গ্রুপ, আমরা যা চাইছি, তার কাছাকাছি দাম দিতে রাজি। ওদের সেন্ট পিটার্স হসপিট্যালের কয়েকজন ক্যাথলিক নার্স আর সিসটারদের থাকার জন্যে বাড়িটা কিনতে চাইছে।

চার্চ গ্রুপের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট সই হয়ে গেল। হার্টফোর্ডের কাছে নতুন বাড়িও পেয়ে গেছি। মাঝে আর একটা মাস। গরমের ছুটিতে দিয়া এসেছে। সামনে এখন পাহাড় প্রমাণ কাজ। গোছগাছ, পুরোনো জিনিসপত্র দেখেশুনে কিছু সঙ্গে নেওয়া। কিছু ফেলে দেওয়া। পুরো বাড়িটা খালি করে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রেখে যেতে হবে। এত বছর ধরে কী যে অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র জড়ো করেছি, বাড়ি বদলের সময় সেটা খেয়াল হয়।

এই সবের মাঝেও বারবারাকে ফোন করার কথাটা মাথায় রয়েছে। ওদের পুরোনো জিনিসপত্রগুলো ফেলে দেওয়ার ব্যাপারে মতামত নেওয়ার ছুতো করেই ফোনটা করলাম। আমাকে অবাক করে বারবারা বললেন কয়েকদিন পরে টিচার্স কনফারেন্সে হার্টফোর্ডে আসছেন। আমার আপত্তি না থাকলে একবার এ বাড়িতে আসবেন। জিনিসপত্র ফেরত নেওয়ার জন্যে নয়। সেদিন আমার কিছু কথা ছিল বলেছিলাম তাই। বাড়ি যখন বিক্রিই হয়ে গেছে, বারবারা বললেন এবার আমরা নিজেদের মধ্যে বসে হয়তো সেকথা বলতে পারি।

হার্টফোর্ডের কনফারেন্স থেকে বারবারা এসে পৌঁছালেন বিকেলের দিকে। ঘণ্টাখানেক পরে আবার হোটেলে ফিরে যাবেন। তখনও বাইরে উজ্জ্বল রোদ। আমি আর দিয়া ওঁকে নিয়ে পেছনের কাচ-ঘেরা বারান্দায় বসলাম। জানলা খুলে দিয়েছি। বারবারা অন্যমনস্কভাবে বাগানের দিকে চেয়ে আছেন। বাড়িটা একবার ঘুরে দেখতে ইচ্ছে করে কিনা জিজ্ঞেস করেছিলাম। উত্তর দেননি।

হঠাৎ নিজেই কথা শুরু করলেন—"সেদিন কী জানতে চেয়েছিলেন আমার কাছে?"

—"বারবারা, খুব শখ করে বাড়িটা কিনেছিলাম। ভাবিনি এরকম এক্সপেরিয়েন্স হবে। আপনাকে বলতে খারাপ লাগছে, আমরা কয়েকবার খুব ভয় পেয়েছি। দিয়ার ধারণা এ বাড়িতে স্পিরিট আছে।"

বারবারা দিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন—"ঠিক কী দেখেছিলে মনে আছে?"

দিয়া ওর দু'রাতের অভিজ্ঞতার কথা বলল। আমিও যা দেখেছি, বিশেষ করে বরফের রাতে দোতলার ঘরে মুহূর্তের জন্যে দেখা দুঃখী মেয়েটির মুখ, চাদরে জড়ানো বাচ্চাটির কথা বললাম।

বারবারা আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন। এত যে কথা বলছি, তার প্রতিক্রিয়া নেই। খানিক চুপ করে থেকে বললাম—"হয়তো অবিশ্বাস করছেন। কিন্তু আমার একটাই প্রশ্ন। এ বাড়ি কেন এতদিন বিক্রি হয়নি? কেনই-বা ভাড়াটেরা অল্পদিন পরে মুভ্ করে যেত? আমাদের প্রতিবেশী অ্যাম্যান্ডারও ধারণা এ বাড়িতে হয়তো কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছিল।"

বারবারা ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন—"হয়তো নয়। সত্যিই ঘটেছিল। রবের মা আর ছোট্ট বোন এক সঙ্গে মারা গিয়েছিল। কার্বন মনোক্সাইড পয়সনিং।"

দিয়া চমকে উঠেছে—"কোথায়? গাড়ির ভেতর?"

—"বন্ধ গ্যারাজে গাড়ির ইঞ্জিন চালিয়ে রেখে উনি স্টিয়ারিং হুইলের পেছনে বসেছিলেন। পাশের সিটে ঘুমন্ত ছ'মাসের মেয়ে। সারারাত ওখানে ওইভাবেই।"

—"কী ভয়ংকর ব্যাপার! অত রাতে উনি গাড়িতে উঠেছিলেন কেন? গ্যারাজ খোলেননি কেন?"

বারবারা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন—"মরতে চেয়েছিলেন বলে। আত্মহত্যার-এর চেয়ে সহজ উপায় আর খুঁজে পাননি।"

আমরা স্তব্ধ। এভাবে একরাতে দুটো জীবন শেষ হয়ে গিয়েছিল? কেন? ছবিতে দেখা সেই হাসিমুখ যুবতী মা, তার এত দুঃখ ছিল? কত যন্ত্রণায় মানুষ নিজের সন্তানকে পর্যন্ত বাঁচতে দেয় না!

দিয়া জিজ্ঞেস করল—"বাড়িতে তখন কেউ ছিল না? ওঁর হ্যাজবেন্ড কোথায় ছিলেন?"

—"বাচ্চার ন্যানী সিনথিয়া তার ঘরে শুয়েছিল। ওর ঘরের জানলা খোলা ছিল, তাই বেঁচে গেছে। বাড়ির ভেতর থেকে গ্যারাজে যাওয়ার দরজাও লক করা ছিল। সিনথিয়াই সকালে উঠে মীরা আর বাচ্চাকে দেখতে না পেয়ে বাইরে ছুটে গিয়েছিল। গ্যারাজ খুলতে না পেরে পুলিশ ডেকেছিল।"

—"আপনার হাজবেন্ড, ওঁর বাবা, ওঁরা সেদিন কোথায় ছিলেন?"

—"রব সে বছর কলেজে গেছে। ডেভ পড়ছিল রেসিডেনশিয়াল স্কুলে। মীরার খুব মেয়ের শখ ছিল বলে ওঁরা অনেকদিন পরে ক্যালক্যাটা থেকে ট্রিনাকে অ্যাডপ্ট করেছিলেন। সে জন্যে মীরাকে কয়েকমাস ইন্ডিয়ায় গিয়ে থাকতে হয়েছিল। তখনই প্রবলেম শুরু হল।"

—"কিসের প্রবেলম?"

বারবারা ম্লান হাসলেন—"বিমান মীরাকে চিট করলেন। বাইশ বছরের বিশ্বাসের সম্পর্ক ভেঙে গেল।"

কৌতূহল দেখাব না ভেবে আমরা চুপ করে আছি। বারবারা বলতে লাগলেন—"মীরা যখন ক্যালক্যাটায় যাচ্ছেন, বাংলাদেশ থেকে কীভাবে ভিসা পেয়ে বিমানের এক দূর সম্পর্কের বোনের মেয়ে এখানে চলে এল। বয়স বোধহয় ত্রিশেরও কম। মীরার আপত্তি বুঝেও সে এ বাড়িতে থেকে গেল। ক্রমশ বিমান যে কীভাবে তার সঙ্গে ইনভল্‌ভ্‌ড হয়ে গেলেন। ছেলেরা তো বাড়িতে থাকত না। ঠিক ভাবতেও পারেনি। তিনমাস বাদে মীরা যখন ফিরে এলেন, ঘটনা তখন আয়ত্তের বাইরে। মেয়েটি অন্য অ্যাপার্টমেন্টে মুভ করে গেল। কিন্তু রিলেশনশিপ এমন অবস্থায় পৌঁছল যে, মীরা ডিভোর্স চাইলেন। বিমান যেদিন মেয়েটির অ্যাপার্টমেন্টে মুভ করে গেলেন, তার দু'দিন পরে মীরা আত্মহত্যা করলেন। তারপর থেকে ওরা কেউ এ বাড়িতে থাকেনি।"

কল্যাণ অফিস থেকে ফিরে এসেছে। বারবারা ঘড়ি দেখলেন—"এবার উঠে পড়ি। হোটেলে ফিরতে সময় লাগবে।"

—"একটা কথা জিজ্ঞেস করব? ওই ঘটনার পরে ছেলেদের সঙ্গে বিমান রায়ের সম্পর্ক কেমন ছিল?"

—"অদ্ভুত ব্যাপার। মীরা যাওয়ার এক বছরের মধ্যে বিমানের সঙ্গে মেয়েটির সম্পর্ক ভেঙে গেল। বাকি জীবনটা একাই কাটালেন। ছেলেদের সঙ্গে রিলেশন অবশ্য কোনোদিনই আর সহজ হয়নি। তবু, ওঁর কর্তব্য উনি করেছেন। ছেলেরাও মোটামুটি যোগাযোগ রাখে।"

গাছপালার আড়ালে সূর্য অস্ত গেছে। আকাশে শেষবেলার মায়াময় আলো। সবাই বাইরে এসে দাঁড়ালাম। বারবারা চলে গেলেন।

আমাদের যাবার সময় হয়ে এল। যুক্তি, ভয়, বিশ্বাস, অবিশ্বাসের টানাপোড়েনে বিভ্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত যে ভুল করিনি, এ কথাই মনকে বোঝাই। রাতে শুয়ে শুয়ে বারবারার কথাগুলো মনে পড়ে। এক রাতে ঘুম ভেঙে দেখি দিয়ার ঘর থেকে আলো আসছে।

দিয়া ঘরে নেই। নীচে এলাম। দিয়া কোথাও নেই। ভয় পেয়ে কল্যাণকে ডাকছি। বেসমেন্ট থেকে দিয়া ছুটে এল।

—"কোথায় গিয়েছিলি? এত রাতে নীচে এসেছিলি কেন?"

—"গ্যারাজে একটা আওয়াজ হল। তোমাদের ডাকিনি। গিয়ে দেখি গ্যারাজের দরজা খোলা। ড্যাডের গাড়ির এঞ্জিন চলছে! ড্যাড, তুমি ইগ্‌নিশন কি খুলে নাওনি! এই দ্যাখো চাবিটা।"

কল্যাণ স্তম্ভিত—"এরকম ভুল করলাম কী করে? এঞ্জিন অন করে চলে এসেছিলাম? গ্যারাজ থেকে ভেতরে আসার দরজাটা ভাগ্যিস বন্ধ ছিল।"

আমি বললাম—"বাড়ি বদলের মুখে যা খাটুনি যাচ্ছে। একদিন ছুটি নিলে না। মাথায় সতেরো চিন্তা। ভুল হতেই পারে। কিন্তু শীতকাল হলে কী হতে পারত ভাবো! বন্ধ বাড়িতে কার্বন মনোকসাইড ঢুকে যেতো..."

কল্যাণের সন্দেহ যাচ্ছে না—"কিন্তু গ্যারাজ যে বন্ধ করেছিলাম পরিষ্কার মনে আছে। গারবেজ ক্যানটা গ্যারাজের দরজার মুখে ছিল। সেটাকে সরিয়ে গ্যারেজ-ডোর বন্ধ করলাম। আশ্চর্য! মাঝরাতে সেটা খুলে গেল কী করে? শব্দটা না পেলে তো দিয়ার ঘুমও ভাঙত না।"

আমি, দিয়া, কেউ উত্তর দিলাম না। যুক্তি দিয়ে জীবনের সব ঘটনার ব্যাখ্যা খুঁজতে নেই।

এ জন্মের ভূমিকার খোঁজে

অ্যারিজোনা স্টেট প্রিজনের বিশাল বাড়িটার পাঁচ তলায় ম্যাক্সিমাম সিকিওরিটি ওয়ার্ড। প্রিজনগার্ডের সঙ্গে রাকা আবার ওর ছোট্ট সেল-এ ফিরে এল। মাঝে তিনদিন জেল হাসপাতালে ছিল। গল্ ব্লাডার অপারেশন হল। রোগ যন্ত্রণার মাঝেও তবু একটু পরিবেশ বদল। সেবা, সুশ্রুষা, ডাক্তার, নার্স, অন্যরকম মানুষজনের সংস্পর্শে আসা।

আজ থেকে আবার সেই নিঃসঙ্গ বিষণ্ণ পরিবেশ। মরুভূমির রাজ্যে পাথরের জেলখানার বন্ধ ঘরে রাকার জীবনের চোদ্দটা বছর কেটে গেল। মাঝে মাঝে সময়ের হিসেব হারিয়ে যায়। কখন দিন আসে, কোথা দিয়ে রাত যায়। আলো অন্ধকারের ব্যবধান তার চেতনায় ধরা পড়েনা। হঠাৎ জেলের ঘন্টার শব্দ কানে আসে। মাথার ভেতর বিশৃঙ্খল ভাবনার জাল ছিঁড়ে গেলে রাকা যেন সেই শব্দের মধ্যে শুনতে পায়—সময় বেশী নেই। ভাবতে চেষ্টা করে তার কোন্ সময় ফুরিয়ে আসছে। পনের বছরের শাস্তির মেয়াদ শেষ হতে আর কয়েক মাস বাকি। জেলখানার ঘন্টাঘড়ি প্রহরে প্রহরে কি সেই সংকেত দিয়ে যায়? কখনও মনে হয় ঐ ধাতব শব্দ তার অবচেতনে আঘাত করে জানায় তার অর্ধেক জীবন পার হয়ে গেছে। এ জন্মের ভুল, ভ্রান্তি, চূড়ান্ত অপচয়ের শেষে নতুন সংকল্প নিয়ে বেঁচে থাকার মতো সময়ও তার ফুরিয়ে আসছে। এই সব রাতে রাকা ভূতগ্রস্তের মতো বিছানায় উঠে বসে। কখনও ঘরের দরজায় গিয়ে ধাক্কা দেয়। করিডোর থেকে নাইট গার্ডের চীৎকার ভেসে আসে—"হোয়াট হ্যাপেন্ড্? গো ব্যাক টু স্লীপ্।" রাকার হুঁশ ফেরে। বাধ্য মেয়ের মতো বিছানায় ফিরে যায়। বছরের পর বছর কত রাত এমন অস্থিরতার ঘোরে কেটে গেছে।

আজ হাসপাতাল থেকে ফিরে শরীর ক্লান্ত। হাঁটতে চলতে পেটে ব্যথা লাগছে। রাকাকে আজ আর ডাইনিং হল্-এ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কয়েদিদের লাঞ্চের ট্রে সাজাতে হয়নি। ভারী ভারী বাসন মাজতে হয়নি। জেল হাসপাতালের ডাক্তারের কথামতো এ সপ্তাহটা ওকে ভারী কাজকর্ম করতে হবে না। শুধু কাল থেকে লন্ড্রি আর লিনেন রুমে গিয়ে ধোয়া কাপড়-চোপড় আর বিছানার চাদর-টাদর জেলের ব্লক্ নাম্বার অনুযায়ী গুছিয়ে দিতে হবে।

রাকার ঘুমঘুম পাচ্ছিল। পেটে চিন্‌চিনে ব্যথা। গার্ডকে ডেকে পেইন কিলার চাইলে হয়। সেও কতক্ষণে পাবে কে জানে? গার্ড ফোন করবে ওয়ার্ডেন্‌কে। তিনি খবর দেবেন নার্সের অফিসে। তারপর সেখান থেকে কেউ এসে দুটো বড়ি ধরিয়ে দিয়ে যাবে। কয়েদিদের শরীরের কষ্টের কথা ওয়ার্ডেন্‌রা কানেই নিতে চায় না । অপারেশনের আগে রাকা গল্ ব্ল্যাডারের ব্যথায় মাঝে মাঝেই কষ্ট পাচ্ছিল। যেদিন ওষুধের অপেক্ষায় থেকে থেকে যন্ত্রণায় প্রায় অজ্ঞান হবার অবস্থা, সেদিন গার্ডের হুঁশ হল। ধরাধরি করে নীচে নার্সের অফিসে নিয়ে যেতে জেলের ডাক্তার এলেন। তারপর অ্যাম্বুলেন্স, হাসপাতাল, আলট্রা-সাউন্ড কত কাণ্ড! শেষপর্যন্ত অপারেশন।

রাকা প্রিজ্‌ন গার্ডকে ডেকে পেইন কিলার চেয়ে পাঠাল। একটু পরে নার্সেস এইড ছোট ট্রে হাতে ঘরে ঢুকল। রাকার কানে থার্মোমিটার গুঁজে জ্বর পরীক্ষা করল। অপারেশনের জায়গাটা হাত দিয়ে দেখল। ব্যথার ওষুধ দিয়ে বলল—"এভ্‌রি থিং লুক্‌স ফাইন। রাতের জন্যে আরও ক'টা পিল্‌ ওয়ার্ডেনের কাছে রেখে যাচ্ছি। ব্যথা করলে চেয়ে নিও।"

রাকা জিজ্ঞেস করল—"কাল সকালে জিম্‌-এ যেতে হবে না তো? তোমরা ওয়ার্ডেনকে বলে দিয়েছ ? আমার এখন এক্সারসাইজ করা বারণ।"

—"প্যাটের কাছে ইন্‌স্ট্রাকশন দেওয়া আছে। তাও আমি বলে যাচ্ছি। তুমি রেস্ট নাও।"

সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে রাকা সুস্থ হয়ে উঠল। সেদিন শনিবার। বাইরে প্রচণ্ড গরম। বাতাসে আগুনের হল্‌কা ছুটছে। জুলাই-এর মাঝামাঝি এ সময়টা প্রায়দিনই একশো বারো-চোদ্দ ডিগ্রি করে টেম্‌পারেচর থাকে। এত গরমে কয়েদিদের দুপুরবেলার বাগানের কাজকর্ম বন্ধ। জেলের ওয়ার্ডগুলো রং করা হচ্ছে। রিপেয়ার চলছে। ফিমেল ব্লকে কন্ট্র্যাক্‌টরের লোকের সঙ্গে মেয়ে কয়েদিরাও কাজ করছে।

রাকা সারি সারি লোহার গরাদ দেওয়া ঘরগুলোর দরজায় নতুন করে সেল্‌ নম্বর লিখছিল। মই-এর ওপর দাঁড়িয়ে করিডোরের সিলিং রং করতে করতে বাইশ নম্বর সেল-এর গ্লোরিয়া বলে উঠল—"যীসেস্‌! সকাল থেকে শুধু সিলিং রং করে যাচ্ছি। ঘাড় ব্যথা হয়ে গেল।"

রাকা হাসল—"খাঁচার মধ্যে, ছাদের নীচে আমরা থাকি। করিডোরে রং করার মতো দেওয়াল নেই!"

মাথার সাদা রুমালটা খুলে ফেলে ক্লান্ত গলায় গ্লোরিয়া বলল—"লাইক অ্যানিম্যাল হাউস। দুপাশে দ্যাখো। শুধু লোহার খাঁচা।"

কাজের শেষে নিজের সেল্‌-এ ফিরে রাকা ডায়েরি নিয়ে বসেছিল। মাথার মধ্যে গ্লোরিয়ার কথাটা ঘুরছে। ওর লাইফ-ইম্‌প্রিজন্‌মেন্টের বারো বছর পার হয়েছে । বাকি জীবনটাও লোহার খাঁচায় কেটে যাবে। নিজের তিনটে বাচ্চাকে বাথটবে ডুবিয়ে মেরেছে। গ্লোরিয়া বলে ওর মাথায় তখন শয়তান ভর করেছিল। শয়তান ঈশ্বরের গলায় কথা বলত। গ্লোরিয়ার স্বামী ওর জন্যে কোনও উকিল দেয়নি। কোর্ট থেকে ডিফেন্সের উকিল দিয়েছিল। তাঁরা ওকে স্কিৎসোফ্রিনিক্‌ রুগী বলে সন্তান হত্যার দায় থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলেন। শেষপর্যন্ত জুরির বিচারে প্রাণদণ্ড না হয়ে যাবৎজীবন জেল হল। গ্লোরিয়া যে স্বাভাবিক নয়, মাঝে মাঝে ওর অসংলগ্ন কথাবার্তায় বোঝা যায়। অনেক বছর জেলের সাইকিয়েট্রিক্‌ চিকিৎসায় আছে।

ঘরে তালা খোলার আওয়াজের সঙ্গে প্রিজন গার্ডের গলা শোনা গেল— "অফিস সুপার ডেকেছেন। ভিজিটর্স রুমে চল।"

রাকা উঠে দাঁড়াল—"কেউ দেখা করতে এসেছে? সুপার কিছু বলেছেন?"

বিশাল চেহারার কালো মেয়েটি নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল— "আমি জানি না। কেউ এসেছে হয়তো। নীচে চলো।"

ওরা সেল্‌-এর বাইরে এল। এক বছর আগে হলে রাকাকে হ্যান্ডকাফ্‌ পরাত। পায়ে শ্যাক্‌ল থাকত। সেল্‌-এর বাইরে যেতে হলে নয়তো প্রিজন ভ্যানে চড়ে কোর্টে যাবার সময় ওভাবে নিয়ে যেত। রাকা যখন মাঝেমাঝে প্রিজন্‌ক্যাম্পে গিয়েছে , সেখানে গভর্ণমেন্টের কিছু

কিছু প্রজেক্টে কাজ করার জন্যে থেকেছে ,তখনও জেল থেকে যাতায়াতের দিনে হাতে, পায়ে চেন থাকত। ইদানিং ওর ওপর পাহারার কড়াকড়ি কমে গেছে। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার সময় হয়ে এল। গত বারো-তের বছরে জেলের রেকর্ড অনুযায়ী ওর সম্পর্কে অবাধ্যতার অভিযোগ নেই। কয়েদি হিসেবে রাকা যে বিপদজনক নয়, এই শেষ বছরে জেল থেকে পালানোর চেষ্টাও করবে না, এরা সেরকমই ধরে নিয়েছে বোধহয়। আজও হ্যান্ড-কাফ, আর শ্যাকল ছাড়াই গার্ড ওকে নীচে নিয়ে গেল।

ভিজিটর্স রুমে ঢুকে রাকা দেখল মহুয়া আর কুণাল বসে আছে। মাঝে অনেকদিন দেখা হয়নি। চ্যান্ড্লার-এ থাকে। কত বছর ধরে আসা যাওয়া করছে। খোঁজ খবর নিয়ে যাচ্ছে। রাকার সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর যোগসূত্র বলতে এই দু'জন মানুষ। কলকাতায় রাকার বাড়ির লোকজনদের সঙ্গেও ওরা যোগাযোগ রেখেছে। রাকা জানে জেল থেকে ছুটি পাওয়ার দিন শুধু এই দু'জন মানুষই ওর জন্যে অপেক্ষা করবে।

রাকাকে দেখে মহুয়া হাসল—"হঠাৎ করে চলে এলাম। ভেকেশনে গিয়েছিলাম। তার ওপর বাড়িতে সমানে ইন্ডিয়ার গেস্ট।...."

রাকা বলল—"জানি। সামারে তোমরা খুব ব্যস্ত থাকো। কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলে এবার?"

কুণাল বলল—"অ্যালাস্কা ক্রুজে গিয়েছিলাম। ফিরে এসেই দাদার মেয়ে জামাইকে নিয়ে ক্যানিয়ন। এক সপ্তাহে মধ্যে গ্লেশিয়ার থেকে মরুভূমি। এনি ওয়ে, তোমার খবর বলো। ইমিগ্রেশন লইয়ারের অফিস থেকে কেউ কন্ট্যাকট্ করেছিল?"

—"হ্যাঁ। আমি তখন হসপিট্যালে। পরে মেসেজ্ পেলাম। মাঝে একটা সার্জারি হল।"

মহুয়া জিজ্ঞেস করল—"কবে হল? কিসের অপারেশন? আমাদের জানাওনি তো?"

—"সে রকম সিরিয়াস কিছু নয়। পেটে ব্যথা হচ্ছিল; এরা জেল হসপিট্যালে পাঠাল। গল ব্লাডার সার্জারি হল। এখন ভালো আছি।"

কুণাল জানতে চাইল—"তোমার ডিপোর্টেশন অর্ডারের ব্যাপারে অ্যাপিল্ করার কেস্টা নিয়ে কথাবার্তা কিছু এগিয়েছে?"

—"আমি আর সেটা চাইছি না কুণালদা। প্রথমতঃ অ্যাপিল্ করে কোনো লাভ হবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া, আমার আমেরিকায় থাকার কোনো ইচ্ছে নেই। উপায় থাকলে কবে দেশে ফিরে যেতাম।"

—"কিন্তু একটা পথ খোলার চেষ্টা করবে না? তোমার ছেলে ইউ.এস. সিটিজেন। সে যদি এদেশে থাকতে চায়? তোমার ডিপোর্টেশন হলে আর কখনও ফিরে আসতে পারবে না রাকা।"

—"ছেলেকে আমি চোদ্দ বছর দেখিনি। দু' মাসের ছেলেকে নিয়ে মা দেশে চলে গিয়েছেন। সে কী চায় না চায় কিছুই জানি না। আমার তো আগে তার কাছেই যাওয়া দরকার?"

ঘরের আবহাওয়া হঠাৎ ভারী হয়ে এল। মহুয়া কিছু বলার চেষ্টা করছিল। দরজার কাছ থেকে প্রিজন গার্ড ওয়াকি টকি কানে বলে উঠল—"আর আর্ধঘণ্টা পরে ডিনার টাইম। তোমরা আর কুড়ি মিনিট থাকতে পারো।"

কুণাল কথা শুরু করল—"তোমার রিলিজ্-এর তারিখ জানার পরেই আমাদের ফোন কোরো। আমাদের কাছে কতদিন থাকতে পারবে, কবে ইন্ডিয়া যেতে চাও, সব কিছু ডিসিশন নিয়ে জানিও।"

মহুয়া জিজ্ঞেস করল—"মাসিমাকে কিছু জানাতে হবে? তাহলে কাল ফোন করে বলে দেব। তোমার সার্জারির কথা কি জানেন?"

রাকা মাথা নাড়ালো—"না, মাকে কিছু লিখিনি। তবে এখন বলে দিতে পার। আর একটা কথা জিজ্ঞেস কোরো তো, আমার চিঠিপত্র পাচ্ছেন কিনা। আমি কিন্তু অনেকদিন কোনো খবর পাচ্ছি না।"

মহুয়া যাবার আগে ব্যাগ থেকে একটা প্ল্যাস্টিকের প্যাকেট বার করল। প্রিজন গার্ডকে সেটা দেখিয়ে বলল—"গেট্-এ চেক্ করেছে। ইন্ডিয়ান ক্যান্ডি। রাকা ওর ঘরে নিয়ে যাবে।"

গার্ড এসে প্যাকেটটা খুলে দেখাতে বলল। কয়েকটা সন্দেশ আর বরফির মতো মিষ্টি এনেছে মহুয়া। যখন আসে শুকনো খাবার-দাবার সঙ্গে আনে। একবার জিজ্ঞেস করেছিল—"একটু ডাল, ভাত, মাছ করে আনব রাকা? খেতে ইচ্ছে করে না? যদি করে আনি, তোমাকে ডাইনিং রুমে বসে খেতে অ্যালাও করবে?"

রাকা বলেছিল—"তুমি দেখছি আমার মার মতো কথা বলছ। মা মাঝে মাঝে চিঠিতে লেখেন জেল্-এ তোমাকে কি ইন্ডিয়ান রান্না দিতে পারে না? তুমি ওদের বলে দ্যাখোনা কেন?"

মহুয়া সায় দিয়েছিল—"সত্যি তো। তুমি স্পেশ্যাল মিল্-এর জন্যে সুপারকে বলতে পারো। দিনের পর দিন একঘেয়ে রুটি, পাস্তা আর বিস্বাদ মাংস খেয়ে যাচ্ছ।"

—"জীবনটাই বিস্বাদ হয়ে গেল। তুচ্ছ খাওয়া-দাওয়া নিয়ে কে মাথা ঘামায়? তোমায় কিছু রেঁধে আনতে হবে না।"

আজ ওরা চলে যাবার পর রাকা কয়েদিদের সঙ্গে লাইনে দাঁড়াল। ডিনারের ঘন্টা বাজছে। বাইরে তখনও বিকেলের রোদ। অন্ধকার হতে হতে রাত নটা বেজে যাবে।

খেতে বসে রাকা ম্যাক্যারনি আর চেডার চীজের গলাগলা মণ্ডটা কাঁটা দিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। লম্বা বেন্চে পাশাপাশি বসে ইন্মেটরা গল্প জুড়েছে। ডিনারের সময়টা নিজেদের মধ্যে সুখ দুঃখের কথা হয়। রাকাকে অন্যমনস্ক দেখে ইমেলডা জিজ্ঞেস করল—"কী ব্যাপার? এত ডেলিশাস্ ডিশ নিয়ে চুপচাপ বসে আছো? খেয়ে ফ্যালো।"

টেবিলের ওপাশ থেকে ভিকি হেসে উঠল—"র‍্যাকা শুধু হটডগ কামড়াতে ভালোবাসে।" পুরুষাঙ্গ নিয়ে ওর বিশ্রী যৌন ইঙ্গিতে দুটো মেয়ে হাসতে লাগল।

এ সব নোংরা রসিকতা রাকার গা সওয়া হয়ে গেছে। জেল্-এ আসার পর প্রথম প্রথম মেয়ে কয়েদিদের অনেক আকার ইঙ্গিত বুঝতে পারত না। বোঝার পর রাগ উঠে যেত। পুরুষালি ধরনের একটা মেয়ে বিশ্রীভাবে জড়িয়ে ধরত। ভয়, ঘেন্না, অস্বস্তিতে রাকা ওদের সঙ্গ এড়ানোর চেষ্টা করত। কিন্তু এ পরিবেশ থেকে তো মুক্তি নেই। শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কার যেমনই হোক, আইনের চোখে রাকা এই ভংয়কর অপরাধীদেরই একজন। এদের সঙ্গে তাকে বছরের পর বছর কাটাতে হবে। এই রূঢ় সত্য তাকে বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে ধীরে ধীরে

মানিয়ে নিতে শিখিয়েছে। মাঝেমাঝে রাকার ভয় হয় আপস করতে করতে ওর রুচিবোধ হারিয়ে যাচ্ছে। মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো ক্রমশ ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে। আজ এই মুহূর্তেও ভিকির অশ্লীল রসিকতায় ওর তো আগের মতো প্রতিক্রিয়া হল না। শুধু প্রসঙ্গ ঘোরানোর চেষ্টায় ইমেল্‌ডাকে বলল—"আসলে একটু চিন্তায় আছি। আমার মার চিঠি পাচ্ছি না। বয়েস হয়ে গেছে । কী জানি সুস্থ আছেন কিনা?"

ইমেল্‌ডা জিজ্ঞেস করলো—"কত বয়স তোমার মার?"

—"পঁয়ষট্টি বছর। এমনিতে শরীর স্বাস্থ্য খারাপ নয়। তবে এত দূরে থেকে ঠিক বুঝতে ও তো পারি না।"

—"চিন্তা কোরো না। সিক্স্‌টি ফাইভ্ কোনো বয়সই নয়। হয়তো মেইল্-এর গোলমালে চিঠি হারিয়েছে। কাল একবার অফিসে খোঁজ নিও।"

পরদিন অফিসে খোঁজ নেওয়ার আগেই রাকা মার চিঠি পেল। পরপর দু'খানা চিঠি একসঙ্গে এসেছে। এছাড়া দুটো বাংলা ম্যাগাজিন। চিঠিগুলো রাকা সরাসরি হাতে পায় না। জেল্ থেকে আগে চিঠিপত্র খুলে দ্যাখে। একটা এজেন্সি থেকে নানা ভাষার ট্র্যানস্লেটর পাঠায়। তারা চিঠি পড়ে সন্দেহজনক কিছু পেলে সুপারকে জানায়। ঐ এজেন্সি থেকেই বাংলাদেশি মহিলা নাসরিন হক মাঝে মাঝে আসেন। বাংলাদেশি কয়েদিদের ইংরিজি বলার অসুবিধে হলে অনুবাদ করে দেন। বাইরে থেকে আসা বাংলা চিঠিপত্র আর কয়েদিদের লেখা চিঠিও নাসরিনকে পড়ে দেখতে হয়। তবে নিয়মিত নয়। বছরে একজন কয়েদির হয়তো দুটো চিঠি সেন্‌সর্ড্ হল। এখানে আপাতত রাকা ছাড়া বাঙালি মেয়ে কেউ নেই। ওর দোভাষীরও দরকার হয় না। শুধু মাঝেমাঝে ওর চিঠিপত্র পরীক্ষার জন্যে জেল থেকে নাসরিনকে ডেকে পাঠায়। একটা অদ্ভুত ব্যাপার রাকা লক্ষ্য করেছে। আজকাল কিন্তু ওকে সময় মতো চিঠিগুলো দেওয়া হয় না। তাছাড়া নাসরিনকে দিয়ে সব চিঠিই পড়ানো হচ্ছে। কে জানে কী কারণ? জেল থেকে বেরিয়ে রাকা কোথায় যাবে, কী করবে, সে সম্পর্কে আগে থেকে খবর নেওয়ার জন্যে হয়তো চিঠিগুলো পরীক্ষা করা হচ্ছে।

মার চিঠি পেয়ে রাকার একটু স্বস্তি হল। অসুখ বিসুখ কিছু করেনি। নতুন ফ্ল্যাটে কাজকর্ম শেষ হতে দেরী হচ্ছিল। এতদিনে মা গুছিয়ে বসতে পেরেছেন। দাদারাও এসে গেছে। গৃহ প্রবেশের পুজোটুজো হয়ে গেল। পুরোনো ফার্নিচার দাদা কিছু নিয়েছে। বাদবাকি জিনিস মার ফ্ল্যাটে ঢুকেছে। একটা চিঠিতে শুধু ফেলে দেওয়া জিনিসপত্রের জন্যে হা-হুতাশ। রাকার হারমোনিয়াম আর পুরোনো রেকর্ড প্লেয়ার কাবাড়িওলা এসে বিনে পয়সায় নিয়ে গেছে। বউদির শুধু রূপোর বাসনের ওপর নজর। কাঁসার বাসনের বাক্স, স্টেনলেস্ স্টিল সব মার ফ্ল্যাটে ঢুকিয়ে দিয়েছে। মার চিঠি পড়তে পড়তে রাকার ওদের পুরোনো বাড়িটা মনে পড়ছিল। খুব ছোটবেলায় যখন ওদের জয়েন্ট ফ্যামিলি ছিল, একতলায় বিরাট খাবার ঘরে মাটিতে বসে খাওয়া হত। গোল গোল কাঁসার থালায় ভাইবোনেদের নাম লেখা। ভাতের ছোট্ট চূড়ায় গর্ত করে রাকা বলত—"ঠাকুর, ঠিক এর মধ্যে ডাল দাও তো। দাদা, দ্যাখ্ পাহাড় আর নদী বানাচ্ছি।"

ঠাকুর যদি বা গোল হাতা উল্টে কায়দা করে একটু ডাল ঢেলে দিত, দাদা তক্ষুণি খেলা নষ্ট

করে দিয়েছে। নিজের ডাল মাখা হাত দিয়ে রাকার তৈরি সাদা পাহাড়, হলুদ নদী ছড়িয়ে ছিটিয়ে একাকার। তখন দু'জনে ঝুটোপুটি ঝগড়া। খুড়তুতো বোন কেকা রেগেমেগে দাদার পিঠে গুমগুম কিল মারছে। ঠাকুর হাতা নাচিয়ে সবাইকে বকছে। ঘরের মধ্যে হুলুস্থূল। রাকার এখনও খাবার ঘরের লাল মেঝেতে পাতা সারি সারি পিঁড়ির ওপর দিয়ে ওদের দৌড়াদৌড়ি, জলের গেলাস উল্টে, ভাতের থালা ফেলে পালানোর দৃশ্যটা মনে পড়ে।

মাঝে মাঝে অতীতের ভাবনায় ডুবে গিয়ে রাকা এই ভীষণ একাকিত্ব থেকে মুক্তি খোঁজে। হারানো সময়ের ছোট ছোট ছবি, ঘটনা, সমান্তরাল চিন্তার মতো বর্তমানের সঙ্গে সহাবস্থান করে। হঠাৎ মনে হয় যদি ঐ হারানো সময়ের মধ্যে ফিরে যাওয়া যেত। যদি আর একবার নতুন করে জীবন শুরু হত। কে জানে? ভবিতব্য কি এড়ানো যায়? ঘটনাচক্রের কাছে মানুষ যে কী অসহায়, রাকা তো প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি করেছে। তবু ওর দ্বন্দ্ব শেষ হয় না। বিপরীত ভাবনার টানাপোড়েনে ক্লান্ত, ক্ষত বিক্ষত হতে থাকে।

নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে রাকা অ্যারিজোনা স্টেট প্রিজন্ থেকে ছাড়া পেল। আগের দিন ডিনারের সময় এত বছরের জেলসঙ্গীদের সাথে শেষবারের মতো দেখা হল। কেউ হাত ধরে বিদায় জানাল। ইমেলডা জড়িয়ে ধরে বলল—"এবার তোমার ভালো সময় আসবে। ইন্ডিয়ায় গিয়ে ছেলের সঙ্গে শান্তিতে থেকো।" লাইফ্ ইমপ্রিজন্‌মেন্টের কয়েদি গ্লোরিয়া দরজার কাছ থেকে বলে উঠল—"আমি তোমাকে মিস্ করবো। তবু চাই না এখানে আবার আমাদের দেখা হোক।" রাকা কোনো কথা খুঁজে পেল না।

কতকাল পরে রাকা জেলের বাইরে খোলা মাঠে এসে দাঁড়াল। গায়ে কমলা রঙের পোশাক নেই। হ্যান্ড কাফ্ নেই। হাতে কয়েদির নম্বর লেখা রিস্টব্যান্ড নেই। মহুয়া দূর থেকে দেখছিল ওর কিনে দেওয়া নতুন জামাকাপড় পরে রাকা মাঠ পার হয়ে আসছে। হাতে জিনিসপত্র ভর্তি প্ল্যাস্টিকের ব্যাগ। মাথার চুল অর্ধেক সাদা হয়ে গেছে। ক্লান্ত শ্রী-হীন চেহারা।

রাকা মাথা তুলে আকাশ দেখছিল। সকালের উজ্জ্বল সোনালী রোদ, স্নিগ্ধ হাওয়ার স্পর্শ শরীর দিয়ে অনুভব করছিল। মহুয়া কাছে এসে ডাকল—" চলো তোমার জিনিসপত্র গাড়িতে তুলে নিই।"

মহুয়াদের বাড়িতে এসে রাকার সব কিছুই নতুন লাগছে। রাকার সঙ্গে যখন ওদের প্রথম আলাপ, তখন ওরা কাছাকাছি অ্যাপার্টমেন্টে থাকত। কুণাল পোস্ট ডক্টরেট করছিল। ওদের মেয়ে তখন খুব ছোট। ফিনিক্সের ধারে কাছে সে সময় যে ক'টা বাঙালি ফ্যামিলি ছিল, তাদের মধ্যে কুণাল, মহুয়াদের সঙ্গে রাকার বেশ বন্ধুত্ব হয়েছিল। তবু কত দিনেরই বা দেখাশোনা। তারই জের টেনে এরা আজও সম্পর্ক ধরে রেখেছে। রাকার জীবনের চরম মুহূর্তে, বিষাদাচ্ছন্ন অর্ধউন্মাদ অবস্থায় এরা আপনজনের মতো পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। আর ছিলেন পূর্ণেন্দুদা, গৌরীদি। সেই ভয়ংকর রাতে প্রলয় বৃষ্টির মধ্যে রাকা পাগলের মতো মহুয়া কুণালদের অ্যাপার্টমেন্টে ছুটে গিয়েছিল। ওদের বাড়িতে না পেয়ে ফিরে এসে পূর্ণেন্দুদাকে ফোন করেছিল। তারপর পুলিস স্টেশন আর অ্যাম্বুলেন্সে।

গৌরীদিরা কয়েক বছর আগেও জেল্-এ দেখা করতে যেতেন। তারপর ফ্লোরিডায় চলে গেলেন। রাকা অনেকদিন ওদের খবর পায় না।

জেল থেকে এ বাড়িতে আসার পর কলকাতা থেকে রাকার দাদা রজতের ফোন এল।

যেন মাঝের এতগুলো বছর খুব স্বাভাবিক নিয়মে কেটে গেছে, এমন সহজভাবে দাদা জানতে চাইল—"কেমন আছিস তুই? শরীর ঠিক আছে?"

রাকা সহজ হতে পারছিল না। হাজার হাজার মাইল থেকে ভেসে আসা একটি কণ্ঠস্বর শুনে তার দীর্ঘদিনের অবরুদ্ধ আবেগ যেন শতধা হোয়ে ভেঙ্গে পড়ছিল। রাকা নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করছিল। দাদা তখনও বলে যাচ্ছে—"কবে আসবি তাড়াতাড়ি ডিসাইড কর। এখান থেকে ওয়ান-ওয়ে টিকিট পাঠাব।"

ফোন রাখার পর রাকা রান্নাঘরে মহুয়ার কাছে গেল। একটু ইতস্তত করে বলল—"দাদা ফোনটা রেখে দিল। মহুয়া, আমি কি একবার ফোন্ করবো? আমার ছেলের খবর তো কিছু পেলাম না। ভেবেছিলাম ওর সঙ্গে একটু কথা বলবো...।"

মহুয়া চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে রিসিভার নিয়ে এল—"এখনই কল্ করো। প্লিজ, ফোন বিল্ টিল্ নিয়ে একদম ভাববে না। আমাদের সঙ্গে কি তোমার ভদ্রতার সম্পর্ক?"

রাকা লজ্জা পেল—"না, না। আমি এমনিই তোমাকে বলছিলাম। জানি তো, এখন অনেক জায়গায় ফোন্ টোন্ করতে হবে। আসলে কলকাতায় কিভাবে ডায়াল্ করব, সেটাও তো জানি না। দাদা বলছিল কোথায় কী টু নাম্বার যোগ করতে হবে....।"

মহুয়া রাকার কথামতো ওর মার ফ্ল্যাটে ফোন করল। কেউ ধরছে না। অনেকক্ষণ বেজে যাবার পর আবার দাদার নম্বরে চেষ্টা করতে রাকার বউদি নন্দিতা ফোন ধরল। রাকা এবার বেশ সহজভাবে কথাবার্তা বলল। মার ফ্ল্যাটে কেউ ফোন ধরছে না শুনে নন্দিতা বলল—"উনি দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিতে গেছেন। তুমি ঘণ্টা দুই বাদে ফোন করতে পারো। তোমাদের ওখানে এখন ক'টা বাজে?"

রাকার আর ধৈর্য থাকছে না। ও সরাসরি জিজ্ঞেস করল—"রণজয় কোথায় বউদি? ওকে একটু ডেকে দেবেন?"

নন্দিতা যেন অবাক হল—"রণো? ও তো এখানে নেই!"

—"কোথায় গেছে? মার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে?"

কয়েক মুহূর্ত থেমে থেকে নন্দিতা উত্তর দিল—"না। রণো আর এখানে থাকে না রাকা। তুমি কিছু জানো না? মা তোমায় লেখেননি?"

রাকার গলার স্বর কাঁপছিল।—"না তো। আমি কিছু বুঝতে পারছি না বউদি। রণো কোথায় গেছে? তোমরা ওকে আমার ছাড়া পাওয়ার কথা বলোনি? ও তো জানে আমি ফিরে আসছি? এ সময় কোথায় কার কাছে চলে গেল?"

—"শোনো রাকা, আমার কথা শোনো। রণো ভালো আছে। দিল্লিতে পড়ছে। আমরাই কয়েকমাস আগে ওকে বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করে এসেছি। ভেবেছিলাম মা তোমাকে চিঠিতে জানিয়েছেন।"

রাকার বুক থেকে ভয়ের পাথর নেমে গেল। মার আর দাদার ওপর এত বছর ভরসা করে আছে। তবু হঠাৎ বউদির কথা শুনে ওর মনে হয়েছিল রণোকে ওরা বোধহয় বাড়ি থেকে সরিয়ে দিয়েছে। নাকি-জন্মদুর্ভাগা ছেলেটা নিজের খেয়ালেই কোথাও চলে গেছে? ভীষণ ভয় পেয়েছিল রাকা। পরে বউদির কথা শুনে একটু স্বস্তি পেলেও উৎকণ্ঠা দূর হল না। কেন হঠাৎ

ওরা রণোকে হস্টেলে দিল? মাও কি আর দায়িত্ব নিতে চাইছেন না? কিন্তু রাকা তো ফিরে যাচ্ছে! এত দূর থেকে রাকা ঠিক পরিস্থিতিটা বুঝে উঠতে পারছে না।

রাতে রাকার ভালো ঘুম হয় না। জেল্-এ থাকতেও কোনো রাতে ছেঁড়াছেঁড়া ঘুম, কোনো রাত পুরোপুরি জেগেই কেটে যেত। আবার পরপর রাত জাগার ক্লান্তিতে দু-চার দিন হয়তো ভালোই ঘুম হত। এখন আবার ইন্‌সমনিয়ার মতো হচ্ছে। ভেবেছিল মহুয়ার কাছে কোনো ঘুমের ওষুধ আছে কিনা জিজ্ঞেস করবে। শোয়ার আগে খেয়াল হল না।

রাতে শুয়ে শুয়ে রণোর কথা ভাবছিল রাকা। জন্ম থেকে যাকে জীবনযুদ্ধের মুখোমুখি হতে হবে, তার উপযুক্ত নামই দিয়ে ছিলেন পূর্ণেন্দুদা। জেল হাসপাতালে এসে নাম রেজিস্ট্রি করে দিয়েছিলেন—"রণজয় সেন মাধবন্।"

সেই নাম ধরে ছেলেকে কখনও ডাকাই হল না। চলমান সময়ের ঢেউ কত ঘটনার স্মৃতি ভাসিয়ে নিয়ে যায়। চেনা মানুষজনের মুখ অদর্শনে ঝাপসা হয়ে আসে। রাকাও কত কিছু ভুলে গেছে। শুধু এক অসহায় শিশুর মুখ, তার নরম শরীরের স্পর্শ, গন্ধ, বারবার রাকার রাতের ভাবনার স্রোতে ফিরে ফিরে আসে। সেই বিষণ্ণ সকালে তিন সপ্তাহের ছোট্ট ছেলেকে শেষবার বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরেছিল। আজও তার ঘুমন্ত মুখ, ক্ষণে ক্ষণে জেগে ওঠা, ক্ষীণ কান্নার শব্দ মনে পড়ে। মা যখন ছোট্ট নীল কম্বলে জড়ানো ছেলেটাকে নিয়ে চলে যাচ্ছেন, রাকা কেঁদে উঠেছিল—"মা দেখো ও যেন কোনো কষ্ট না পায়....।"

দরজার কাছ থেকে মা উত্তর দিয়েছিলেন—"ছেলের জন্যে ভাবিস না। আমরা সবাই মিলে ওকে দেখব। মন শক্ত কর্। একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে।"

তখন রাকার বাবা বেঁচে আছেন। সে সময় মাকে নিয়ে বাবাই আমেরিকায় এসেছিলেন। রাকার কেস শেষ হবার পরে জেল হাসপাতালে বাচ্চা হল। মা,বাবা যদি ওর দায়িত্ব না নিতেন, তবে স্টেট্ থেকে বাচ্চাকে ফস্টার হোমে পাঠিয়ে দিত। রাকা ছাড়া না পাওয়া পর্যন্ত ছেলেটা অচেনা অজানা আমেরিকান পরিবারে আশ্রয় পেত। হয়তো একটা বাড়িতেও বেশিদিন থাকত না। চোদ্দ বছর একটানা কোনো ফস্টার ফ্যামিলিতে ওকে রাখত মনে হয় না। রাকার মা, বাবা সময় মতো অ্যারিজোনায় এসে যাওয়াতে এ সব প্রশ্ন আর ওঠেনি। বাচ্চার বাবা তাঁর জন্মের আগেই মারা গেছে। মা দীর্ঘ দিনের জন্যে জেল খাটছে। এ অবস্থায় সারাসরি রক্তের সম্পর্কের দাবিতে দাদু, দিদিমা রণোর কাস্টডি পেয়ে গিয়েছিলেন। ওঁদের আর্থিক অবস্থা-টবস্থার খবরও ইউ.এস. এম্ব্যাসি থেকে খোঁজ নিয়েছিল।

সেই যে রণো কলকাতায় চলে গেল, মাঝে আর কখনো রাকা তাকে দেখতে পেল না। বাবা চাননি রাকার জেলটার্ম্ শেষ হবার আগে ওদের দেখা হোক। মাঝেমাঝে রণোর নানা বয়সের ছবি পাঠিয়েছেন। ওর আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা ছোট ছোট চিঠি পাঠিয়েছেন। কিন্তু কোনো চেনাশোনা বাঙালির সঙ্গে একবারের জন্যেও রণোকে আমেরিকায় আসতে দেননি। বাবার যুক্তি ছিল—তোমার এ অবস্থায় ছেলের সঙ্গে দেখা হয়ে লাভ কী? আর কয়েকটা বছর ধৈর্য ধরো। রণোর মনটাকে প্রস্তুত হতে সময় দাও।

ধৈর্য্য ধরতে ধরতে অর্ধেক জীবন চলে গেল। রাকা জানে ওঁরা রণোকে ছোটবেলায় কিছুই বলেননি। মা বিদেশে পড়তে গেছে, এমনই একটা ধারণা দিয়ে রেখেছিলেন। এখনও যে মা

ওকে কতদূর কী জানিয়েছেন, সে কথা স্পষ্ট করে লেখেন না। ছেলেও চিঠিপত্র দেয় না। রাকা লেখে। উত্তর পায় না। অথচ ওর দেশে ফেরার দিন এগিয়ে আসছে। ধৈর্যের পরীক্ষা শেষ হতে চলেছে। এবার তো ওর ছেলেকে কাছে পাওয়ার কথা। রাকা কিছুতেই বুঝতে পারছে না কেন ওরা এ সময় রণোকে দূরে পাঠিয়ে দিল।

কুণাল কদিন ধরেই চেষ্টা করছে, যদি কোনোভাবে রাকার প্লেন ভাড়ার ব্যবস্থা করা যায়। সেদিন অফিস থেকে ফিরে বলল—"তোমার দাদাকে তাড়াহুড়ো করে বুকিং করতে বারণ করো। মনে হচ্ছে এখান থেকেই একটা টিকিটের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

রাকা অবাক হল—"সেটা কী করে সম্ভব? আপনি কি এয়ার ইন্ডিয়াকে অ্যাপ্রোচ্ করেছেন? কমপ্যাশনের গ্রাউন্ডে ওরা আমাকে ফ্রি টিকিট দেবে?"

কুণাল হাসল—"অতদূর যেতে হয়নি। তোমার সেই ডিফেন্স অ্যাটর্নি সল্ গোল্ডবার্গের অফিসে ফোন্ করেছিলাম। তোমাকে তিন মাসের মধ্যে আমেরিকা ছেড়ে চলে যেতে হবে। এ অবস্থায় তোমার যদি প্লেন ভাড়া দেবার ক্ষমতা না থাকে, তাহলে ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে গভর্ণমেন্ট্‌কেই তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। গোল্ডবার্গ বললেন তোমার ডিপোর্টেশন অর্ডারের কপি নিয়ে ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ন্যাচারালাইজেশনের অফিসে যেতে।"

মহুয়া বলল—"কিন্তু ওরা তো বলতে পারে আমাদের ইন্ডিয়ান কমিউনিটি কেন রাকাকে হেল্প করছে না? তোমার সত্যি মনে হয় গভর্ণমেন্ট থেকে ওকে দেশে ফেরার টিকিট দেবে?"

রাকা প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল—"না, মহুয়া, ইন্ডিয়ান কমিউনিটির কাছে তোমরা আর আমার জন্যে টাকা পয়সা চেয়ো না। কেস্ চলার সময় লিগ্যাল্ খরচপত্রের জন্যে সবাই তো সাহায্য করেছিল। তখন রণোর টেন্ পার্সেন্ট টিকিটের ভাড়াও তোমরা দিয়েছিলে। তোমাদের আমেরিকান বন্ধুরা রণোর জন্যে বেবি ফুড, দুধের ফরমূলা থেকে শুরু করে ডায়াপার, জামাকাপড় কিনে দিয়েছিল! ভাবলে এখনও কৃতজ্ঞতায় চোখে জল আসে....।"

রাকা একটু থেমে থেকে বলল—"কিন্তু আর ফেভার নিতে চাই না। জেল্-এ কাজ করে তো কিছু পেমেন্ট পেয়েছি। ওয়ান ওয়ে প্লেন্ ফেয়ার কত হবে? সাত-আটশো ডলার? আমি নিজেই দিতে পারব। দাদাকেও সেটা বলেছি।"

শেষপর্যন্ত রাকাকে আর টিকিট কাটতে হল না। কুণাল ক্রিমিন্যাল ডিফেন্স অ্যাটর্নি গোল্ডবার্গের পরামর্শ নিয়ে যা যা করার করল। ইমিগ্রেশন লইয়ার দীপক শর্মার কাছে ও রাকাকে নিয়ে গেল। চোদ্দ বছর জেল খেটে ডিপোর্টেশন অর্ডার পেয়ে রাকা দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছে। নিজস্ব টাকাকড়ি বলতে কিছু নেই। দেশে ফিরে গিয়ে ছেলের দায়িত্ব নিতে হবে। এই সব কারণ দেখিয়ে অ্যাপিল্ করতে রাকা গভর্ণমেন্ট থেকে ইউনাইটেড এয়ার লাইন্সের একটা টিকিট পেয়ে গেল। টিকিটা দিল্লি পর্যন্ত। রাকা ঠিক করল দিল্লি পৌঁছিয়ে আগে ছেলের কাছে যাবে। দাদা শুনে প্রথমে একটু আপত্তি করেছিল। তারপর নিজেই বলল—"আমি দিল্লিতে তোকে রিসিভ্ করব। রণোর হস্টেলে দেখা করে পরের দিন কলকাতার ফ্লাইট নেবো।"

কুণাল, মহুয়া ফিনিক্স এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিতে এসেছিল। চেকিং-এর পরে রাকা জোব

করে ওদের ম্যাক্‌ডনাল্ডের কফি আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খাওয়াল। খেতে বসে কিছু অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা হচ্ছিল। তবু কুণাল বুঝতে পারছিল ক্রমশ পরিবেশটা ভারী হয়ে আসছে।

প্লেনে বসে সময় কাটানোর জন্যে মহুয়া রাকার হাতে একটা বাংলা বই ধরিয়ে দিয়েছিল। নিউইয়র্কের এক বাঙালির লেখা 'এই দ্বীপ, এই নির্বাসন'। লেখকের নাম মনোজ ভৌমিক। অল্প বয়সে নিউইয়র্কেই মারা গিয়েছিলেন। বইটার মলাটের ওপর হাত রেখে রাকা ম্লান হাসল—"সত্যিকারের নির্বাসন যে কি, আমার মতো করে কেউ কি জেনেছে? লেখার ক্ষমতা থাকলে জেল্‌-এ বসে একটা বই লিখে ফেলতে পারতাম।"

কুণাল বলল—"লেখার ক্ষমতা নেই ভাবছ কেন? জেল্‌-এ ডায়েরি লিখতে। সেখান থেকেই মেটিরিয়াল পেয়ে যাবে। আমার তো মনে হয় জীবনের আন্‌ ইউশ্যুয়াল এক্সপেরিয়েন্সটাই আসল।"

কথায় কথায় সময় শেষ হয়ে আসছিল। ওরা সিকিওরিটি গেটের দিকে গেল। কুণাল রাকার পিঠে হাত রেখে—"হ্যাভ্‌ এ সেফ্‌ ট্রিপ। দিল্লিতে সময় না পেলে কলকাতা পৌঁছে একটা ফোন কোরো।"

মহুয়া কাঁদছিল। রাকা ওকে জড়িয়ে ধরে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। চলে যাবার সময় বলল—"আর তো কখনো আসবো না। তোমরা দেশে গেলে তবে দেখা হবে। বছরে একবার তো দেখা হবেই বলো?"

হাসি-কান্না মেশানো গলায় মহুয়া উত্তর দিল—"আশা তো করি। ভালো থেকো রাকা। সী ইউ এগেন্‌।"

ভোরবেলায় দিল্লি এয়ারপোর্টের বাইরে কুয়াশার মধ্যে রজত দাঁড়িয়ে ছিল। রাকা দূর থেকে দেখল বাবার সঙ্গে ওর চেহারার কী সাদৃশ্য এসে গেছে। চুল পাতলা হয়ে কপালটা বড় দেখাচ্ছে। শরীর ভারী হয়েছে। আগে চশমা ছিল না। এখন চশমা পরে বাবার সঙ্গে আরও মিল লাগছে।

—"কিরে এসে গেছিস? ফগ্‌-এর জন্যে তোদের অ্যারাইভ্যালের ডিলে হবে বলছিল। আমি অবশ্য আগেই চলে এসেছি।"

রাকা তখনও দাদাকে দেখছে। রজত ওর কাঁধের ওপর হাত রেখে হাসল—"কী দেখছিস? দাদা একটু বুড়ো হয়ে গেছে তো? তুই ও তো এর মধ্যে চুলগুলো পাকিয়ে বসেআছিস! চল্‌ এবার গাড়িতে ওঠ।"

রজতের অফিসের ড্রাইভার রাকার মালপত্রের ট্রলিটা নিয়ে কার পার্কিং-এর দিকে যাচ্ছিল। একটু পেছনে দুই ভাইবোন হাঁটছে। দাদার উচ্ছ্বাস দেখে রাকার মনে হল এই একজন মানুষ বোধহয় আগের মতোই আছে। বাবার সঙ্গে সাদৃশ্য থাকলেও তাঁর কঠিন, রাশভারী ব্যক্তিত্ব পায়নি। রাকা কেমন যেন স্বস্তি অনুভব করছিল।

গাড়িতে উঠে রাকা বলল—"প্রথমে তোকে বাবার মতো লাগছিল। কিন্তু হাব ভাবে তো মিল পাচ্ছি না। বরং ছোট কাকার সঙ্গে বেশি মিলছে।"

—"তুই দেখছি ছনুপিসির মতো কথা বলছিস। বুড়ি এখন আমাকে দেখলেই বাদলা রে, বাদলা বলে কাঁদে। তোর মনে আছে ঠাকুমা, পিসিরা ছোটকাকাকে বাদলা বলতেন?"

—"জানি। আর, বাবাকে বলতেন গোপ্‌লা। তুই আবার ছনুপিসির জামাই খুব ড্রিংক করত শুনে নাম দিয়েছিলি মাত্‌লা। সব মনে আছে আমার.....।"

গাড়িতে যেতে যেতে দিল্লি শহরকে আর চিনতে পারছে না রাকা। কবে যে এই মহানগরের শাখা প্রশাখা বাড়তে বাড়তে হরিয়ানা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, ও তার কোনো খবরই রাখে না। রজত নতুন নতুন ডেভলপ্‌মেন্টের নাম বলে যাচ্ছিল। হঠাৎ রাকা খেয়াল করল কিছুই ওর কানে ঢুকছে না। রজতকে জিজ্ঞেস করল—"আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি? কোনো হোটেলে থাকব? না, রণোদের ক্যাম্‌পাসেই থাকার ব্যবস্থা আছে?"

—"আমাদের অফিসের গেস্ট্ হাউসে যাচ্ছি। তুই চানটান করে রেস্ট করে নিস। আমি রণোকে স্কুল থেকে নিয়ে আসব। প্রিন্‌সিপ্যালকে বলে রেখেছি। তবে আজ রাতেই আবার পৌঁছে দিতে হবে। ওদের এখন কী সব ক্লাস প্রজেক্ট্ চলছে।"

—"তোরা হঠাৎ ওকে এতদূরে পাঠিয়ে দিলি কেন দাদা? বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করলি কেন? বাড়িতে কোনো প্রব্‌লেম হচ্ছিল?"

রজত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উত্তর দিল—"ব্যাপারটা বেশ কম্‌প্লেক্স্ রাকা। তোকে সব বলব। এখন তুই এসে গেছিস। তোকেই সিচুয়েশন হ্যান্ডল্ করতে হবে। আর, আমরা তো আছি।"

গেস্ট হাউসে পৌঁছে স্নান সেরে রাকা বিছানায় গিয়ে শুলো। একে শরীরের ক্লান্তি, তার ওপর দাদার কথা শুনে মনটা খুব অস্থির হয়ে আছে। কী যে বলতে চাইছিল, ওর কথার ভাবে ঠিক ধরা গেল না। তবে এটুকু বুঝতে পারল, রণোকে নিয়ে ওরা বেশ চিন্তিত। সমস্যাটা যে কী এখনই রাকার জানা দরকার। ও রজতের সঙ্গে কথা বলার জন্যে পাশের ঘরে গিয়ে দেখল ঘরে কেউ নেই।

গেস্ট হাউসের রান্নাঘরে কাজের লোকজনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল। ওদের কাছে খবর নিয়ে জানল রজত খানিকক্ষণ আগে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছে। লাঞ্চের আগে ফিরবে। রাকা অনুমান করল দাদা রণোকেই আনতে গেছে। কে জানে কতক্ষণে আসবে? রাকাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারত। রাকা যে কেন ওর কথায় রেস্ট নিতে রাজি হয়ে গেল? এখন যেন আর দেরি সহ্য হচ্ছে না। রণোকে দেখার জন্যে আর একমুহূর্ত ও অপেক্ষা করতে পারছে না।

হঠাৎ ফোন বাজল। গেস্টহাউসের ওদিকের ঘরে আরও একটি ফ্যামিলি এসেছে। সেই ভদ্রলোক এসে ফোন ধরলেন। রাকা আবার নিজের ঘরে চলে গেল। বহুবছর পরে 'স্টেট্‌সম্যান' খুলে বসল। কাগজের পাতায় চোখ রেখে মাঝেমাঝেই বাইরে গাড়ির আওয়াজ শুনে উৎকর্ণ হয়ে উঠছিল। বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ রজত রণোকে নিয়ে ফিরল।

অনেকদিন ছেলের কোনো ছবি দ্যাখেনি। শুধু ছোটবেলার ছবি দেখে দেখে নানা বয়সের রণোকে কল্পনা করে মনের মধ্যে একটা ধারণা তৈরি হয়ে ছিল। আজ চোখের সামনে দেখে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। লম্বা, রোগা গড়ন, মাথায় একরাশ অবিন্যস্ত চুল, দৃঢ় চিবুক, দুচোখে সুতীব্র কৌতূহল নিয়ে এ মুহূর্তে যে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে— এই তার রণো?

রাকার বুকের ভেতর কান্নার উথাল পাথাল ঢেউ ভাঙছিল। শুধু এই দিনের আশায় শত দুঃখ, বেদনা, মনস্তাপের দহনে জ্বলে পুড়ে গিয়েও তার বাঁচার ইচ্ছে মরে যায়নি। মাতৃত্বের অপূর্ণ আকাঙ্খা নিয়ে কতকাল অন্তহীন অপেক্ষায় কেটে গেছে। মানসিক বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে যখন জেল হাসপাতালে ছিল, ডাক্তার তাকে রণোর কথা বলে, রণোর ছবি দেখিয়ে নতুন করে

বেঁচে থাকার প্রেরণা দিয়েছেন। রাকার মনে হল আজ চোখের জল ফেলার সময় নয় প্রাণপণে নিজেকে সংবরণ করে হাত বাড়িয়ে দিয়ে ডাকল—"রণো কাছে এসো।"

দুপুরে খেতে বসে রজত বলল—"একবার অফিসে যাওয়া দরকার। তোমরা গল্প করো বিকেলে চা খেয়ে নিও। আমার হয়তো ফিরতে দেরি হবে।"

রণো মনে করিয়ে দিল—"আমাকে ন'টার ভেতর হস্টেলে ফিরতে হবে।"

—"জানি। এখানে ডিনার খেয়ে নিস। আমি সময় মতো পৌঁছে দেব।"

রজত চলে যাবার পরে ওরা বেডরুমে গিয়ে বসল। ঘরের ভেতর হিম ঠান্ডা। রাকা রুম-হিটার চালিয়ে কম্বল জড়িয়ে বিছানার এক পাশে সরে গিয়ে বলল—"দিল্লিতে কী অসম্ভব ঠান্ডা। দিনের বেলাই কী শীত করছে।"

রণো হাসল—"হ্যাঁ। কলকাতায় তেমনি গরম। গিয়ে ডিফারেন্স্‌টা বুঝবে।"

রণোর হাসি দেখে রাকা আশ্বস্ত হল। দেখা হওয়া পর্যন্ত সেরকম কথাবার্তা হয়নি। খেতে বসে রাকা যা জিজ্ঞেস করছিল, রণো তার উত্তর দেওয়া ছাড়া আর কোনো আগ্রহ দেখাচ্ছিল না। যেন নিজের মা নয়, বাইরের কোনো মহিলাকে এই প্রথম দেখছে। সেরকমই ভদ্র অথচ নিরুত্তাপ ব্যবহার। রাকা বুঝতে পারছিল দীর্ঘ দূরত্বের কঠিন বরফ গলতে সময় নেবে। সে জন্যে মনকে প্রস্তুত করেই রেখেছে। এখানে রণোকে সহজভাবে কথা বলতে দেখে ভালো লাগলো। রাকা জিজ্ঞেস করল—"এখানে বোর্ডিং স্কুলে তোমার কেমন লাগছে? কলকাতার বাড়ি, দিদিমা, বন্ধু-টন্ধুদের মিস্ করছো না?"

রণো একটা ম্যাগজিন থেকে চোখ তুলল—"মিস্ করলেও ফিরে যাচ্ছি না। দিল্লিতেই স্কুল শেষ করব।"

রাকা দমে গেল—"কেন? কোলকাতায় তো ভালো স্কুলেই পড়ছিলে। চলে এলে কেন?"

—"বাড়িতে থাকতে ভালো লাগছিল না। তাছাড়া কেরিয়ারের জন্যেও কলকাতায় থাকার ইচ্ছে নেই। দিল্লি, বম্বে, ব্যাঙ্গালোর অনেক বেশী প্রমিসিং।"

—"কেরিয়ারের জন্যে তো অনেক সময় আছে। তেমার এখনও পনের বছর বয়স হয়নি। স্কুলিংটা কলকাতায় শেষ করতে পারো।"

রণো দৃঢ়ভাবে উত্তর দিল—" না। এখানেই থাকবো।"

রাকা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল—"কলকাতার বাড়িতে তোমার কি কিছু প্রব্‌লেম হচ্ছিল? এখন তো আমি ফিরে এসেছি। দরকার হলে আমরা দুজনে আলাদা থাকবো।"

কথাটা নিজের কানেই দুর্বল শোনাল। রাকার কি এমন আর্থিক সঙ্গতি আছে যে, এখনই ও কলকাতায় গিয়ে আলাদা সংসার করবে? এই মধ্যবয়সে ওকে চাকরিই বা কে দেবে? আমেরিকার এক্সপেরিয়েন্স্ বলতে সেই প্রথম দেড়-দুই বছরের ব্যাংকের চাকরি। তারপর যা ঘটেছে, রাকার ব্যাক-গ্রাউন্ড চেক্ করলে এমনিতেই বাতিল হয়ে যাবে। কোন্ ভরসায় ও ছেলেকে নিয়ে আলাদা সংসারের কথা ভাবছে। নির্ভর করার তো সেই একটাই জায়গা। মা আর দাদা। রণোকে যে এত খরচ করে দিল্লির বোর্ডিং স্কুলে পড়াচ্ছে, সেও তো ওরাই দিচ্ছে।

নিজের অবিবেচনায় লজ্জা পেয়ে রাকা কথা ঘোরাল—"রণো, আসলে আমি বলতে চাইছিলাম, এতদিন তো আমার কোনো উপায় ছিল না। বাধ্য হয়ে ইউ. এস্. এ-তে ছিলাম।

কিন্তু এখন আর আলাদা থাকব কেন? অন্তত ক'টা বছর তুমি কলকাতায় আমার কাছে থাকো? তারপর যা হয় কোরো।"

রণো অসহিষ্ণুভাবে মাথা নাড়াল—"প্লিজ লীভ মী অ্যালোন্। আমাকে নিজের মতো থাকতে দাও। আমি তোমার রেস্‌পনসিবিলিটি না। তোমার রেস্‌পনসিবিলিটি এখন দিদিমা। শী অলমোস্ট্ গেভ হার এভ্‌রিথিং ফর আস্—ইউ বেটার গো অ্যান্ড টেক্ কেয়ার অফ্ হার।"

রাকা থতমত খেয়ে গেল। রণো এত রেগে উঠলো কেন? রাকার ফিরে আসায় ও কি একটুও খুশি হয়নি? মার ওপর তাহলে খুবই রাগ, দুঃখ, অভিমান জমে আছে? সে জন্যেই দূরে থাকতে চাইছে? কিন্তু মার সব কথা কি ও জানে?

রাকা আর অশান্তি বাড়াতে চাইল না। আজকের দিনটাই মাত্র দিল্লিতে আছে। রণো কিছুক্ষণ বাদে হস্টেলে ফিরে যাবে। রাকা চায় না প্রথমদিনেই কোনো ভুল বোঝাবুঝি হোক। জীবনের নানা পরিস্থিতিতে ওর ধৈর্য, সহ্য বেড়ে গেছে। সহজে তেমন বিচলিত হয় না। রণোর মেজাজ ফেরানোর চেষ্টায় রাকা জিজ্ঞেস করল—"দিল্লিতে আমাদের কয়েকজন রিলেটিভ থাকতেন। দাদা তোমাকে কারুর বাড়ি নিয়ে গেছে নাকি?"

রণো উত্তর দিল—"শুধু একজনের বাড়িতে গেছি। উনি আমার লোক্যাল গার্ডিয়ান। দেবশংকর সেন। হি ইজ্ আ ডক্টর।"

—"দেবুদা? ওরা কেথায় থাকে? জ্যাঠামশাইরা একসময় হুমায়ুন রোডে থাকতেন। ছোটবেলায় কতবার বেড়াতে এসেছি।"

—"তুমি লাস্ট্ সেনচুরির কোন্ পিরিয়ডের কথা বলছো? আমি ওসব জানি না। দেব-মামা থাকতেন ফ্রেন্ডস্ কলোনীতে।"

—"সে আবার কেথায়? দিল্লির এ সব নতুন নতুন এরিয়ার নামও শুনিনি। এখানে থেকে খুব দূরে?"

—"নট দ্যাট ফার। তবে আজ বোধহয় আর যেতে পারবে না। ফোন্ করতে পারো।"

—"ঠিক আছে। পরে কনট্যাক্ট্ করব। আবার তো দিল্লিতে আসব। তখন দেখা করব।"

রাকা বুঝিয়ে দিল ছেলের রাগ, অভিমান সে গ্রাহ্য করছে না। রণো যাই বলুক, রাকা মাঝেমাঝেই দিল্লিতে আসবে। দরকার হলে দেবুদার বাড়িতে উঠবে। রণোকে তার কাছে পাওয়া দরকার। অনেক কথা বলার আছে। নয়তো ওর ভুল ভাঙবে না। রাকা পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে ভয় পায় না। বড়রকম বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে সম্পর্ককে চেনা যায়। আবার সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়। রাকা ক্রমশ সেই মোকাবিলার জন্যে তৈরি হচ্ছিল। তবে আজ রণোর সঙ্গে হালকা গল্পগুজব করেই সময় কাটাবে।

পরদিন সকালের ফ্লাইটে রজতের সঙ্গে রাকা কলকাতায় এসে পৌঁছল। এয়ারপোর্ট থেকে ভবানীপুরে আসার পথে দেখছিল এ শহরটাও কত বদলে গেছে। নতুন নতুন দোকান বাজার। রাস্তাঘাটে কী প্রচণ্ড লোক বেড়ে গেছে। গাড়ি, ট্র্যাম, বাস, রিকশো, অটোর আশপাশ দিয়ে ছোট্ট ছেলের হাত ধরে যুবতী মা রাস্তা পার হচ্ছে। রাকা যেন তার পুরোনো অনুষঙ্গের মধ্যে ডুবে গিয়ে অদ্ভুত একাত্মতা অনুভব করছিল। শেষপর্যন্ত কলকাতাই থাকে । নবনীতা দেব সেনের সেই কবিতার মতো, এ শহর তার দুঃখী প্রবাসী মেয়েকে কাছে ডেকে নেয়। আশ্রয়

দেয়। রাকা ভাবছিল চোদ্দ বছর পরে অ্যারিজোনা স্টেট প্রিজ্‌নের বাইরে এসে নয়, আজ এখানেই ও প্রথম মুক্ত জীবনের আশ্বাস পেল।

প্রোমোটারের হাতে পড়ে পৈত্রিক বাড়িটা আর নেই। বাগান নেই, উঠোন নেই, জালে ঢাকা রঙিন মাছেদের ছোট্ট চৌবাচ্চা নেই। পুরোনো গ্যারেজের পাশে পেয়ারা গাছতলা পেরিয়ে বেড়া দেওয়া হাঁসেদের ঘরটা নেই। এই নৈরাজ্যের বুকে দাঁড়িয়ে আছে নতুন মাল্‌টি-স্টোরিড। রজত বলল—"তবু দ্যাখ্‌ প্রোমোটারকে বলে কয়ে বাড়িটার কেমন নাম দিয়েছি।"

রাকা দেখল বাড়ির গায়ে লেখা আছে 'শিবনিবাস'। ওদের দাদুর নাম ছিল শিবশঙ্কর সেন।

রাকা হাসল—"তোরা তো শুধু দুটো ফ্ল্যাটের ওনার। প্রেমোটার দাদুর নাম রাখতে রাজী হল?"

রজত গেট দিয়ে ভেতরে যেতে যেতে বলল—"এক কথায় রাজি হয়ে গেল। আরে, ফ্ল্যাটগুলো কিনেছে তো গুজরাটিরা। রিলিজিয়াস্‌ টাইপ তো! শিবনিবাসে ঢুকে রোজ শিবের মাথায় জল ঢালছে।"

রাকার মা গায়ত্রী ফ্ল্যাটের দরজা খুলে রেখে বসেছিলেন। মার চেহারা দেখে রাকা যেন চিনতেই পারছে না। শরীর এত ভেঙে গেল কবে? মা কি তবে অসুস্থ? পণাম করতে গিয়ে দেখল পায়ের পাতা দুটো ফুলে আছে। চোখ মুখও বেশ ফোলা ফোলা।

—"কী হয়েছে মা? চেহারা এত খারাপ হয়ে গেছে কেন? শরীর ভালো নেই?"

মা হাত ধরে পাশে বসালেন। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ভাঙা ভাঙা স্বরে বললেন—"বুড়ো হয়েছি না। অসুখ বিসুখ কি আর ছাড়বে? তোরই বা কী চেহারা হয়েছে? যে দণ্ডভোগ গেল, বেঁচে আছিস এই আমার ভাগ্য।"

রজত মার ফ্ল্যাটে রাকার সুটকেস দুটো রাখার ব্যবস্থা করছিল। মাকে বলল—" বাড়ি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে হাহুতাশ শুরু করলে। বারবার পুরোনো কথা আর তুলো না মা। ওকে একটু অ্যাডজাস্ট্‌ করতে দাও।"

দরজায় রজতের বউ নন্দিতা এসে দাঁড়িয়েছে। রাকা হাসল—"কেমন আছো বউদি? মেয়েরা কোথায়? ওদের তো আমি দেখিইনি।"

—"আসছে। বড়জন চান করছে। ছোটটা স্কুলের জন্যে রেডি হচ্ছে। তুমি চা খাবে তো? আমাদের ফ্ল্যাটে চলে এসো না?"

রাকার তখনই মাকে ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করল না। দাদার ধমক খেয়ে মুখ গম্ভীর করে বসে আছেন। মার কী দোষ? আনন্দ করার মতো মন কি আর আছে? রাকা এ বাড়ির সুখ, শান্তি কেড়ে নিয়েছে। ওর জন্যে সবচেয়ে বেশি শাস্তি ভোগ করেছেন মা আর বাবা। দাদার তবু নিজের জীবন আছে, সংসার আছে। মার অবলম্বন বলতে শুধু রণো। সেও হঠাৎ জোর করে দিল্লি চলে গেল। মা সেই কষ্টটাই নিতে পারছেন না মনে হয়। রাকার মন খারাপ লাগছিল।

রজতের দুই মেয়ে নীলাক্ষী আর এনাক্ষী। নীলা যাদবপুরে ইংলিশ নিয়ে পড়ছে। এনা রণোর চেয়ে ছোট। দুজনেই পিসিকে প্রণাম টোনাম করল। অ্যারিজোনায় মহুয়া ওদের জন্যে কস্‌টিউম জুয়েলারি কিনে দিয়েছিল। পেয়ে দু' বোনেই 'থ্যাংক্‌ কিউ' বলে বেরিয়ে গেল।

রাকা লক্ষ্য করল এরাও যেন রণোর মতো ফর্মাল ব্যবহার করছে। আবাহনও নেই, বিসর্জনও নেই। অথচ এদের বয়সে রাকা কত উচ্ছ্বল ছিল। কে জানে? এ জেনারেশন হয়তো অন্য রকম। রাকা ভুলে যচ্ছিল আমেরিকা থেকে মাসি, পিসিদের বেড়াতে আসা আর ওর নিজের ফিরে আসার মধ্যে অনেক তফাৎ। পরে মনে হল এ বাড়িতে শুধু ওর নিজের নয়, ওর সঙ্গে অন্যদেরও অ্যাড্‌জাস্ট্‌মেন্টের ব্যাপার আছে। রাতারাতি বেশি কিছু আশা করা যায় না। কেউ অসম্মান করছে না এই অনেক।

মার কাছেই রাকা প্রথম জানতে চাইল রণোকে নিয়ে ওদের কী সমস্যা হচ্ছিল। এই বয়সে ওঁরা ওকে ছেড়েই বা দিলেন কেন। মা জিজ্ঞেস করলেন—"রজত তোকে কিছু বলেনি? সে যে কী কাণ্ড হয়েছিল, ভাবলে এখনও আমার বুক কাঁপে। ছেলে তো প্রায় আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল রে রাকা। বহু কষ্টে বাঁচিয়েছি.....।" গায়ত্রী কাঁদছিলেন।

রাকার হৃদ্‌পিণ্ড থেমে যাবার মতো অনুভূতি হল। শরীর অবশ। যেন কোনো অন্ধকার আবর্তে দ্রুত তলিয়ে যাচ্ছে। অসহায়ের মতো চিৎকার করে উঠল—"কী বলছ তুমি? রণো সুইসাইড করতে গিয়েছিল? কেন মা? আমার জন্যে? তোমরা তবে ওকে কী বুঝিয়েছিলে? বলো না, চুপ করে আছ কেন?"

— "তুই তো জানিস, আমার কি সত্যি কথা বলার সাহস ছিল? না ক্ষমতা ছিল? যতদিন তোর বাবা বেঁচে ছিলেন, রণোকে আসল ঘটনা বলতে দেননি। ওর বাবা আমেরিকায় মারা গেছে। তুই পড়াশুনা শেষ করে ফিরবি। তাই দেরি হচ্ছে, এ সব বলতেন। রণোর যখন দশ বছর, উনি মারা গেলেন। দাদুর সঙ্গে ছোট থেকে ওঠাবসা। দাদু চলে যেতে খুব ভেঙে পড়েছিল।"

—"একটা জিনিস অবাক লাগছে মা। দশ বছর খুব কম বয়স নয়। রণো ঐ সব কথা বিশ্বাস করত? কোনো মা তার ছেলেকে ছেড়ে দশ বছর ধরে পড়াশোনা করছে, একবারের জন্যেও দেশে আসছে না—এটা কোনো স্বাভাবিক ব্যাপার? তোমরা বোঝাতে কী করে? ও প্রশ্ন করত না? আত্মীয়-স্বজনদেরই বা কী বলে রেখেছিলে?"

চশমার কাচ মুছে গায়ত্রী জবাব দিলেন—"আমার খুব সন্দেহ রণো সব কথা বিশ্বাস করত না। তোর চিঠিপত্র আসত ওঁর পার্ক স্ট্রিটের চেম্বারের ঠিকানায়। রণো বেশির ভাগ চিঠি হাতেই পেত না। আমাকে নানা প্রশ্ন করত। ওঁর ভয়ে কিছু খুলে বলতে পারতাম না। রণোরও দাদুকে কথা জিজ্ঞেস করার সাহস ছিল না।"

রাকা উত্তেজিত ভাবে বলল—"বাবা কেন ওর এত বড় ক্ষতি করলেন? চিরকাল নিজের জেদ নিয়ে চলেছেন। আমাকে ক্ষমা করতে পারেননি, সে আমি জানি। চিঠিতে বারবার লিখতেন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছ। বাবার কি একবার ও মনে হত না, মাধবন আমাকে রাতের পর রাত টর্চার করত। খুন করবে বলে ভয় দেখাত। আমার নামে হঠাৎ লাইফ ইনশিওরেন্স্ করল। রণো পেটে আসার পরেও কী অত্যাচার সহ্য করেছি...."

ডোর বেলের শব্দে রাকা থেমে গেল। কাজের মেয়েটি দরজা খুলে দিতে রজত আর নন্দিতা ভেতরে এল। সন্ধেবেলা ওদের ফ্ল্যাটে মেয়েরা পড়াশোনা করছে। এ সময় এখানে রাকার সঙ্গে রণোর ব্যাপারে কথা বলতে চায়।

গায়ত্রী বললেন—"ঐ তো, ওদের কাছেই সব কথা শোনো।"

রাকা জিজ্ঞেস করল—"রণোর ঠিক কী রিঅ্যাকশ্‌ন হয়েছে দাদা? বাবা তো ওকে পুরো কন্‌ফিউজ্‌ করে রেখে চলে গেলেন। তোরা ওকে পরে সত্যি কথা বলেছিস?"

রজত উত্তর দিল—"আমাদের বলার আগেই ও অদ্ভুতভাবে ব্যাপারটা জেনে গেল। আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে নয়, বম্‌ শেল্‌টা এল আমেরিকান কনসুলেট্‌ থেকে। মনে আছে তোর, মা বাবা অ্যারিজোনায় গিয়ে রণোর টেম্‌পোর‍্যারি কাস্টডি পেয়েছিলেন?"

রাকা অবাক—"হ্যাঁ, সে তো আমি জেল্‌-এ ছিলাম বলে। ওর আঠার বছর বয়স পর্যন্ত আমি ফিরে না এলে, দাদু দিদিমার কাছে থাকবে। তারপরেও ফিরে না এলে, বা যদি বেঁচে না থাকি, তখন আর কারুর কোনো দায়িত্ব থাকবে না।"

—"রাইট। কিন্তু ইউ. এস. কনসুলেট চিঠি দিয়ে মা আর রণোকে ডেকে পাঠাল। আমি সঙ্গে গিয়েছিলাম। গিয়ে তো আমরা স্তম্ভিত। শিকাগো থেকে মাধবনের দাদা, বোনের বর এসে উপস্থিত। ওরা এখন লিগ্যালি ওর কাস্টডি চাইছে। ভেবে দ্যাখ্‌ তখন রণোর কী অবস্থা!"

রাকা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। এ সব কী অদ্ভুত কথা শুনছে? এত বছর পরে মাধবনের বাড়ির লোকেরা রণোর খোঁজ নিচ্ছে? ওকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছে? কিন্তু কেন? স্বার্থটা কী? জন্মের পরে যার খোঁজও নেয়নি, হঠাৎ দশ-বারো বছর পরে তাকে মনে পড়ল? নাকি রাকাকে আরও শাস্তি দেওয়াটাই আসল উদ্দেশ্য? অ্যারিজোনার কোর্টে কেস্‌ চলার সময় মাধবনদের সাউথ ইন্ডিয়ান কমিউনিটির লোকজন নিয়ে ওর দাদা প্রায়ই আসত। অন্য আত্মীয়দেরও দেখেছিল। রাকার কনভিক্‌শনের দিন কোর্টে বাঙালি বলতে মাত্র কয়েকজন। মাধবনদের চেনাশোনা লোকই বেশি ছিল। রাকার পনের বছরের জেল হল শুনে ওরা সন্তুষ্ট হতে পারেনি। চেয়েছিল ওর ডেথ পেন্যালটি হোক। নয়তো লাইফ-ইম্‌প্রিজনমেন্ট। সে ইচ্ছে মেটেনি বলে এখন অন্যভাবে প্রতিশোধ নিতে এসেছে। রাকা এক ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের আভাস পেল।

রজত বলে যাচ্ছিল—"সেদিন কনসুলেট থেকে ফিরে ছেলেটা খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসেছিল। তারপর পাগলের মতো কাঁদতে কাঁদতে বাবার ছবির কাচে জলের গেলাস ছুড়ে মারল। শুধু এক কথা—তোমরা আমাকে মিথ্যা কথা বলেছিলে কেন? কেন বলতে আমার বাবা অ্যাক্‌সিডেন্টে মারা গেছে? কেন বলোনি মা আমার বাবাকে মার্ডার করে জেল্‌-এ আছে? দাদু, দিদাকে আমি আর ভালোবাসি না। হি ওয়াজ অল্‌সো এ ড্যাম্‌ লায়ার.....।"

সেই দৃশ্যের কথা ভেবে রাকার বুক ভেঙে যাচ্ছিল। কেন ওরা সময় থাকতে ধীরে ধীরে ছেলেটাকে সব কথা বলতে পারল না? নিজের লোকের কাছে শুনলে হয়ত এরকম শক্‌ পেত না। সেই জন্যেই আর মাকে সহ্য করতে পারছে না। ওর কাছে মার একটাই পরিচয়। মা নৃশংসভাবে বাবাকে খুন করেছিল। ঘৃণা, ভয় আর বিদ্বেষ ছাড়া মার সম্পর্কে ওর আর কী অনুভূতি থাকবে?

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে রাকা বলল—"শেষপর্যন্ত ছেলেটাই সব কিছুর ভিক্‌টিম হল। তোমাদেরও কম কষ্ট দিলাম না। কিভাবে যে তোমাদের দিন কেটেছে বুঝতেই পারছি।"

নন্দিতা বলল—"খুব চিন্তা হয়েছিল। রণোকে সাইকিয়েট্রিস্ট্ দেখাতে হল। নয়তো একটা বিপদ ঘটে যেত।"

গায়ত্রী বলে উঠলেন—"বিপদ মানে? ভগবান রক্ষে করেছেন। সেদিন নীল না দেখতে পেলে রণো শেষ হয়ে যেত। ছাদে গিয়ে ব্লেড দিয়ে হাতের শিরা কেটে রক্তারক্তি কাণ্ড! আগেও একদিন আমার সন্দেহ হয়েছিল।"

রাকা বলল—"সন্দেহ আমারও হত। চিঠিতে ওর কথা তুমি একদমই লিখতে না। রণোকে চিঠি লিখলে উত্তর পেতাম না। তখনই মনে হয়েছিল কোথাও প্রবলেম হচ্ছে। কিন্তু এত কাণ্ড ঘটে গেছে ভাবতেও পারিনি।"

রজত উত্তর দিল—"তোকে জানিয়ে কী হত? আরও চিন্তায় চিন্তায় পাগল হয়ে যেতিস। আমরা তো যা করার করেছি। ডাক্তার প্রদীপ লাহিড়ির নার্সিং হোমে রণো প্রায় একমাস সাইকিয়েট্রিক ট্রিটমেন্টে ছিল। তারপর বাড়ি এসে কয়েকমাস ডিপ্রেশনের ওষুধ খেয়েছিল। আর কখনো ঐ ব্রেক ডাউনের ব্যাপারটা হয়নি। তবে রাগ আর জেদ বেড়ে গেছে। সেজন্যেই রণোর ইচ্ছেমতো ওকে কলকাতার বাইরে রেখেছি। এখানে ব্যাপারটা এত জানাজানি হয়ে গেছে, রণো আর কাউকে ফেস্ করতে চাইছিল না। ওর দোষও দেওয়া যায় না। তুই নিজেই ভেবে দ্যাখ্?"

নন্দিতা চিন্তিতভাবে বলল—"রণো কিন্তু ইন্ডিয়ায় আর থাকবে না রাকা। ওর জ্যাঠা, কাকারা যা শুরু করেছে, স্কুল পাশ করলেই নিয়ে যাবে দেখো।"

রাকা চমকে উঠল—"রণো তোমাদের কিছু বলেছে? মা, ওর বার্থ সার্টিফিকেট, ইউ.এস. পাসপোর্ট, এগুলো কোথায় আছে?"

গায়ত্রী মাথা নাড়লেন—"হ্যাঁ, সে সব আমার কাছে আছে। কিন্তু রণো চাইলে তো দিতেই হবে। সেদিন দিল্লি থেকে ফোনে আমায় বলল ইচ্ছে হলে নাকি এ বছরে শিকাগো চলে যেতে পারে। ওর বাপের লাইফ ইনশিওরেন্সের অনেক টাকাকড়ি, ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে যা ছিল, সব নাকি রণোর নামে জমা হয়ে আছে। পরে তাই দিয়ে ওখানে কলেজে পড়বে। শিকাগো থেকে মাধবনের দাদা আর তার অ্যাটর্নি ও রজতকে তাই জানিয়েছে। ছেলেকে তুই কিসের জোরে আটকে রাখবি রাকা? ও এখন আমেরিকা যাবে বলে খেপে উঠেছে! আজ না হোক, দু' বছর পরে তো যাবেই।"

রাকা প্রায় রাতারাতি দিল্লি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। কী মনে হতে অ্যারিজোনার জেল্-এ বসে লেখা বাংলা, ইংরিজী মেশানো ডায়েরিগুলো ব্যাগে ভরল। আজকাল অনেক কথা মনে থাকে না। হয়তো রণোর কাছে তাকে দীর্ঘ জবাবদিহি করতে হবে। রণো এখন নিজের দুর্ভাগ্যের জন্যে ক্রমশ মাকে দায়ী করছে। রাকা আগেও এই সম্ভাবনার কথা ভেবেছে। ছেলে যে তাকে নির্বিচারে মা বলে গ্রহণ করবে, ভবিষ্যতে কখনও কোনো প্রশ্ন তুলবে না, নিজের বিচার বুদ্ধি দিয়ে রাকার জীবনের ন্যায় অন্যায়ের বিচার করবে না, এমন অন্ধ ভালোবাসা আর মাতৃভক্তির প্রত্যাশা তার ছিল না। শুধু ছেলের কাছাকাছি থাকবে, নিজের সাধ্যমতো ওকে মানুষ করে তুলবে এই আশা নিয়ে বছরের পর বছর অপেক্ষা করেছিল। আজ বুঝতে পারছে, প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে অসম যুদ্ধ কখনও শেষ হবে না। হার মানার আগে তবু একবার শেষ চেষ্টা করা। রণো যদি চলেও যায়, যাবার আগে প্রকৃত ঘটনাগুলো জেনে যাক।

দিল্লিতে রাকার জ্যাঠামশাই-এর ছেলে দেবশংকরের বাড়িতে রাকার সঙ্গে রণোর আবার দেখা হল। কলকাতা থেকে ফোন পেয়ে ওরা রাকাকে চলে আসতে বলেছিল। রণোকে ও হস্টেল থেকে নিয়ে এসেছিল। দেবশংকররা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ডাক্তার। মেয়ে বিয়ে হয়ে বম্বেতে। ওদের ফ্রেন্ডস্ কলোনির বাড়িটা সারাদিন খালি পড়ে থাকে। রাকার মনে হচ্ছিল এরকম নিরিবিলিতে ছেলের সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে পারবে। রণোও এ বাড়িতে বেশ স্বচ্ছন্দ। দেবমামা আর মামীকে পছন্দ করে বোধহয়।

রাকা কিভাবে শুরু করবে ভাবছিল। সকালে জগিং করে ফিরে এসে, টি.ভি খুলে দিয়ে রণো নিজেই জিজ্ঞেস করল—"আমাকে হঠাৎ দেবমামা নিয়ে এলেন কেন? তুমি কি দিল্লিতে ক'দিন থাকবে? কাল জিজ্ঞেস করলাম। হি ওয়াজ নট ভেরি শিওর।"

রাকা কথা গুছিয়ে নিচ্ছিল—"থাকব হয়তো কয়েকদিন। লাস্ট-টাইম তোমার সঙ্গে একদিনও থাকা হয়নি।"

রণো অবাক—"আমার স্কুল নেই? দেবমামা কাল প্রিন্সিপ্যালকে বলে ডে-অফ্ করিয়ে নিয়ে এসেছেন। রোজ রোজ ক্লাস্ মিস্ করব নাকি?"

রাকা বলল—"আমি কি সেটা বলেছি? আজকের দিনটাই তো আমরা একসঙ্গে কাটাতে পারি। রণো, আমার অনেক কিছু বলার আছে। তার আগে একটা কথা জানতে চাই।"

রণো টি.ভি থেকে চোখ সরিয়ে নিল—"কি কথা? তাড়াতাড়ি শেষ করো। আমি চান করতে যাবো।"

—"না। অত তাড়া কোরো না। কথাগুলো ভালো করে শোনো। রণো তুমি কি শিকাগোয় যাওয়ার কথা ভাবছ?"

রণো টি.ভির দিকে তাকিয়ে একটু বাদে জবাব দিল—"আগে স্যাট্-এ বসব। দেখি স্কোর কেমন হয়। এনি ওয়ে, আমার তো স্টুডেন্ট ভিসার দরকার নেই। স্কুল কম্প্লিট করে এমনিতেই চলে যাবো।"

—"তারপর?"

—"দেন, হোয়াট? ওখানেই থাকব। দ্যাট ইজ মাই ওন্ কান্ট্রি।"

রাকা ব্যথিত গলায় বলল—"কিন্তু রণো, আমি তো কখনও ওদেশে যেতে পারব না। তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে কী করে?"

—"দেখা তো আগেও হয়নি। বাট ইউ সার্ভাইভড্। দিদিমাও তোমাকে না দেখে এত বছর কাটিয়েছেন।"

রণোর তীক্ষ্ণ কথাগুলো রাকাকে আঘাত করছিল। রাকা তবু জিজ্ঞেস করল—"তুমি কি জানো, যারা তোমাকে এ ব্যাপারে মোটিভেট্ করছে, তারা সত্যি সত্যি তোমার রেস্পনসিবিলিটি নেবে কিনা? হয়তো একটা কনস্পিরেসি করে আমাদের দুজনকে আলাদা করে দিতে চাইছে। জানে তুমি ইউ.এস. সিটিজেন। আর আমি ক্রীমিন্যাল অফেন্সে আমেরিকা থেকে ডিপোর্টেড হয়ে চলে এসেছি। আমার তো আর কাস্টডি নিয়ে লড়াই করার ক্ষমতা নেই।"

রণো রেগে উঠল—"কন্সপিরেসি বলছ কেন? ওরা আমার বাবার রিলেটিভ্। নিজের দাদা, ভাই, বোন। ওরা আমাকে নিয়ে যেতে চাইছে। সেটা অন্যায়?"

রাকা শান্তভাবে বলল—"না, সেটা অন্যায় নয়। কিন্তু রণো, জেল হসপিট্যালে তোমার জন্মের সময় এরা কোথায় ছিল? পরেও তো কেউ খোঁজ নেয়নি।"

—"নিয়েছিলেন কিন্তু তোমার অ্যাটর্নি বুঝিয়েছিলেন, তখন আমার যা বয়স, প্রথম কয়েক বছর দাদু, দিদিমার কাছে থাকাই ভালো। তাই তো ছিলাম। অ্যান্ড আই স্টিল থিংক দ্যাট ওয়াজ দ্য বেস্ট ডিসিশন দে টুক্ ফর মী।"

রাকা বুঝতে পারছিল রণোর সঙ্গে মাধবনদের বাড়ির লোকের যোগাযোগ হচ্ছে। ছেলের চোখে এখন আমেরিকার স্বপ্ন। জেদও কিছু কম নয়। রাকা আর কত বোঝাবে? দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে বসে রইল। রণো হঠাৎ জিজ্ঞেস করল—"একটা কথা আমি জনতে চাই মা। বাবার সঙ্গে তোমার রিলেশনশিপটা এত খারাপ ছিল কেন? দিদিমা যা পরে বলেছেন, বাবা খুব ভায়লেন্ট হয়ে যেতেন। তোমাকে ভীষণ মারতেন। সত্যি?"

রাকা ক্লান্ত গলায় বলল—"দ্যাট ওয়াজ এ লং স্টোরি। তোমার পুরোটা শোনার পেসেন্স থাকবে না। তবু তোমার জানা দরকার। হি ওয়াজ বেসিক্যালি এ স্যাডিস্ট পার্সন। হায়দ্রাবাদ বেড়াতে গিয়ে ট্রেনে মাধবনের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তারপর থেকে কনট্যাক্ট্ রাখত। যখন বিয়ের জন্যে প্রোপোজ করল, আমাদের বাড়িতে কি অশান্তি! বাবা কিছুতেই অন্ধের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবেন না। আমরা নিজেরাই বিয়ে করেছিলাম।। তারপরই ও ইউ.এস. এ চলে গেল। আমি গিয়েছিলাম মাস ছয়েক বাদে। দেশে থাকতে ঠিক বুঝিনি। ওখানে থাকতে থাকতে অশান্তি শুরু হল। মাধবন ভালো চাকরি করত। অথচ কী খারাপভাবে আমরা থাকতাম! টাকা পয়সা খরচ করতে দেবে না। কারুর সঙ্গে মিশতে দেবে না। দেশে ফোন করতে চাইলে প্রচণ্ড রাগ। অথচ নিজের বাড়িতে সমানে ডলার পাঠাচ্ছে। আমার ইচ্ছে অনিচ্ছের কোনো দাম ছিল না রণো। কোনো ব্যাপারে আপত্তি করলেই অমানুষের মতো মারত। তোমাকে অনেক কথা বলা যাবে না, আমি ক্রমশ বুঝতে পারছিলাম ও সুস্থ নয়। অদ্ভুত ধরনের সব সেক্শ্যুয়াল ডিজায়ার ছিল। আমার ঘেন্না করত, ভয় করত। তবু মেনে নিতে বাধ্য হতাম।"

রণো জিজ্ঞস করল—"তুমি সহ্য করতে কেন? সেপারেশন নিতে পারতে। ওখানে তোমাকে হেল্প করার কেউ ছিল না?"

—"বেশি কাউকে চিনতাম না। লজ্জার ব্যাপারটাও ছিল। মাঝেমাঝে খুব ভালো ব্যবহার করত। ক্ষমা চাইত। ভাবতাম স্বভাবের পরিবর্তন হচ্ছে। এর মধ্যে কনসিভ করে গেলাম। ও কোথায় খুশি হবে, তা নয়, গুম মেরে গেল। খরচপত্র বাড়বে ভেবে কী মেজাজ! এদিকে বোনের বিয়ের জন্যে পাঁচ হাজার ডলার দেশে পাঠিয়ে দিল।"

—"তোমার বাচ্চা হবে জেনেও মারধর করত? তাহলে চাইতটা কী? তুমি, আমি দুজনেই মরে গেলে খুশি হত? আমি বুঝতে পারছি না একজন মানুষ কী করে এত খারাপ হতে পারে?"

রাকা ম্লান হাসল—"বিশ্বাস হয় না নারে? ওকে বাইরে থেকে দেখে কেউ ভাবতেই পারত না, লোকটা কতখানি নিষ্ঠুর হতে পারে। শেষদিকে আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। একটা ব্যাপারে ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। মাধবন হঠাৎ আমার নামে একটা লাইফ

ইনশিওরেন্স করল। যদি হঠাৎ মরে যাই, ও তখন থ্রি হান্ড্রেড থাউসেন্ড ডলার পাবে। আমাকে বোঝাল অনেকেই এরকম করে। যদি বাচ্চা হতে গিয়েও মরে যাই, সেই বাচ্চাকে দেখাশোনা করার জন্যে তো ওকে লোক রাখাতে হবে। তার খরচ আছে। ভেবে দ্যাখ্ রণো, এ সব কথা কারুর মাথায় আসে?"

রণো শুনছিল। রাকার কথার উত্তরে বলল—"তার মানে তুমি বলতে চাইছ, বাবা অন্য কিছু প্ল্যান করছিল। কিন্তু সবই তো তোমার নিজের গেসিং-এর ব্যাপার। প্রমাণ তো কিছু পাওনি?"

রাকা উত্তেজিত হল—"কি জানতে চাইছিস স্পষ্ট করে বল্। আমি কেন তোর বাবাকে খুন করেছিলাম সে কথাই তো?"

রণো সমান মেজাজে উত্তর দিল—"হ্যাঁ, তাই। তুমি যতই টর্চার সহ্য করে থাকো, নিজেকে জাস্টিফাই করতে যেও না। তুমি বাবাকে ছেড়ে চলে যেতে পারতে। পুলিশের হেল্প নিতে পারতে। বাট হোয়াই ডিড ইউ কিল্ হিম্? আর সেটাও যথেষ্ট প্ল্যান্ করে করেছিলে।" রণো হাঁফাচ্ছে। উত্তেজনায় ওর শরীর কাঁপছে। রাকা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। আবার কি ওর নার্ভাস ব্রেক ডাউন হবে? রাকা কেন এত কথা বলতে গেল? রণোর বয়েসটা ভুলে গিয়েছিল। চোদ্দ-পনের বছরের একটা ছেলে আর কত মানসিক চাপ নিতে পারবে?

রণোকে দু' হাতে জড়িয়ে ধরে রাকা শান্ত করার চেষ্টা করল—"রণো, আর পুরোনো কথা তুলব না। যা হয়েছে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা কর। যেখানে গেলে ভালো থাকবি, সেখানেই চলে যা।"

রণো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। রাকা জানলা থেকে দেখল ও নীচের লনে গিয়ে গেট্ম্যানকে কী জিজ্ঞেস করছে। একটু বাদে উপরে এল। রাকা ভয়ে ভয়ে বলল—"চান করতে যাবি বলেছিলি। লাঞ্চেরও তো সময় হয়ে গেল। যা করবি করে নে। খিদে পায়নি?"

রণো বাথরুমের দরজার কাছ থেকে উত্তর দিল—"লাঞ্চ রেডি করতে পারো। দশ-পনের মিনিটের মধ্যে আসছি।"

খেতে বসে বিশেষ কথা হল না। পরে রাকা যখন একটা বই নিয়ে বসেছে, রণো ঘরে এল।—"তুমি কী দুপুরে ঘুমোও?"

রাকা নড়েচড়ে বসল—" না। এমনিতেই ইনসম্নিয়ার প্রবলেম। দুপুরে শুলে আর রাতে ঘুম হবে না।"

—" তাহলে স্টোরিটা শেষ করো। আমি শেষটা শুনতে চাই। জানি, তুমিই শুধু সত্যি কথা বলবে।"

রাকা জিজ্ঞস করল—"শুনে তোর কী লাভ? কিছু তো ফেরানো যাবে না। শুধু শুধু দুজনেরই মন খারাপ হবে।"

রণো বলল—"নতুন করে আর কী মন খারাপ হবে? ওটা তো কন্স্ট্যান্ট ফ্যাক্টর। তাও সত্যি ঘটনাটা জানতে পারব।"

রাকা যেন সেই দুর্যোগের রাতে ফিরে গেছে—"আমার তখন মৃত্যুভয় ঢুকেছিল। তার ওপর তুই পেটে। যে দিন শুনলাম আমাকে নিয়ে একটা ক্যানালে বোটিং করতে যাবার প্ল্যান

করছে, কেমন সন্দেহ হল। কি জানি কী মতলব? হয়তো জলের মধ্যেই ঠেলে ফেলে দেবে। বোটিং-এ যাবো না বলাতে প্রচণ্ড রেগে গেল। খেতে বসেছিলাম, আমার থালা সুদ্ধু ভাত, তরকারি নিয়ে ছুঁড়ে গারবেজে ফেলে দিল। তারপর ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। আমি অনেকক্ষণ লিভিং রুমে বসে থাকলাম। এক সময় বেডরুমে গিয়ে দেখি মাধবন ঘুমিয়ে পড়েছে। তখনই মনে হল, ওর হাত থেকে যেমন করে হোক বাঁচতে হবে। কথায় কথায় খুন করবে বলে ভয় দেখায়, গলা টিপে ধরে। আজ আমাকেই বেঁচে থাকার শেষ সুযোগটা নিতে হবে। বাথরুম থেকে লিকুইড ব্লীচের বোতল আর কিচেন নাইফটা নিয়ে যখন বিছানার কাছে গেলাম হঠাৎ মনে হল—আমি কি পাগল হয়ে গেছি। নয়তো মানুষটাকে খুন করতে যাচ্ছি কী করে? ঠিক সেই মুহূর্তে মাধবন ঘুমের মধ্যে নড়ে উঠল। মরীয়া হয়ে ব্লীচের খোলা বোতলটা ওর মুখের ওপর ঢেলে দিয়েছিলাম। জ্বালা, যন্ত্রণায় চোখ খুলতে পারছিল না। ঘুম ভেঙে উঠে বসতে যাচ্ছিল। তার আগে কিচেন নাইফটা ওর বুকে বিঁধিয়ে দিয়েছি। বুকে, পেটে কতবার যে স্ট্যাব্ করেছিলাম জানি না। যখন অ্যাম্বুলেন্স এল, তখন প্রায় শেষ অবস্থা।''

রাকার কথা শেষ হল। তারপর কতক্ষণ দু'জনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। আর কোনো প্রশ্ন নেই। উত্তর দেবার দায় নেই। কখন নিঃশব্দে এক বোঝাপড়া হয়ে গেছে।

পরের বছর রণো শিকাগো চলে গেল। যাবার আগে কলকাতায় এসেছিল। সবাইকে বলে গেল পড়াশোনা শেষ করে একবার দেখা করতে আসবে। যাবার দিন রাকাকে বলল—''নীলার কমপিউটারেই মেইল্ করবো। মাঝেমাঝেই খবর পাবে।''

মাসে দু-একবার রণোর ই-মেল্ আসে। মাধবনের দাদার বাড়িতে রজত ফোন করলে রাকা ছেলের সঙ্গে একটু কথা বলতে পারে। রাকা সেই সব দিনের অপেক্ষায় থাকে।

রাকা একটা বেবী ক্রেস-এ চাকরি নিয়েছে। বাচ্চাগুলোকে নিয়ে খেলা করে। ক্রেয়ন দিয়ে ছবি আঁকতে শেখায়। দেশ বিদেশের গল্প বলে। ছুটির পর ওদের মায়েরা আসে। বাচ্চাগুলো খেলা ফেলে ছুটে যায়। রাকা ভাবে শুধু এই ভূমিকার জন্যে কত আকাঙ্খা, প্রস্তুতি, ত্যাগ স্বীকার। বুকের ভেতর মুহূর্তের জন্যে পরিপূর্ণতার অনুভূতি ছলছল করে ওঠে।

শুধু, হঠাৎ গভীর রাতে সেই অদৃশ্য ঘড়িটা বেজে ওঠে। ধাতব শব্দে জানায়—সময় শেষ হয়ে গেছে।

অবসর

অফিস থেকে রিটায়ারমেন্ট প্যাকেজ পেয়ে মানস একটু মুষড়ে পড়েছে। পঁয়ষট্টি বছর বয়স হয়েছে বলে রিটায়ার করতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। মানসের চেয়ে বড় লোকগুলোও চাকরি চালিয়ে যাচ্ছে। ও ইন্ডিয়ান বলে ভাগিয়ে দিলে, তাও নয়। প্রসেস্ ডিভিশানের নীলেশ দেশাই, স্ট্রাক্চারালের অরুণ গুলাটি তো দিব্যি টিকে রয়েছে। মানসের ধারণা নন্-বেঙ্গলিরা বয়স ভাড়ায়। মাঝখান থেকে অনেস্ট মানসের চাকরি শেষ হয়ে গেল। বাবার সততার প্রাইজ! স্কুলে ওদের তিন ভাই বোনের ঠিক ঠিক বয়স লিখিয়ে এসেছিলেন, অথচ মানসের বউ নন্দিতার পাসপোর্টে এক বছর কমানো আছে।

মানস রিটায়ারমেন্টের খবর দিতে নন্দিতা ভুরু কুঁচকে বলেছিল—"তুমি কিছু নেগোশিয়েট করো। অফিসে কন্ট্র্যাক্ট বেসিসে কাজ নিয়ে নাও। এখন থেকে বাড়ি বসে থাকলে ডিপ্রেশান হবে।"

মানস প্রথমে কনসালটেন্সির কথা ভেবেছিল। এ অফিসে না হোক, অন্য কোম্পানিতে চেষ্টা করতে পারে। এযার পড়াশোনা শেষ। বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলেও ল পাশ করে চাকরিতে ঢুকেছে। মানসের দায়িত্ব মোটামুটি শেষ । অফিস থেকে রিটায়ারমেন্ট প্যাকেজও ভালোই দিয়েছে। তবু যতদিন কাজকর্ম নিয়ে থাকা যায়। কিন্তু নন্দিতা এরকম ডিম্যান্ড করবে কেন? বাড়ি বসে দু'দিন জিরোনোর আগেই মানসকে চাকরি খুঁজতে পাঠাচ্ছে! না হলে নাকি ডিপ্রেশন হবে! সাইকোলজির গুষ্টির পিণ্ডি। সেই একুশ বছর বয়স থেকে মানস চাকরি করে যাচ্ছে। সকলের শুধু ডিম্যান্ড। চাকরি পাওয়ার প্রথম মাস থেকে মা, তারপর আমেরিকায় এসে বউ। দুজনের খরচের ঠেলায় অস্থির। তবু নন্দিতা নিজে চাকরি করে কিছুটা সামাল দিয়েছে। মা চলে যেতে ওদিকের খরচ কমেছে। তাও গতবার দেশে গিয়ে মার পুরোনো আয়া যমুনাকে পাঁচ হাজার টাকা দিতে হল। মা নাকি ওকে কথা দিয়ে গেছে, মানস মাঝে মাঝেই ওকে 'পেনশেন্ট' পাঠাবে। মা কোনোদিন ছেলের দিকটা বুঝতে চায়নি। এবার দিদিও জ্ঞান দিতে শুরু করেছে। মানস কিছুতেই ঐ ঝরঝরে বাড়ি সারাবে না। সারাজীবন খালি জলছাত সারাও, রং করাও, জলের পাম্প, ইলেক্ট্রিক লাইন বদলাও। মানস একেবারে ফেড-আপ। কোনোদিন ওখানে থাকতেও যাবে না। ভাগও চাইবে না। দিদি আর বুলু যা ইচ্ছে করুক।

কিন্তু নন্দিতারও কি কোনো সহানুভূতি আছে? একবারও বলেছে মানস এবার তুমি রেস্ট নাও? সে টাইপ্-ই নয়। নন্দিতার ভাবখানা হচ্ছে এখনই বিশ্রাম কিসের? শরীরে যতদিন শক্তি আছে কাজ করে যাও। গীতার কর্মযোগ নিয়ে লেকচার দিতে আসে। ওর বাবা নাকি আশি বছর পর্যন্ত হোমিওপ্যাথির ডাক্তারি করতেন। কী বিরাট ধন্বন্তরী রে! সেই কর্মযোগেও তো সংসার চলত না। নন্দিতা বাপের বাড়িতে কম অর্থ যোগ করে গেছে?

যাক্ গে, মন ছোট করা উচিত নয়। মানসের সামনে এখন অখণ্ড অবসর। সারাদিন যা ইচ্ছে, তাই করবে। নন্দিতা ছ'টার আগে ফেরে না। অফিসে বসে মানসকে রিমোট কন্ট্রোলে চালাতে গেলেও সুবিধে হবে না। মানস 'কলার আইডি'-তে নম্বর দেখে দেখে ফোন তুলবে।

নন্দিতার রুটিন উড়িয়ে দিয়ে মানস ইচ্ছেমতো চলতে শুরু করল। অনেক রাত অবধি টি.ভি দেখে। বই পড়ে যখন শুতে যায়, নন্দিতা অঘোর ঘুমে। মানস সলিড ঘুমোয় ভোরের দিকে। নন্দিতা অ্যালার্ম বন্ধ করে, চান সেরে আটটায় অফিস চলে যায়। গ্যারাজ বন্ধ হওয়ার ঘড়ঘড় আওয়াজ শুনতে শুনতে মানস আবার ঘুম লাগায়।

মানসের রুটিন বেশ রিল্যাক্সিং। বেলায় ঘুম থেকে উঠে চা আর দুধ সিরিয়াল খায়। নিউইয়র্ক টাইম্স পড়ে। তারপর গাড়ি নিয়ে শপিং মলে হাঁটতে যায়। রাস্তায় একা একা হাঁটা বেশ বোরিং। তার চেয়ে ইনডোর শপিং মল্-এ অনেকটা হেঁটে নেওয়া যায়। আইডিয়াটা ওকে বীরেনদা দিয়েছে। মাথার ওপর রোদ নেই, কনকনে হাওয়া নেই, হঠাৎ বাজ পড়ার ভয় নেই। মানস রোজ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কথাটার মর্মগ্রহণ করতে করতে বিরাট শপিং মল্ চষে বেড়ায়। দুপুরে ওখানে ফুড্কোর্টে বসে লাঞ্চ খায়। নন্দিতাকে ভাজাভুজি খাওয়ার কথাটা ভাঙে না। বাড়ি এসে আপেল, শশা, আঙুর-টাঙুর যা থাকে খেয়ে নেয়। অফিসে এতকাল লাঞ্চে ফল আর বাদাম নিয়ে যেতো। নন্দিতা এখন জিজ্ঞেস করে—বাদাম-টাদাম খাচ্ছো না কেন? শুধু ফ্রুট্স খেয়ে চালাচ্ছো? এবার আমাকেও ওয়েট লুজ করতে হবে।

মানস সতর্ক হয়ে যায়। ফুডকোর্টে গিয়ে পিত্জা, চাইনিস প্ল্যাটার, হ্যামবার্গার সবই ক্যাশ ডলার দিয়ে কিনে খায়। নয়তো নন্দিতা যখন ওদের দুজনের ক্রেডিট কার্ডের বিল্ পেমেন্ট করতে বসবে, মানস ধরা পড়ে যাবে।

ক্রমশ মানসের খাওয়ার লোভ কমে এল। হাঁটতে গিয়ে মল্-এ এক কাপ কফি। দুপুরে বাড়ি এসে ছোট্ট স্যান্ড্উইচ নয়তো স্যুপ্। ফলটল আর পোষাচ্ছে না, তার বদলে ঝাল চানাচুর, ম্যাড্রাসি মড়ক্কু নিয়ে খানিকক্ষণ 'সি এন্ এন্'-এ খবর শোনে। চান তো সকালে সেরে বেরোয়। মানসের এই সময়টাই কাটতে চায় না।

মানস তখন ইনটারনেট-এ দেশের খবর পড়ে। ডাউনলোড করে মানবেন্দ্রর গান শোনে। 'যে মাধুরী দিয়ে মোর শূন্য জীবন তুমি ভরালে....' আহা! কী গান ছিল! মানস ভাবে পন্দিতা কি ওকে "যে মাধুরী" দিয়েছে? অবশ্য শূন্য জীবন আর কবে ছিল? এঞ্জিনিয়ারিং কলেজেই নন্দিতা ওর জীবনে ঢুকে পড়েছে। তারপর এষা, শুভ। লাইফ সে দিক থেকে কমপ্লিট। কিন্তু "যে মাধুরী"? মানস বুঝতে চেষ্টা করে নন্দিতার সঙ্গে ওর সম্পর্কটা কেমন? খরচাপত্র নিয়ে ঝগড়া, এষা, শুভকে শাসন করা নিয়ে তর্কাতর্কি, লোকের বাড়িতে গিয়ে মানসের স্পষ্টবক্তা হওয়ার দোষে গাড়িতে ফেরার সময় নন্দিতার ঝংকার, মানসের বোনেদের সমালোচনা করতে বসে নন্দিতার মন্তব্য শুনে মানসের রাগারাগি। এই সব ছোটখাটো ঝগড়াঝাঁটি ছাড়া সেরকম অশান্তি কখনও হয়নি। সে দিক থেকে দেখতে গেলে নন্দিতাই বরং অনেক বেশি অ্যাডজাস্ট্ করেছে। ফুলটাইম চাকরি করে দুটো ছেলেমেয়ে মানুষ করা, সংসারের কাজকর্ম—নন্দিতা সবই তো নিজের ঘাড়ে নিয়েছে। ওরই বা রেস্ট হল কোথায়? ভাবতে ভাবতে মানসের মনটা দ্রব হয়ে আসছিল।

কিন্তু মানস তো কতবার ওকে চাকরি ছেড়ে দিতে বলেছে। নন্দিতা বলত অনেক কষ্ট করে বাবা আমাকে এঞ্জিনিয়ারিং পড়িয়েছিলেন। প্রফেশানটা ছেড়ে দেবো? মানস বুঝতে পারত ওর কাছ থেকে টাকা নিয়ে নন্দিতা নিজের বাড়িতে হেলপ্ করতে চায় না। কিন্তু তার জন্যে এষা, শুভর ছোটবেলাটা ডে-কেয়ার সেন্টারে কাটল। এই একটা কষ্ট মানসের মনে রয়ে গেছে। কিন্তু আজ এ সব ভেবে কী লাভ?

কয়েকদিন পরে মানস বাগান নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এককালে তরকারির বাগানের সখ হয়েছিল। ঝাল বিষ-লঙ্কা, শশা, বেগুন, টমেটো, স্কোয়াশ ঢের ফলিয়েছিল। তারপর সখ মিটে গেছে। বাঙালিদের ক্লাব হল। মানস তখন থিয়েটার করছে। কোরাস গান গাইছে। উইক-এন্ডে বাগান করার সময় কোথায়? আজ এত বছর পরে দিনের বেলা অফুরন্ত সময় পেয়ে মানস জমি কোপাতে বসল। চৌকো চৌকো জায়গা ভাগ করে নিয়ে লাউ, কুমড়ো, করলা, বেগুনের চাষ আরম্ভ করল।

একদিন বিকেলে নন্দিতা বলল—"ভালো একটা একসারসাইজ হচ্ছে। কিন্তু এত তরকারি খাবে কে?"

—"কেন? এষাদের দেবো।"

—"এরিক্‌কে করলা খাওয়াবে? লাউ, কুমড়োও এষা খাবে নাকি?"

মানস সরু কাঠের মাচার ওপর পুঁই ডাল লতিয়ে দিয়ে বলল—"এষাকে সেপ্টেম্বরে কুমড়ো দেবো। হ্যালোউইনে বাড়ির সামনে রাখবে। থ্যাঙ্কস গিভিং-এর ডিনারে পামকিন পাই বানাবে।"

নন্দিতা সবুজ বাগানের দিকে চেয়ে থেকে বলল—"দেশে জিনিসপত্রের কী দাম বেড়ে গেছে। তরিতরকারি কিনতেও কত খরচ।"

রান্নাঘরে ফোন বাজছে। নন্দিতা শুনতে পেয়ে ভেতরে চলে গেল। মানস বাইরের ডেক্-এ বসে ভাবছিল ক্লাবের কাকে কাকে তরকারি উপহার দেওয়া যায়। সামনে পিক্‌নিক্। গাড়ির পেছনে একটা ডাব্বা বসিয়ে লংকা, টমেটো, কচি করলা, শশা, বেঁটে বেগুন ছড়িয়ে দেবে। তার উপর ডাটা পাতা সুদ্ধু পুঁই শাক। ডাব্বার পাশে পাশে পাঁচ-ছ'টা লম্বা লাউ। এ যাত্রা একপ্রস্থ বিদায় হোক। লিবার্টি মুভি হলে হিন্দি বই দেখার দিন আবার ডাব্বা সাজিয়ে নিয়ে যাবে। ছোটবেলায় ওয়াক থু করলেও বাঙালি এখন করলা পাগল। কুমড়োডাঁটা নিয়ে টানাটানি। মানস যত পাবে বিলিয়ে দেবে। এখন তো প্রায় আগাছার মতো শাক পাতা গজাচ্ছে।

পিকনিকের আগের দিন বাগানে তরকারি তুলতে গিয়ে মানস স্তম্ভিত। টমেটোগুলো ফোঁপরা হয়ে ঝুলছে। শশার পেটে খোঁদল। কচি বরবটিগুলো মাটিতে ছিব্‌ড়ে হয়ে পড়ে আছে। নিশ্চয়ই বদমাইস কাঠবেড়ালির কাজ। খরগোসও কম লোভী নয়। মাঝে কোত্থেকে গ্রাউন্ডহগ্ ঘুরঘুর করছিল। সব ক'টা মিলে মানসের সাজানো বাগান তচনচ করেছে। শুধু দয়া করে লাউগুলো ছোঁয়নি। আচ্ছা, হরিণ কি টমাটো খায়? ইদানীং রোজ রোজ এসে জুটছে। ফুলগাছ মুড়িয়ে খাচ্ছে। ওগুলো হরিণের স্বভাবই নয়। গোরুর মতো মশমশ করে ঘুরে বেড়ায়। ভয় ডর নেই। আকাশের দিকে মুখ করে পাতা চিবোয়। মানস এবার ওদের একে

একে শায়েস্তা করবে। পিকনিকে ক'জন শুধু লাউ পেল। করলাও দান করা হয়েছে। কেউ লংকা আর বেগুন পেয়েই খুশি। মানস কাঠবেড়ালি আর খরগোসদের জব্দ করার জন্যে ক্লাবের মধুছন্দার কাছে টিপ্‌স নিল। প্রথমে হরিণ তাড়ানোর জন্যে স্প্রে কিনতে হবে, সঙ্গে কাঠবেড়ালি ধরার খাঁচা। মধুছন্দা বলে দিল জিনিসগুলো "হোম্ ডিপো"-তে কিনতে পাওয়া যাবে।

দু'দিন পরে মানস ব্যাধের ভূমিকা নিল। তবে মা নিষাদ অবধি খুনোখুনিতে যাবে না। ঝোপঝাড়ে স্প্রে দিয়ে হরিণের বেড়া টপ্‌কানো বন্ধ করবে। আর খাঁচার ভেতরে গাজর ঝুলিয়ে কাঠবেড়ালী ধরবে। তারপর খাঁচাসুদ্ধু হাইওয়ে ধরে পনেরো মাইল। ক্যাপ্টেনকিল্‌রয় পার্কে ছেড়ে দিয়ে এলে আর তাদের মানসধামে ফিরতে হবে না। বেড়ালের সঙ্গে চেহারাতেও মিল নেই। স্বভাব চরিত্রেও মিল নেই। কাঠবেড়ালীর পক্ষে মাছের গন্ধ শুঁকে শুঁকে কালীঘাট পার্ক থেকে বকুল বাগান ফিরে যাওয়া অসম্ভব। মানস একেবারে পাকা প্ল্যান করে নিয়েছে। এরা নিশাচর নয়। দিনদুপুরেই হাতে নাতে ধরা পড়বে।

গাছে স্প্রে ছড়িয়ে মানস দুটো খাঁচায় গাজর ঝোলাল। এমন কায়দার খাঁচা যে, গাজর অবধি যাওয়ার আগেই ল্যাজের ওপর দরজা পড়ে যাবে। নন্দিতার এসব পছন্দ নয়। সকালে অফিস যাওয়ার আগে বারবার বারণ করে গেছে। মানস আর এখন কাউকে কেয়ার করে না। না বস্‌কে না বউকে। নিজের বাগানে বসে যখন যা ইচ্ছে করবে। খাঁচা ফিট্ করে দিয়ে মানস গাড়ি নিয়ে শপিং মলে পৌঁছে গেল। আজকাল বেশ জোরে জোরে হাঁটছে। "স্টারবাকস্"-এর কফি শপে ঢোকার আগে শুভকে ফোন করল—"কিরে? লেবার-ডে উইক-এন্ডে আসবি তো? আগে থেকে জানাস। তাহলে নেমন্তন্ন নেব না।"

শুভ নিউইয়র্ক থেকে প্রায়ই আসে। এবার অনেকদিন আসতে পারেনি। মানসকে বলল—"আর ইউ ফিলিং বোরড্ ড্যাড্? ইউ ক্যান্ কাম টু মী। সিটিতে দু-চারদিন ভালোই লাগবে।"

—"তুই তো রাত অবধি অফিসে বসে থাকিস। নিউইয়র্ক দেখার জন্যে কে যাবে? আমি খুব একটা বোরড্‌ও ফিল্ করছি না। বই পড়ছি। বাগান করছি।"

শুভ হাসছে—"হোয়াই ডোন্ট্ ইউ ট্রাই সাম্ কুকিং? মাকে ইমপ্রেস্ করতে পারো।"

—"শিখতেই পারি। রান্নাটা কোনো বিগ ডীল নয়। হোয়াটেভার ইউ কুক্, স্প্রিংকল সাম্ মশলা। দেন বয়েল ইট্।"

শুভ লেবার-ডে উইক-এন্ডে বাড়ি আসার আগে মানস গোট বিরিয়ানিটা প্র্যাক্‌টিস করে নেবে। নন্দিতা কোনো মোগলাই রান্না জানে না। শেখার ইচ্ছেই নেই। মানস এডিসনে গিয়ে "শা-নওয়াজের" ওয়াসিমের কাছে রেসিপিটা জেনে আসবে। মানস এ পর্যন্ত কোনো কাজ ডোবায়নি। শুধু প্রথম প্রথম নিজে বাড়ি রং করতে গিয়ে যা ধেড়িয়েছে। একস্‌পেরিয়েন্সের অভাব। কিন্তু এখন একটা কন্‌ফিডেন্স এসে গেছে। আই ক্যান টেক্ এনি চ্যালেঞ্জ.....

"স্টারবাক্‌স্"-এ কফি খেতে বসে মানসের খেয়াল হল তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে। দুখানা খাঁচা বসিয়ে এসেছে। কাঠবেড়ালিরা কি আর গাজরের লোভে ভেতরে ঢোকেনি? তাহলে তো মানসের এখন অনেক কাজ। নন্দিতা ফেরার আগে ও দুটোকে পার্কে ছেড়ে আসতে হবে। তারিয়ে তারিয়ে কফি খাওয়ার সময় নেই। মানস হনহন করে গাড়িতে গিয়ে বসল।

বাড়ি ফিরে পেছনের বাগানে ঢুকে চক্ষুস্থির। খাঁচার ভেতর অচিন কাঠবেড়ালি জুলজুল চোখে চেয়ে দেখছে। মস্ত ল্যাজটা খাঁচার বাইরে। মানসকে দেখেই বোধহয় হাঁচোড়-পাঁচোড় শুরু করল। অন্য খাঁচাটা খালি। গাজর যথাস্থানে। একটার দশা দেখে বাকিগুলো আর খাঁচার ধার মাড়ায়নি। কিন্তু সারা মাঠ ছুটে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ করে বন্দিবীরের খাঁচার পাশে এসে বসছে। মানস একটু ঘাবড়ে গেছে। এতগুলো কাঠবেড়ালির ছুটোছুটির মধ্যে দিয়ে ওকে খাঁচাশুদ্ধ বন্দিবীরকে গাড়িতে তুলতে হবে। সব ক'টা মিলে কামড়াতে আসবে না তো? এমনিতে নিরীহ জীব। নিজেদের মধ্যে প্রেমের জাপ্‌টাজাপ্‌টি ছাড়া আঁচড়ানো, কামড়ানো জানেই না। কিন্তু বন্ধুর বিপদ দেখলে চার-পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়া অসম্ভব নয়। মানস চট করে বাড়ি ঢুকে গেল। তারপর এক ঘণ্টা ধরে জানলা দিয়ে নিরীক্ষণ। নাঃ! দুটো-একটা কেটে পড়েছে বটে। বাকিগুলো ফিরে আসছে। কিংবা নতুন ব্যাচ। খাঁচার ভেতর কাঠবেড়ালিটা কেমন ঝিম মেরে পড়ে আছে। সর্বনাশ! মরে গেল নাকি? ল্যাজে বাড়ি খেয়ে অপমৃত্যু! মানসের বিবেক দংশন হচ্ছে। ক'টা টমেটোর জন্যে প্রাণী হত্যা করল। নন্দিতা আজ বাড়ি এসে হুলুস্থূল করবে। মরা কাঠবেড়ালি শুদ্ধু খাঁচা নিয়ে মানস এখন কোথায় ফেলতে যাবে? মধুছন্দার কুবুদ্ধিতে কী ঝামেলায় পড়ল!

আরে! ওটা আবার মাথা উঁচিয়ে দেখছে। তার মানে মরেনি। বাঁচা গেল। এখনই অ্যাকশন নিতে হবে। মানস সোজা ড্রাইভ-ওয়েতে গিয়ে গাড়ির পেছনের, দরজা খুলল। না, ব্যাক্‌সিটে বসানো যাবে না। স্পিডের মাথায় যদি খাঁচা সুদ্ধু ওর ঘাড়ে এসে পড়ে। খাঁচাটাকে গাড়ির ট্রাংকে রাখবে। ঢাকাটা একটু খুলে রাখবে। ঐটুকু নাকের পক্ষে এনাফ্ অক্সিজেন।

বাগানে গিয়ে দেখল দুটো কাঠবেড়ালি তখনো খাঁচার আশেপাশে লাফ মেরে বেড়াচ্ছে। মানসের আর দেরি করার সময় নেই। বাগানে স্প্রিংকলার চালিয়ে দিল। জলের তোড় বেশি নয়। অন্য সময় কাঠবেড়ালিরা ঐ জলেই দলে দলে ধারাস্নান করে। কিন্তু আজ জলকেলির দিন নয়। বন্ধুর দূরবস্থা দেখে এমনিতেই ভয় পেয়েছে। তার ওপর আচম্‌কা জলের ঝাপটা খেয়ে তিন লাফে ওক্ গাছের গুঁড়ি ধরে দুটোই ওপরে উঠে পড়ল। খাঁচার ভেতর বন্দিবীর ভিজে একেবারে ল্যাজে গোবরে।

মানস খাঁচা দুলিয়ে গাড়িতে বসাল। বিকেল হয়ে আসছে। উত্তেজনায় খাওয়া-দাওয়া হয়নি। কাঠবেড়ালিটা মরে গেছে ভেবে তখন এমন বাজে ফিলিং হচ্ছিল, লাঞ্চ খাওয়া আর হল না। দ্যাট্‌স্ নাথিং। কাজটা তো হল। মানস পনেরো মাইল গাড়ি চলিয়ে ক্যাপ্টেন কিল্‌রয় পার্কে পৌঁছাল। একটু ফাঁকা মতো জায়গা দেখে খাঁচাটা নামাল। কাঠবেড়ালি নড়েচড়ে বসেছে। ভয় নাই ওরে ভয় নাই। এবার তোর মুক্তি। মানস কায়দা করে খাঁচার দরজা খুলে দিল। ভেজা কাঠবেড়ালিটা তখনো বোকার মতো ভেতরে বসে আছে। মানস পেছন থেকে খাঁচার গায়ে একবার লাথি মারল। কাঠবেড়ালি থতমত খেয়ে বেরিয়ে পড়েছে। অচেনা জায়গা, দলবল নেই। একটু দূরে গিয়ে করুণ মুখে বসে রইল। মানসের দুঃখ হচ্ছিল। খালি খাঁচাটা গাড়ির ট্রাংকে পুরে মনে মনে বলল—দ্যাট্‌স ইট। আয়্যাম্ নট গোইং টু ডু ইট এনি মোর।

মানস এখন চাষবাস ছেড়ে রান্নার দিকে ঝুঁকেছে। কিন্তু ভাত আর মাইক্রোওয়েভে খাবার

গরম করা ছাড়া নন্দিতা ওকে কিছ্ছু করতে দেবে না। মানসের রাগ ধরে যাচ্ছে। দুটো একটা এক্সপেরিমেন্ট না করলে গোট্ বিরিয়ানির ভেঞ্চার নেওয়া যায়? এষাও মার সঙ্গে তাল দিচ্ছে। সেই এক কথা—"তুমি দুপুরবেলা ভলান্টারি সার্ভিস করো।"

মানস বলে—"কেন রান্না করাও তো সার্ভিস। সারাদিন এত সময় পাই, তোর মাকে একটু সার্ভিস দিতে পারি না? এতকাল হেল্প করিনি। নাউ, আই লাভ টু ডু ইট।"

নন্দিতা, এষার কী হাসি! নন্দিতা তারপরেই শাসাল—"না, আমি সিরিয়াস্‌লি বলছি, তুমি একা বাড়িতে রান্নাটান্না করতে যাবে না। যা ভুলো মন, কোন্‌দিন আগুন লাগিয়ে বসবে।"

শেষপর্যন্ত নন্দিতার শাসানিতে কাজ হল না। মানস হংকং থেকে চুনোমাছ কিনে আনল। ছোট ছোট স্কেল্‌ট, পুঁটির বাচ্চার মতো চক্‌চকে কী একটা মাছ, মিলিয়ে মিশিয়ে দু' পাউন্ড নিয়ে এল। দুপুরবেলা তাদের গায়ে এক খাবলা নুন হলুদ মাখাল। বিরাট ফ্রাইপ্যানে গল্‌গল করে তেল ঢেলেই ভাবল সাত-তাড়াতাড়ি মাছ ভাজবে কেন? নন্দিতা ফেরার ঠিক আগে আগে কড়কড়ে করে ভেজে রাখবে। দুজনে ডালের সঙ্গে জমিয়ে খাবে।

মাছ ভাজায় ক্ষান্ত দিয়ে মানস ফ্যামিলি রুমে টাইম ম্যাগাজিন নিয়ে বসল। বিকেলের দিকে এক কাপ চা খায়। রান্নাঘরে গিয়ে কেটলিতে জল বসিয়ে ফিরে এল। মন দিয়ে প্রেসিডেন্‌শিয়াল ইলেকশানের খুঁটিনাটি পড়ছে, হঠাৎ পোড়া পোড়া গন্ধ পেল। চায়ের জল তো পোড়ার কথা নয়। কেট্‌লি থেকে হুইস্‌লও বাজল না। জল এতক্ষণে ফুটে যাওয়ার কথা। মানস রান্নাঘরে ঢুকে দেখল ফ্রাইপ্যান থেকে দাউদাউ করে তেল জ্বলে যাচ্ছে। ক্যাবিনেটের নীচের দিকে এখনই আগুন ধরে যাবে। মানস ছুটে গিয়ে ফ্রাইপ্যানসুদ্ধু গরম তেল সিঙ্কে ঢালতে গেল। গরম হ্যান্ডেলটা আল্‌গা হয়ে ওর হাতের ওপর ফ্রাইপ্যান উল্টে পড়ল। হাত থেকে কনুই অবধি পুড়ে যাচ্ছে। অসহ্য জ্বালায় মানস বাঁ হাতে কল খুলে পোড়া হাতটা ধরে থাকল। প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে। গাড়ি চালিয়ে হাসপাতালে যাওয়ার ক্ষমতা নেই। মানস "নাইন ওয়ান ওয়ান" এমার্জেন্সি নম্বরে ফোন করল। আর তখনই চোখে পড়ল ইলেকট্রিক আভ্‌নের বার্নার এখন জ্বলছে, কেটলির নীচের বার্নার নয়। ও ভুল করে ফ্রাইপ্যানের নীচের বার্নারের সুইচ্ টিপে দিয়েছিল। ইলেক্‌ট্রিক বার্নার বলে তখনই আগুন দেখতে পায়নি।

বার্নারের সুইচ্ বন্ধ করে মানস নন্দিতাকে ফোন করল। ততক্ষনে ড্রাইভ-ওয়েতে পুলিসের গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স এসে গেছে।

প্রায় একমাস মানস সেন্ট বার্নাস্ হসপিট্যালে বার্ন ইউনিটে ছিল। হাতটা এমনভাবে পুড়েছিল, সারতে অনেক সময় লাগল। হাসপাতালে প্রথম কয়েকদিন ওকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে রেখেছিল। আচ্ছন্নতার ঘোরে নন্দিতার কান্নাকান্না মুখ দেখে মানসের কষ্ট হত। শুভ, এষা, এরিক, ঘুম ভাঙলেই মানস ওদের একজনকে বসে থাকতে দেখত। লেবার-ডে উইক-এন্ড হাসপাতালেই কেটে গেল।

মানস বাড়ি ফেরার পর নন্দিতা দেড়মাস লিভ অফ অ্যাবসেন্স্ নিয়েছিল। ওর সেবাযত্নে মানস অভিভূত। এত বড় অকাজ করেও নন্দিতার বকুনি খেতে হয় নি।

একদিন হেমন্তের বিকেলে ওরা বাগানে বসেছিল। গাছে গাছে রং ধরে গেছে। মেপল-এর কমলা, হলুদ পাতায় শেষ বিকেলের আলো। মানসের সবজি বাগানে দুটো বিশাল কুমড়ো

বসে আছে। পাশের বাড়ির স্যান্ড্রার ছেলেরা হ্যালোউইনের জন্যে নিয়ে যাবে। কুমড়োর গায়ে চোখ মুখ কেটে, পেটের ভেতর মোমবাতি জ্বালিয়ে "জ্যাক-ও ল্যানটার্ন" বানাবে। পরের মাসে থ্যাঙ্কস গিভিং ডিনারের জন্যে মানস এযাকে একটা কুমড়ো গছিয়েছে। আহা! কী সামান্য খাটুনিতে কত ফল পেল। মানস নিজের মনে গাইছিল—"এমন মানব জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলত সোনা—বুঝলে নন্দিতা, এ জন্মে সে আবাদ আর করা হল না—"

নন্দিতা কথাটা ধরতে পারল না। বলল—"জীবনটা তো চলেই যাচ্ছিল। সেদিন ভগবান বাঁচিয়েছেন। বুক ফেটে পুড়ে গেলে তখন আর সেন্স থাকত না। তাও যে কী করে ঐ অবস্থায় অ্যাম্বুলেন্স ডেকেছিলে।"

নন্দিতার চোখ ছলছল করছিল। মানসের মনে হল এরই নাম মাধুরী। আর তখনই নন্দিতা বলে উঠল— "তোমার দিদি একবার ফোনও করল না। বুলুটাও কি অদ্ভুত! আসলে কোনো ফিলিংই নেই । ভাইবোনের এরকম সম্পর্ক, আমরা ভাবতেই পারি না—"

"বাদ দাও নন্দিতা। এসব কথা আর তুলো না।"

নন্দিতা তর্ক করল—"কেন? তুলবো না কেন? তুমি সবসময় ওদের ডিফেন্ড করো--"

মানস হাত তুলে বলল—"মাধুরী অন্য কথা বলো।"

নন্দিতা অবাক—"মাধুরী? এ আবার কোন কবিতার লাইন?"

মানস ভারী অনুপ্রাণিত হয়ে বলল—" মাধুরী, হারিয়ে যেও না।"

দুটো কাঠবেড়ালি ওদের ঘাড় উঁচু করে দেখছিল।

পূর্ণ অপূর্ণ

এয়ারপোর্টে যাওয়ার ঘণ্টাখানেক আগে কলকাতা থেকে ফোন এল। তখন মাঝরাত। সোহিনী হ্যান্ডব্যাগে রাখা দরকারি কাগজপত্রগুলো দেখে নিচ্ছিল। জয় এসে কর্ডলেস্ ধরিয়ে দিল—"সমীরদার ফোন।"

সোহিনীর বিরক্ত লাগছে। সকাল থেকে এমনিতেই এত টেনশন হচ্ছে। তারমধ্যে দু' বার সমীরের ফোন এসে গেছে। এখন এতরাতে আবার কী কথা থাকতে পারে? সোহিনী ঠান্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল—"হ্যালো, আর কিছু বলার আছে? আমাদের এবার বেরোতে হবে।"

সমীর বলল—"ফ্লাইটের তো দেরি আছে। হ্যাঁ, যে জন্যে ফোন করছি। তোমাদের ফেরার ডেট্‌টা এখনো জানি না। কবে ফিরে আসছ?"

ঘরের মধ্যে মীরা এসে দাঁড়িয়েছেন। মার দৃষ্টি থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে সোহিনী উত্তর দিল—"এখনো ঠিক করিনি। হয়তো দু-তিন মাস থাকব।"

—"তার মানে? চাকরি বাকরি ছেড়ে দিচ্ছ নাকি? তোমার বেড়ানোর জন্যে রিয়ার পড়াশোনাটাও বোধহয় ইমপর্টেন্ট নয়? ওর স্কুল থেকে পারমিশন দিয়েছে?"

সোহিনী নিজের বুকের ধকধক শুনতে পাচ্ছিল। ভয়ে, উত্তেজনায় গলার স্বর কেঁপে গেল—"রিয়ার স্কুলে কথা বলে নিয়েছি। এনি ওয়ে, হয়তো আগেই ফিরে আসব। ঠিক আছে? রাখছি।"

—"এক মিনিট। রিয়াকে দাও। গুডবাই বলে দিই।"

—"ও এখনো ঘুমোচ্ছে। আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে। ফোন রাখছি।"

সোহিনী ফোন কেটে দিয়ে কিছু বলার আগেই রিয়াকে নিয়ে শ্রাবণী ঘরে ঢুকল। রিয়ার চোখে তখনো ঘুম রয়েছে। শ্রাবণী বলল—"দুধ, বিস্কুট কিচ্ছু খেল না। খালি ঢুলে পড়ছে।"

মীরা রিয়াকে কাছে টেনে নিলেন—"এত ঘুম কিসের? এবার তো তোকে প্লেনে চড়ে যেতে হবে।"

রিয়া মাথা নাড়ল—"যাবো তো। তুমি এয়ারপোর্টে যাবে না দিদা?"

—"না, সোনা। সবাইকে ভেতরে ঢুকতে দেয় না। জয়মামা তোদের পৌঁছে দেবে। আমি ভোরবেলা আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবব তুই ওখান দিয়ে উড়ে যাচ্ছিস।"

মার নিঃশব্দ কান্নায় ঘরের আবহাওয়া আরও ভারী হয়ে উঠেছে। সোহিনী মাকে জড়িয়ে ধরে বলল—"মন খারাপ করছ কেন? রিয়া ওখানে ভালোই থাকবে। আমরা কিছুদিনের মধ্যেই সেট্‌ল্ করে যাবো

—"ঠাকুর তোমাদের দেখবেন। আমার তো তাঁকে জানানো ছাড়া আর কোনো ক্ষমতা নেই।"

জয় ট্যাক্সিতে সুটকেস তোলার পর সোহিনী মাকে প্রণাম করে বাইরে এল। আকাশ

অন্ধকার। ভোরের আলো ফোটার আগে আজন্মের এই শহর ছেড়ে চলে যাবে। বাড়িটার দিকে ফিরে তাকাল। জানলায় শ্রাবণী দাঁড়িয়ে। ট্যাক্সি ছেড়ে দেওয়ার মুহূর্তে সোহিনী মাকে দেখতে পেল না। যাবার সময় যত এগিয়ে আসছে, নানা চিন্তায় মনটা বিক্ষিপ্ত লাগছে। সমীর কেন ফেরার তারিখ জানতে চাইছিল? ও কি কিছু সন্দেহ করছে? তার জের তো মার ওপরেই এসে পড়বে। হয়তো হঠাৎ করে দিল্লিতে এসে উপস্থিত হবে। মার এটাও একটা চিন্তা। শ্রাবণীও সেদিন বলল, তোমার উচিত স্টেট্স এ পৌঁছে সমীরদাকে ব্যাপারটা জানিয়ে দেওয়া। তাহলে অন্তত মাকে এসে অ্যাকিউজ করবে না।

সোহিনী নিজেও জানে ঘটনাটা বেশিদিন লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু, অন্তত কয়েকমাস সমীরকে জানানোর রিস্ক্ নেওয়া যাবে না। তারপর পরিস্থিতি বুঝে যা করার করবে। আজ এখানে যা অসম্ভব মনে হচ্ছে, হয়তো ওদেশে তার সহজ সমাধান পেয়ে যাবে। এই পজিটিভ চিন্তাগুলো কেন যে মাথায় আসে না।

ট্যাক্সিতে যেতে যেতে জয়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। রিয়া জেগে বসে আছে। ওর সামনে বেশি আলোচনা করা যায় না। জয় সেটা খেয়াল রেখেই বলল—"ব্যাপারটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও। আই উইল হ্যান্ডল্ দ্যাট।"

—"তুই তো হস্টেলে ফিরে যাবি। প্রব্লেমটা কী জানিস? আমার কন্ট্যাক্ট্ নাম্বারের জন্যে মাকে প্রেশারাইজ করবে।"

—"সেটা পেলেই বা কী? এতদূর থেকে লিগ্যাল অ্যাক্শন নেওয়া যায়?"

— "হয়তো চেষ্টা করবে। জানিনা, আর ভাবতে পারছি না।"

—"ভেবো না। মার ভগবানের ওপর ছেড়ে দাও।" জয় হেসে দিদিকে আশ্বস্ত করতে চাইল।

এয়ারপোর্টে চেক্-ইন হয়ে গেছে। ওরা সিকিওরিটির লাইনে যাওয়ার আগে জয় নীচু হয়ে রিয়াকে আদর করল—"মিস মোটু, তুই কোথায় যাচ্ছিস রে?" রিয়া লোকজনের ভিড় দেখে একটু ঘাবড়ে গেছে। জয়ের কথার উত্তর না দিয়ে পুতুল বগলে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকল। সোহিনী জয়ের পিঠে হাত রেখে বলল —"চললাম তাহলে। ভালো থাকিস।"

রিয়ার হাত ধরে যেতে যেতে চোখে খালি জল আসছে। সিকিওরিটির গেটে ঢোকার সময় শেষবার পেছন ফিরে দূর থেকে জয়কে দেখতে পেল। তখনো ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।

নিউইয়র্কে মিহিরদা সোনালী বৌদির বাড়িতে সোহিনী তিন-চার দিন থাকবে বলে জানিয়েছিল। পৌঁছনোর পর যখন টিচার্স প্লেসমেন্ট্ গ্রুপের মাইকেল বিজলানীকে ফোন করল, তখন শুনল অগাস্টের শেষ সপ্তাহে ক্যামডেন পৌঁছতে হবে। তার আগে ওরা হাউসিং দিতে পারবে না । কোথায় লং আয়ল্যান্ড, কত দূরে ক্যামডেন, কিছুই ওর জানা নেই। এটুকু বুঝতে পারছে ছুটির দিন ছাড়া মিহিরদার পক্ষে ওদের ক্যামডেনে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয়। নিজেই বলেছেন দিয়ে আসবেন। সেই হিসেবে শনিবার যাওয়ার কথা। কিন্তু এখন যা দাঁড়াচ্ছে, আগে গেলে থাকার জায়গা পাওয়া যাবে না। তার মানে এখানেই থাকতে হবে। কিন্তু সোনালী বৌদির যা অবস্থা, আরও ক'দিন থাকা, মানে ওঁদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা। ওঁর হাঁটুতে সার্জারি হয়েছে। তাও লাঠি নিয়ে হেঁটে হেঁটে রান্নাঘরে আসছেন। যে বাংলাদেশী মহিলা রান্না করে তাকে এটা ওটা বলে দিচ্ছেন। নিশ্চয়ই ওদের জন্যেই পর্বটা একটু বেশি হচ্ছে। ফোন রেখে

সোহিনী যখন বলল ক্যামডেনে ওকে এত আগে অ্যাপার্টমেন্ট দেবে না, সোনালী বৌদি বললেন—"তাহলে তখনই যেও। তুমি আগে যেতে চাইছিলে কেন? নিউ জার্সিতে চেনাশোনা কেউ আছে?"

—"আছে দু-একজন । তবে গিয়ে থাকার মতো চেনাশোনা নয়। আমার কলেজের বন্ধুদের একজন আছে নর্থ ক্যারোলাইনায়। আর একজন স্যানফ্রানসিস্‌কোয়। কাছাকাছি থাকলে হয়তো দেখা হত।"

— "এই তো সবে এসেছ। স্কুলে কত ছুটি থাকে। বেড়ানোর অনেক সময় পাবে।"

সোহিনী হাসল— "এখন ওসব ভাবছিই না। আগে সেট্‌ল করি। স্কুলে জয়েন করার আগে রিয়ার অ্যাডমিশনের ব্যবস্থা করতে হবে।"

সোনালী মাথা নাড়লেন— "না, না, একি তোমাদের দেশ? স্কুলে ভর্তির নামে ডোনেশন। অ্যাডমিশন টেস্টের ভড়ং! যে দুটো জিনিসে মানুষের বেসিক অধিকার, শিক্ষা আর চিকিৎসা, দুটো নিয়েই লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা চলছে।"

—"জানি, আমাদের তো সিসটেমের বিরুদ্ধে যাওয়ার ক্ষমতা নেই।"

—"কত বয়স তোমার মেয়ের?"

—"ফাইভ প্লাস। দিল্লিতে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ছিল। ক্লাস টেস্টের রিপোর্ট কার্ডগুলো নিয়ে এসেছি।"

—"কিছুই লাগবে না। পাঁচ বছর হয়েছে মানে কিন্ডারগার্টেনে যাবে। অটোম্যাটিক এনরোলমেন্ট। তার আগে হয়তো ও কতোটা ম্যাচিওর্ড, ইভ্যালুয়েট করে নেবে। দেখছি তো ইংলিশে কথাও বলছে। বাচ্চারা খুব তাড়াতাড়ি অ্যাডজাস্ট করে জানো।"

সোহিনী যেন স্বস্তি পেল—"সেটাই আশা করছি। শুধু একটাই চিন্তা। যেখানে থাকব সেখানে পাড়া প্রতিবেশী কেমন হবে। ঐ এরিয়াগুলো কেমন কিছু জানেন?"

—"ডিপেন্ড করছে তুমি কোন স্কুলে পড়াবে তার ওপর। ক্যামডেনের কিছু কিছু এলাকা ভালো নয়। তবে লোকজন কি আর বাস করছে না? আমাদের এইসব আপ স্কেল নেবারহুডেও তো চুরি, ডাকাতি শুরু হয়েছে। তোমাদের দিল্লিই কি সেফ্ ? কত কাণ্ড শুনি!"

বাগানে কুকুরের চিৎকার শুনে সোনালী জানলা দিয়ে দেখতে দেখতে বললেন—"দুটোতে কী কাণ্ড করছে! আমার পায়ের জন্যে তো বেরোতে পারছি না। রেক্‌স এখন বল খেলার লোক পেয়ে মহাখুশি! রিয়ার হুড়োহুড়িটা দ্যাখো একবার।"

সোহিনী কাচের দরজা ঠেলে পেছনের বাগানে গেল। ভরদুপুরে বাইরে রীতিমতো গরম। সোনালী একটু আগে রহিমার হাত দিয়ে রিয়াকে আইসপপ্ পাঠিয়েছিলেন । রিয়া ঠোঁট লাল করে হাতে বল নিয়ে ছুটছে আর পেছন পেছন কুকুরটা লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। রিয়া একটা ঝোপের ওধারে বল ছুঁড়ে দিয়ে লুকিয়ে পড়ল। রেকস্ সেখানে গিয়ে প্রচণ্ড ল্যাজ নাড়ছে। সোহিনীকে দেখতে পেয়ে রিয়া চিৎকার করে ডাকলো—"মা, এখানে এসো না!"

সোহিনী ততক্ষণ এক গাছের ছাওয়ায় বসে থাকলো। বাগানে রোদ পড়ে আসছে। উইলোর নুয়ে পড়া ডালে ঝিরঝিরে হাওয়ার কাঁপন। রিয়া কখন বাড়ির ভেতর চলে গেছে। সোহিনী বসে বসে মিহিরদা আর সোনালী বৌদির কথা ভাবছিল।

পরিবারে একেকজন মানুষ থাকে বটগাছের মতো। মিহিরদা সেইরকম। ওঁরা আগে কানপুরে থাকতেন। মিহিরদা একটা এঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিতে ছিলেন। পিসিমার এই মেজছেলে সারাজীবন দেশের সংসার টেনেছেন। তিন বোনের বিয়ে দেওয়া। পাগল ভাইকে মেন্টাল অ্যাসাইলামে রাখা। পিসিমার জন্যে আর্যনগরে বাড়ি করে দেওয়া। মিহিরদা এদেশে না এলে বোধহয় এত দায়িত্ব সামলাতে পারতেন না। পিসিমা বলতেন বউ ভালো না হলে, মিহির কি এতটা করতে পারত? বড় ঘরের মেয়ে। মনটাও বড়। গরীব বলে আমাকে কখনো অশ্রদ্ধা করেনি। এখন আমায় ওদের কাছে নিয়ে যেতে চায়। আমি বলে দিয়েছি, সোনালী, তোমার সোনার খাঁচায় বন্দি কোরো না মা। পিসিমা নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠতেন।

সোহিনীর মনে আছে, বাবা যখন মারা গেলেন মিহিরদা তিন হাজার টাকা পাঠিয়েছিলেন। ওর বিয়ের সময়ও পিসিমা কয়েক হাজার টাকা দিয়েছিলেন। শেষ বয়সে ওঁর বেশ স্বচ্ছলতা ছিল। সবই ছেলের জন্যে।

সোহিনী যখন আমেরিকায় আসার চেষ্টা করছিল, মা প্রথমে বাধা দিয়েছিলেন। শেষে ওর জেদ দেখে বলেছিলেন তার আগে মিহিরকে জানা। সোহিনী অত আগে কিছু জানাতে চায়নি। পুরো ব্যাপারটাই তখন অনিশ্চিত। একবার বাঙ্গালোরে গিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে। একবার দিল্লিতে ইন্টারভিউ দিচ্ছে। তারপর এজেন্সির লোকেদের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন শুনে নিরাশ হয়ে পড়ছে। আমেরিকায় টিচিং জব পেতে গেলে দেশে থাকতেই প্লেসমেন্ট গ্রুপকে তিন লাখ টাকা দিতে হবে। তারপর আমেরিকায় এসে স্কুলে জয়েন করে প্রত্যেক মাসে কমিশন দিতে হবে। সব মিলিয়ে বছরে কয়েক হাজার ডলার এজেন্সি কেটে নেবে। সোহিনী বুঝতে পারছিল একটা ব্যবসার চক্রের মধ্যে পড়ে যাবে। পাঁচ বছরের ভিসায় হয়তো অনেক রোজগার হবে। কিন্তু এখন দেশে বসে তিন-চার লাখ টাকা দেবে কোথা থেকে? মার সামান্য চাকরি। জয় সবে আই আই টিতে ভর্তি হয়েছে। শ্রাবণী এম.এস.সি পড়ছে। সোহিনীর প্রাইভেট স্কুলের চাকরির মাইনে ভালো হলেও লাখ টাকা জমানোর মতো অবস্থা নয়। ওর প্লেনভাড়া এজেন্সি থেকে দিলেও, রিয়ার প্লেনভাড়া লাগবে। ভিসা করার খরচ আছে। সমীর ঠিকমতো মেয়ের জন্য টাকা পাঠায় না। জয়েন্ট কাস্টডি না পাওয়াতে খুব রাগ। সোহিনী ওর টাকা নিতেও চায় না। মাকে বলার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। মার ভবিষ্যৎ আছে। শ্রাবণীর বিয়ে হয়নি। ধার হিসেবেও মার কাছে অত টাকা চাওয়া যায় না। সোহিনী নিরুপায় হয়ে টিচার্স প্লেসমেন্ট গ্রুপকে অসুবিধের কথা জানিয়ে দিয়েছিল। সেদিন মনে হয়েছিল জীবনের কোনো ইচ্ছে পূর্ণ হবার নয়।

"মা, ওমা, ওঠো না, মা.....আ....." রিয়ার কচি গলার ডাকাডাকিতে সোহিনীর অবেলার তন্দ্রার ঘোর ভেঙে গেল। গার্ডেন চেয়ারে আধশোওয়া হয়ে নানা ভাবনার মাঝে কখন ঘুম এসে গিয়েছিল। সোহিনী উঠে বসে সময়টা বোঝার চেষ্টা করছিল। বাগানে শেষ বিকেলের রোদ এসে পড়েছে। হাওয়ায় ভিজে ঘাসের গন্ধ। মাটি থেকে ফোয়ারার মতো জল উঠে ফুলগাছগুলোর মাথা ছাপিয়ে বড় বড় গাছের গুঁড়ি ভিজিয়ে দিচ্ছে। রিয়ার মাথায় গায়ে বিন্দু বিন্দু জল। ওকগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে হাত মুখ নেড়ে ডাকাডাকি করছিল। সোহিনী জিজ্ঞেস করল—"ক'টা বাজে রে? তুই জলে ভিজেছিস কেন?"

—"এমনি। চলো না টিভি খুলে দেবে।"

—"এতক্ষণ কী করছিলি? বউদিকে বিরক্ত করছিস না তো?"

রিয়া মাথা নাড়ল—"না, খেলা করছিলাম। ও একটা গেম দিল। ক্যান্ডি ল্যান্ড। নীচের ঐ ঘরটায় কত খেলনা মা!" একরাশ চুল হাতখোঁপায় জড়াতে জড়াতে সোহিনী ধমক দিল—"ও বলছ কেন? সোনামামি বলবে। চলো, ভেতরে যাই।"

এঁরা সন্ধের সময় রাতের খাওয়া সেরে নেন। সোহিনী বাগানের কাচের দরজা ঠেলে রান্নাঘরে গিয়ে দেখল রহিমা স্যালাড কাটছে। মাইক্রোওয়েভ থেকে ভাত ফোটার গন্ধে দিল্লির বাড়ির কথা মনে হল। ওখানে এখন কত রাত? মা কি জেগে আছে?

—"চা খাইবেন? তখন ঘুমায়ে ছিলেন দেইখা চা লইয়া ফিরা আসলাম।"

রহিমার কথায় সোহিনী হাসল—"হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

—"দ্যাশ থিকা আসলে অমন হয়। টাইমের খুব ফারাক তো। আপানারে চা দেই?"

—"দাও এক কাপ। বৌদি কোথায়?"

—"থেরাপীতে গেছেন। ছয়টায় ফিরবেন।"

—"কে নিয়ে গেল? মিহিরদা বাড়ি এসেছিলেন?"

চা করতে করতে রহিমা ঘড়ি দেখল—"দাদা এইবার আসবেন। ভাবীর থেরাপীর জন্য রাইডের ব্যবস্থা আছে।"

—"তুমি গাড়ি চালাও না?"

রহিমা ফ্রিজ থেকে খাবার-দাবার বার করতে গিয়ে ফিরে তাকাল—"শিখি নাই। বাস ধইরা আসা-যাওয়া করি। দুইটা রাস্তা পরেই বাস আসে। এ বাসায় তো রোজ আসি না। সপ্তাহে দুই দিন রান্না কইরা দিয়া যাই। এখন ভাবীর পায়ের জন্য উইক-এন্ডেও হেল্প চান।"

চা শেষ করে দোতলায় গিয়ে সোহিনী চুলটুল আঁচড়ে একটু ভদ্রস্থ হয়ে নীচে এল। রিয়া কার্টুন দেখছে। গ্যারাজে গাড়ি ঢোকার শব্দ শুনে মনে হল মিহিরদা ফিরেছেন। নাকি সোনালী বৌদিকে নামিয়ে দিয়ে গেল? একটু কি সাহায্য করা উচিত? উনি তো ক্রাচ ছাড়া হাঁটতেই পারছেন না। আসলে বাড়িটার কোন্ দিকে যে কোন্ দরজা খেয়াল থাকছে না। কাল গ্যারাজ থেকে একটা দরজা দিয়ে রান্নাঘরের ওধারে ছোট ঘরটা পেরিয়ে বাড়ি ঢুকেছিল। সোহিনী সেদিকে যাওয়ার আগেই মিহিরদা সোনালীবউদির হাত ধরে ভেতরে এলেন—"কিরে? একা একা বোর হচ্ছিস তো? সোনালীর এমন খঞ্জ অবস্থা, তোদের একদম টেক্-কেয়ার করা হচ্ছে না।"

—"আমরাই তো না জেনে শুনে চলে এসেছি। তোমাকেতো বউদিকে একা রেখে এয়ারপোর্টেও যেতে হল।"

সোনালী ক্রাচ রেখে সোফায় বসে বললেন—"লোকের জন্যে এটুকু করতেই হয়। সারাজীবন কত অচেনা লোকের জন্যে এয়ারপোর্টে গেল। ফ্র্যাংকলি স্পিকিং, আমরা দেশে গিয়ে অত সুবিধে নিই না। কিন্তু দেশের লোকেরা পুরো আমাদের ওপর ডিপেন্ড করে আমেরিকা বেড়াতে আসে।"

কথাটা খট করে সোহিনীর কানে লাগল। দেশের লোক বলতে তো ওরাই। ক'দিনের

জন্যে ওঁদের বাড়িতে এসেছে। হয়তো একটু বেশিদিন থাকতে হবে। উনি কি সে জন্যে ও মন্তব্যটা করলেন? তাহলে সকালে কেন বলছিলেন এখানেই থেকে যাও! সবটাই ভদ্রতা? হিপোক্রিসি? সোহিনীর কেমন অপমান লাগছিল।

মিহির প্রতিবাদ করলেন—"সোনালী! আমরা ডলারে দেশ বেড়াই। হোটেলে থাকি। গাড়ি রেন্ট করি। বিকজ উই ক্যান অ্যাফোর্ড দ্যাট। ভগবান আমাদের সেটুকু ক্ষমতা দিয়েছেন। কিন্তু দেশের মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির পক্ষে বিদেশে এসে সেটা সম্ভব? কিছু লোক অ্যাডভ্যানটেজ নেয় সত্যি কথা। তাহলে আত্মীয়, বন্ধুরা থাকলে লোকে বেড়াতে আসে না?"

—"মধ্যবিত্তদের কথা হচ্ছে না। সো-কল্ড বড়লোকদের অ্যাটিচিউডের কথা বলছি। এখানে থেকে ঘুরে গিয়ে তারা কেউ আমাদের কোনো সময় তাদের বাড়িতে থাকতে বলে? ক'জন গাড়ি অফার করে? এনি ওয়ে সোহিনী, তুমি যেন কিছু মাইন্ড কোরো না। আমি আমার ওয়েল্-অফ্ আত্মীয় স্বজনদের কথা বলছি।"

মিহির রসিকতার চেষ্টা করলেন—"হ্যাঁ তুই হলি আমার নিকট আত্মীয় আর মধ্যবিত্ত। ইউ হ্যাভ এভ্রি রাইট টু স্টে উইথ্ আস্।"

রান্নাঘর থেকে রহিমা এসে দাঁড়াল—"ডিনার রেডি করছি। আপনার মেয়ে তো টিভির সামনে ঘুমাইয়া পড়তেসে।"

সোনালী তাড়া দিলেন—"সোহিনী, রিয়াকে উঠিয়ে ডাইনিং রুমে নিয়ে যাও। সেই কখন লাঞ্চ করেছে। আজ আমার জন্যেই দেরি হল। চলো খেতে বসি।"

ডিনারের পরে রিয়াকে দোতলায় শুইয়ে দিয়ে সোহিনী ভাবছিল এখন একবার ক্যামডেনে ফোন করা যায় কিনা। মাইকেল বিজ্‌লানীর অফিস কি আর এতক্ষণ পর্যন্ত খোলা আছে? তাহলে হাউসিং-এর খোঁজটা নেওয়া যেত। আসলে সোনালী বউদির মনোভাব ঠিক বুঝতে পারছে না। এমনিতে ভালোই ব্যবহার। কিন্তু দেশের লোকেদের ওপর যেন খড়্গহস্ত। হয়তো অনেক কারণেই তিতিবিরক্ত। পিসি দূর থেকে আর কতটুকু বুঝেছেন। ওর নিজেরও এত সেন্‌সিটিভ হলে চলবে না। এদেশে আত্মীয় বলতে এঁরাই। তাছাড়া, ওকে তো কোনো অপ্রিয় কথা বলেননি। তবু, কয়েকদিনের মধ্যে যদি একটা ব্যবস্থা করা যায়।

সোহিনী নীচে আসার পর ক্যালিফোর্নিয়া থেকে মিহিরদার ছেলের ফোন এল। ওখানে কলেজে পড়ছে। মেয়ে পড়ে বস্টনে। সোনালী বউদির কথা শেষ হচ্ছে না দেখে ও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। রাত প্রায় ন'টা। আজ আর বিজলানীর অফিসে চেষ্টা করে লাভ নেই। তারচেয়ে মিহিরদার সঙ্গে কাজের কথাগুলো সেরে নেওয়া উচিত। ব্যাপারটা যতই পার্সোন্যাল হোক, বলতে তো হবেই। শুধু কী ভাবে শুরু করবে সেটাই ভাবছিল।

ফোন রেখে সোনালী যখন টিভির রিমোট চাইলেন, সোহিনী বলল—"আমার কয়েকটা কথা ছিল মিহিরদা। রিয়ার সামনে ডিসকাস করতে চাইনি। এখন তোমাদের একটু সময় হবে?"

—"আমাদের সময় আবার কি? যা বলতে চাস তার জন্যে অত হেজিটেট্ করছিস কেন?"

—"আসলে ব্যাপারটা খুব কমপ্লেক্স। জানো তো, সমীরের সঙ্গে আমার ডিভোর্স হয়ে গেছে। তিন বছর ধরে দিল্লিতে মার কাছে আছি।"

সোনালী জিজ্ঞেস করলেন—"ইফ্ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, তোমাদের ডিভোর্স হল কেন? তোমার এক্স্-হাসবেন্ড কি ডিভোর্স চাইল?"

—"না, আমি নিজে থেকেই চলে এসেছিলাম। তারপর ডিভোর্স স্যুট ফাইল করেছিলাম। আসলে, বিয়ের পর থেকেই প্রবলেম শুরু হয়েছিল। তখন আমার বিয়ে করার ইচ্ছে ছিল না। বাবা মারা গেলেন মাত্র একুশ বছর বয়সে। মা কলকাতায় একটা অচেনা ফ্যামিলিতে বিয়ে দিয়ে দিলেন। আমি দিল্লিতে বড় হয়েছি। নর্থ ক্যালকাটার ঐ কনাজারভেটিভ বাড়িতে ওরা এত ডমিনেট করত।"

মিহির বললেন—"তোর কি মনে হয় কনজারভেটিভ বলে ডমিনেট করত? তা কিন্তু নয়। ডমিনেট করাটা স্বভাব।"

—"জানি না। আমার বাবা মাকে তো তোমরা জানো। এত শাসন করা ঝগড়া, চেঁচামেচি, অন্যকে অপমান করে কথা বলা, বাড়িতে এ সব কখনো দেখিনি মিহিরদা। বিয়ের পরে একে বারে অন্য এন্ভায়রন্মেন্টে গিয়ে পড়লাম। বাবা নেই। মা যেটুকু পেরেছেন, খরচপত্র করে ওদের ডিম্যান্ড মিটিয়েছেন। তাও প্রতিটি জিনিস নিয়ে নিন্দে, সমালোচনা, এদিকে বিয়ের দু' বছর পরেও আমি ভাই বোনের জন্যে ক'টা টাকা পাঠাতে পারব না। ওরা কলকাতায় এলে একরাতও আমাদের বাড়িতে থাকতে পারবেনা। সমীরের মা যে কত ভাবে আমাকে কষ্ট দিয়েছেন। একবার ঝড়বৃষ্টির মধ্যে রিকশা ডাকিয়ে জয়কে আমার মাসির বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। তবু একরাত থাকতে দিলেন না। এত দুঃখ হয়েছিল।"

সোনালী জিজ্ঞেস করলেন—"তোমার এক্স্-হাজবেন্ড কেমন লোক? সে কেন প্রোটেস্ট্ করত না?"

সোহিনী ম্লান হাসল—"তার ধারণা মা কিছু অন্যায় বলে না। আমি জেদী, উদ্ধত, তাই মানিয়ে নিতে পারছি না। সে ও আমার বাবা, মার ট্রেনিং-এর দোষ। আসলে ভীষণ উইক পারসোন্যালিটি। ছোটবেলায় বাবা মারা গেছে। টোট্যালি ইনফ্লুয়েন্সড বাই হিজ মাদার। চাকরি করতে চাইলাম। সেখানেও কন্ডিশন। দিল্লিতে টাকা পাঠানো চলবে না। কী ছোট মন ভাবতে পারো?"

—"তোর মেয়ে হল কবে?"

—"ঐ অশান্তির মধ্যেই রিয়া হল। বিয়ের দু' বছর পরে। তবু সমীরের কোনো চেঞ্জ দেখলাম না। হাতে কোনো টাকা পয়সা পাই না। বাড়িতে জোর করে টিউশন দিতে শুরু করলাম। সেটাও ওদের পছন্দ হচ্ছিল না। সন্ধেবেলা নীচের বসার ঘরে বাইরের ছেলে মেয়েরা পড়তে আসছে। কত ইলেক্ট্রিক বিল দিতে হচ্ছে। রিয়ার অযত্ন হচ্ছে। রোজগারের টাকাই বা কেন সমীরকে দিচ্ছি না, এই সব নিয়ে ওর মা অশান্তি করছেন। একদিন দুজনকে পড়াচ্ছিলাম, উনি এসে ফ্যানের সুইচ্ অফ করে দিলেন। ওদের সামনে আরও কী সীন্ ক্রিয়েট করবেন ভেবে তখন কিছু বলিনি। রোজ তো পড়াই না। উইকে দু-তিনটে দিন। তাও ওঁর সহ্য হচ্ছিল না। কিন্তু আমিও আর পুট্-আপ করলাম না। তারপরেই বাড়িতে একটা বিরাট শো-ডাউন হল। মার সঙ্গে ছেলেও যোগ দিল। আমি মাকে টাকা দেওয়ার জন্যে ওদের অমতে বাড়িতে কোচিং করছি। সন্ধ্যেবেলায় সংসার দেখছি না। সমীরকে, মেয়েকে নেগলেক্ট করছি। এর ওপর ওর মাকে সেদিন অপমান করেছি। সে জন্যে ক্ষমা চাইতে হবে।"

সোনালী মন্তব্য করলেন—"টিপিক্যাল ফ্যামিলি ড্রামা! তোমার অতদিন ওয়েট করাই ভুল হয়েছিল। মানুষের নেচার কখনো বদলায়?"

—"নাঃ। আশা করাই ভুল। আসলে রিয়ার কথা ভেবে ধৈর্য ধরার চেষ্টা করতাম। ভাবতাম সমীর হয়তো গ্র্যজুয়্যালি নিজের রেসপন্‌সিবিলিটি বুঝতে শিখবে। কোথায় কী? ঐ ইন্‌সিডেন্টের পরে বুঝলাম আর ওখানে থাকা সম্ভব নয়। সমীর পরদিন অফিস চলে যেতে রিয়াকে নিয়ে ছোটমাসির বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। রিয়াকে নিয়ে চলে আসছি, তাতেও সমীরের মার কোনো রি-অ্যাক্‌শন দেখলাম না। অদ্ভুত স্বার্থপর মানুষ!"

—"তারপর থেকে তো দিল্লিতে ছিলি। সমীর মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেনি?"

—"সেও শুধু রিয়ার জন্যে। আমি রাজি হইনি। সেপারেশানের সময় দু' বার দিল্লিতে এসেছিল। আমি তখন চাকরি পেয়ে গেছি। কোনোভাবেই আর রেকন্‌সিলিয়েশন সম্ভব নয়। সেটা জানার পর সমীর কিছুদিন থ্রেট্‌ন করার চেষ্টা করল। শেষে ডিভোর্স দিতে বাধ্য হল।"

—"বাচ্চার কাস্টডি নিয়ে প্রবলেম করেনি?"

—"সমীর জয়েন্ট কাস্টডি চেয়েছিল। পায়নি। রিয়া অ্যাডাল্ট্‌ না হওয়া পর্যন্ত আমার কাছে থাকবে।"

মিহির কিছু ভাবছিলেন। সোনালী আর সোহিনীর কথার মাঝখানে হঠাৎ বললেন—"স্ট্রেঞ্জ! কোর্ট অর্ডারটা এদেশে হলে অন্য রকম হত। সমীরের কোনো ক্রিমিন্যাল রেকর্ড নেই। অন্তত তুই যা বললি, ওর এগেন্‌স্টে ডোমেস্টিক ভায়লেন্স কিংবা চাইল্ড অ্যাবিউজের কমপ্লেইন্‌ট নেই। চাকরি করে। বাড়িতে বাচ্চা দেখাশোনার জন্যে ওর মা আছে। বরং তোর পোজিসনটাই তখন ইকনমিক্যালি ততো স্টেবল্‌ ছিল না। তবু মা হিসেবে কাস্টডি পাওয়ারই কথা। কিন্তু সমীরে জয়েন্ট কাস্টডি না পাওয়ার রিজনটা কী?"

—"ও অ্যাল্‌কোহলিক। বাচ্চার দায়িত্ব নেওয়ার মতো কেপেব্‌ল্‌ নয়। ক্রিমিন্যাল রেকর্ড না থাকলেও আমাকে যা মেন্টাল টর্চার করত, পরে সেসব কথা আমার লইয়ারকে জানিয়েছিলাম। ওর মাকেও কি তোমার নর্ম্যাল, অ্যাফেকশানেট মহিলা বলে মনে হয়? ঐ রকম নিষ্ঠুর লোকের কাছে আমি একটা বাচ্চা মেয়েকে থাকতে দেবো কেন? আমার কেসটা যথেষ্ট স্ট্রং ছিল বলে সমীর কাস্টডি ফাইটে হেরে গেল।"

রাত হয়ে যাচ্ছে দেখে সোনালী মিহিরকে বললেন কুকুরটাকে বাইরে ঘুরিয়ে আনতে। সোহিনী এখনও পর্যন্ত দরকারি কথাগুলো বলে উঠতে পারেনি। কিন্তু মিহিরদা কেন বললেন, সমীরেরও জয়েন্ট কাস্টডি পাওয়ার কথা। এত কিছু শুনেও ওঁর এই মনে হল? কে জানে? পুরুষরা বোধহয় এ ভাবেই বিচার করে। অথচ এদেশে এসে এখন মিহিরদার পরামর্শই নিতে হবে।

ওঁরা শুতে যাওয়ার আগে সোহিনী সাহস করে প্রসঙ্গটা তুলল—"মার কাছে তোমাদের অ্যাড্রেস আছে। যদি সমীর জানতে চায়, মাকে কি দিতে বলব?"

মিহির বললেন—"দিতে পারিস। তবে ও কি আর এখানে খোঁজ করবে। তোর নতুন অ্যাড্রেস ওকে পরে জানিয়ে দিস।"

সোহিনী ইতস্তত করল—"এখন জানাতে চাইছিনা। ও হয়তো মাস দুয়েক খোঁজ নেবে না। তারপর কনট্যাক্ট্‌ করার চেষ্টা করবে।"

—"তো, প্রবলেমটা কী? মেয়ের খবর জানিয়ে দিবি। তোর ই-মেইল অ্যাড্রেস থাকলে কথাও বলতে হবে না। বাক্যালাপ বন্ধ রাখার ওটাই এখন বেস্ট্ উপায়!"

—"মিহিরদা, সমীর জানে না আমরা পাঁচ বছরের জন্যে চলে এসেছি। তাহলে মেয়েকে আসতে দিত না। ও এখন রিয়ার কাস্টডি না পাক, ভিজিটেশন রাইট তো আছে। ওর কনসেন্ট ছাড়া ইন্ডিয়া থেকে রিয়াকে নিয়ে বোধহয় ট্র্যাভ্ল্ করা যেতো না। লীগ্যাল ঝামেলার ভয়ে আমি বেড়াতে আসার কথা জানিয়ে ওর কনসেন্ট লেটার আনিয়েছিলাম। সমীর জানে আমরা দু-তিন মাসের মধ্যে ফিরে যাবো।"

সোনালী বললেন—"ইউ শ্যুডন্ট্ হ্যাভ ডান দ্যাট। তুমি জানিয়ে দিলেও বা কী হতো? ওরা কি পাঁচ বছরের জন্যে মেয়ের রেস্পনসিবিলিটি নিতো?"

—"তখন হয়তো জোর করে কাস্টডি চাইত। রিয়াকেই যদি না আনতে পারি, এখানে আসব কেন? আমি ইনডিপেন্ডেন্টলি থাকতে চাইছিলাম। স্টেট্স্-এ চাকরির সুযোগটা পেয়ে গেলাম....।"

সোহিনীর উদ্‌বিগ্ন মুখ দেখে মিহির আশ্বাস দিলেন—"বেশি চিন্তা করিস না। সমীর যদি আমাদের কনট্যাক্ট্ করে, তখন দেখা যাবে। তোর এগেন্স্টে লিগ্যাল অ্যাক্শন নিতে গেলেও ওর প্রচুর খরচ হবে। যে নিজের মেয়ের জন্যে রেগুলার টাকা পয়সা দেয় না, সে ইন্টারন্যাশন্যাল কেস্-এর জন্যে হাজার হাজার টাকা খরচ করবে?"

—"কে জানে? হয়তো দিল্লিতে গিয়ে মাকে হ্যারাস করবে।"

সোনালী উপদেশ দিলেন—"আগে থেকে পুলিস প্রোটেক্শানের ব্যবস্থা করতে বলো। তবে ঘুষ না দিলে আসবে না। দে সিম্পলি ডোন্ট শো-আপ্। আর দিল্লির পুলিস মানে মোটা টাকা নেবে। ওখানে ঠিকে-ঝিরাই চার-পাঁচ হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে দলে দলে ঠিকে-ঝিরা দিল্লি যাচ্ছে।"

সোহিনী হেসে ফেলল—"আপনি কী করে জানলেন?"

মিহির বাধা দিলেন—"সোনালী! অফ্ দ্য ট্র্যাক্ কথা বলো না! একটা সিরিয়াস ডিস্কাশনের মাঝখানে ঠিকে-ঝি নিয়ে রিসার্চ! হ্যাঁ, তোকে যা বলছিলাম। আগে থেকে টেনশন করিস না। কাজে জয়েন কর। সেরকম সিচুয়েশন হলে এখানে লইয়ারের অ্যাডভাইস নেওয়া যাবে।"

আগস্টের শেষ সপ্তাহে সোহিনী আর রিয়াকে মিহির ক্যামডেনে পৌঁছে দিয়ে এলেন। লং আয়ল্যান্ডে ফেরার পর সোনালী জানতে চাইলেন—"নেবারহুডটা কেমন দেখলে? স্কুল কি ওর অ্যাপার্টমেন্টের কাছাকাছি?"

মিহির বললেন—"মাইল দুয়েকের ডিসটেন্স। স্কুল থেকে এখন কার পুলের ব্যবস্থা করেছে। যতদিন না গাড়ি কিনতে পারছে, ঐভাবে চালাবে। আরো একজন ইন্ডিয়ান টিচার এসেছে। ঐ অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়েই আছে।"

—"পাড়াটা সেফ্ মনে হল? ছোট মেয়ে নিয়ে একা থাকবে। শি হারসেলফ্ ইজ কোয়াইট ইয়াং।"

মিহির হাসলেন—"ইনার সিটি স্কুলের জন্যে ইন্ডিয়া থেকে টিচার ধরে আনছে। হাইস্কুলের

ব্ল্যাক আর হিসপ্যানিক ছেলেগুলো তো সোহিনীর ডাব্‌ল সাইজ। ওকে ক্লাস ম্যানেজ করার জন্যে কাল থেকে ট্রেনিং দেবে। ও দেখলাম বেশ কনফিডেন্ট। তুমি আর ফোনে ভয়-টয় দেখিও না।''

—''দ্যাখো, নিজেই শেষপর্যন্ত টিকে থাকতে পারে কিনা। সেদিন কাগজে পড়ছিলাম নু-আর্কের হাইস্কুলের এক সায়েন্স টিচার কন্ট্রাক্ট ব্রেক করে ইন্ডিয়া ফিরে যেতে চাইছে। যা স্যালারি পাচ্ছে, তাতে ইন্ডিয়া থেকে ফ্যামিলি আনলে তাদের মেডিকেল ইনশিওরেন্সের প্রিমিয়াম অ্যার্ফোড করতে পারবে না। অথচ এখানে টিচাররা পুরো ফ্যমিলি ইনশিওরেন্স্ পায়।''

মিহির বললেন—''সোহিনী প্রথমে ঐ রকম একটা এজেন্সির থ্রু দিয়ে আসার চেষ্টা করেছিল। পরে ওয়াশিংটনের এক নন-প্রফিট অর্গ্যানাইজেশনের টিচার্স রিক্রুটমেন্ট প্রোগ্রামে ভিসা পেয়ে গেল। ইন্ডিয়াতে কোনো টাকা দিতে হল না। এখানে ও মাত্র দু'হাজার ডলার রিক্রুটমেন্ট ফি দেবে। তাও ইনস্টলমেন্টে। তা হলে আর অসুবিধে কী?''

সোনালী হাই তুললেন—''আমাকে তো আর এত কথা বলেনি। ভালো থাকলেই হল। চলো, অনেক ড্রাইভ করে এসেছ, শুতে চলো।''

দিল্লিতে পুজোর বাজার করতে বেরিয়ে শ্রাবণী ভাবছিল এবার কার জন্যে আর কি কেনার আছে? দিদি নেই, রিয়া নেই। তবু মা কেনাকাটা করতে পাঠালেন। শ্রাবণী তখনো দোকানে ঢোকেনি। ব্যাগে সেল্ ফোন বাজল। ও বাইরে দাঁড়িয়ে ফোন ধরতেই মীরার গলা শুনল—''বনি, তুই কোথায়?''

শ্রাবণী ভয় পেয়ে গেল—''কেন মা? কী হল? শরীর খারাপ লাগছে?''

—''না, শরীর ঠিক আছে। তোর কি দেরি হবে?''

—''কেন বলো তো? আমি এখনো দোকানে ঢুকিনি। কী হয়েছে তোমার?''

—''কলকাতা থেকে সমীর ফোন করেছিল। ওদের খবর চাইছে। ফোন নম্বর দিতে বলছে। আমি কী করি বল্ তো?''

শ্রাবণী জিজ্ঞেস করল—''তুমি কী বললে?''

মীরা উত্তর দিলেন—''তখন পুজো করতে বসেছিলাম। সেটা বলতে সমীর বলল একঘন্টা পরে আবার ফোন করবে। তুই তারমধ্যে ফিরে আসতে পারবি? যা বলার তুই ওকে বলিস।''

—''ঠিক আছে। আমি চলে আসছি। এর মধ্যে ফোন এলে তুমি রিসিভ কোরো না।''

শ্রাবণী সারাপথ মনে মনে সংলাপ তৈরি করছিল। একদিন যে এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে, সে কথা ভেবেই ও সোহিনীকে আমেরিকা থেকে জানিয়ে দিতে বলেছিল। আজ দু' মাসের ওপর ওরা চলে গেছে, এখনও সমীরদাকে জানায়নি। সেদিনও ফোনে কথা হতে দিদি বলল, ওকে বলেছিলাম তো দু-তিন মাস পরে ফিরব। ঠিক আছে, যদি এর মধ্যে খোঁজ করে, আমার ই-মেইল অ্যাড্রেস না দিলেই বা কী? দিদিরা ফিরছে না বলে সমীরের কাছে মার কোনো কৈফিয়ত দেওয়ার প্রশ্ন নেই। মা এখন আর ওর শাশুড়ি নয়। শ্রাবণী এরকমই কিছু কথা ভেবে নিয়ে আশ্বস্ত হল। বাড়ি ফিরে দেখল মা রান্নাঘরে রুটি সেঁকছেন।

—''কী ব্যাপার? তুমি রুটি করছ। বিজয়া আসেনি?''

মীরাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে। এক মুহূর্তে চেয়ে থেকে বললেন—"এসেছিল। অন্য কাজ সেরে চলে গেছে। বেশিক্ষণ থাকলে সমীরের ফোন এলে আমাদের সব কথা শুনত। বাঙালি কাজের লোক রাখলে এই মুশকিল।"

শ্রাবণী রেগে উঠল—"কী আবার শুনত? তোমার সারাক্ষণ শুধু ভয় আর চিন্তা! রীজন্ তো সেই একটাই। আজ যদি আবার ফোন আসে, দেখো আমি কিভাবে হ্যান্ড্‌ল করি। একদম টেনশন কোরো না।"

বসার ঘরে ফোন বাজছে। মীরা চমকে উঠলেন—" ঐ বোধহয় সমীরের ফোন এল।"

শ্রাবণী রিসিভার তোলার পর ওপাশ থেকে সমীরের কথা ভেসে এল—"হ্যালো! কে বনি? আমি সমীরদা বলছি। কী খবর তোমাদের?"

শ্রাবণী নিস্পৃহ ভঙ্গিতে উত্তর দিল—"ভালোই আছি। আপনি মাকে ফোন করেছিলেন?"

—"হ্যাঁ। রিয়ার খবর নেওয়ার জন্যে। পৌঁছনোর পর তো একটা ফোনও পেলাম না। ওরা ফিরছে কবে? তোমাদের কোন্ দাদার কাছে গেছে, তার নম্বরটা দাও তো।"

—"দিদিরা ইমিডিয়েট্‌লি ফিরছে না। কবে ফিরবে তাও জানি না। রিয়ার পড়াশোনার জন্যে ভাববেন না। ওখানে স্কুলে অ্যাডমিশন পেয়ে গেছে।"

সমীরের গলার আওয়াজ চড়ে যাচ্ছে—"তার মানে? সোহিনী কবে ফিরবে তোমরা জানো না? ওর মতলবটা কী বলো তো? কোন্ সাহসে মেয়েকে নিয়ে এতদিন বসে আছে? তুমি ওদের ফোন নম্বরটা দাও।"

শ্রাবণী বলল—"সেটা দেওয়া যাবে না। দিদি বারণ করেছে। যা জানানোর দিদি নিজেই আপনাকে জানাবে। আপনি প্লিজ্ আমাদের আর ফোন করবেন না।"

রিসিভার রাখা মাত্র আবার বেজে উঠল। কথা বলতে গিয়ে শ্রাবণী বুঝতে পারছিল শুধু রিয়ার জন্যে নয়, দিদিও যে সমীরদার নাগালের বাইরে চলে গেল, ঘটনাটা ওর কাছে হেরে যাওয়ার মতো। অক্ষমতার আক্রোশে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। শ্রাবণী একবার জিজ্ঞেস করল—"আপনি ওদের নাম্বার চাইছেন কেন? আপনার কি ধারণা ভয় দেখালেই দিদি মেয়েকে নিয়ে ফিরে আসবে?"

—"না এলে আমি যাবো। রিয়াকে নিয়ে চলে আসব।"

শ্রাবণী বলল—"রিয়া আপনার সঙ্গে আসবে না। ও আপনাকে কতটুকু চেনে? এতদিন আমাদের কাছে ছিল। মেয়ের জন্যে আপনি কী করেছেন?"

সমীর ধমক দিল—"চুপ করো। আমাকে জ্ঞান দিতে এসো না। জোর করে তো কাস্টডি নিয়েছিল। টাকার দরকার ছিল তো চায়নি কেন?"

—"নিজে চাকরি করে চালাতে পেরেছিল বলে। মা আছেন বলে। আমি আর আপনার সাথে কথা বাড়াতে চাই না। এর পরেও যদি ফোন করে থ্রেটন্ করেন, আমি পুলিসে রিপোর্ট করব।"

মাঝে অনেকদিন সমীর আর যোগাযোগের চেষ্টা করেনি। পুজোর পরে আবার যেদিন ওর ফোন এল, তখন দিওয়ালির ছুটিতে জয় হস্টেল থেকে এসেছে। ও সহজে মাথা গরম করে না। ভদ্রভাবে জানিয়ে দিল রিয়ার খবরের জন্যে দিল্লিতে খোঁজ নিয়ে লাভ নেই। তারপব থেকে মীরা কিছুটা স্বস্তিতে আছেন। শুধু মাঝে মাঝে এক শূন্যতাবোধ ঘিরে ধরে। পুজো

গেল, দিওয়ালি গেল, বড়দিন গেল। বাড়িতে কোনো উৎসবের ছোঁওয়া লাগল না। রিয়ার জন্যে জয় ফুলঝুরি কিনে আনত। ক্রিসমাসের সময় সোহিনী নতুন খেলনা, কেক নিয়ে আসত। অনেক সমস্যা আর উদ্বেগের মাঝেও ছোট্ট মেয়েটার আনন্দ আর প্রাণ চাঞ্চল্যে বাড়িটা সরব হয়ে থাকত। এখন শীতের ভোরে লেপের তলায় মীরা কারো নরম শরীরের স্পর্শ পান না। চান করানোর সময় সাবান, শ্যাম্পু নিয়ে বাড়াবাড়ি নেই। জনসন ক্রিমের ছোট্ট কৌটোটা ড্রেসিং টেবিলে পড়ে আছে। আলমারির এক কোণে ছোট ছোট জামা, সোয়েটার। শিশুর অমল গন্ধ কী ক্ষণস্থায়ী! মীরার চোখে জল আসে।

ক্যামডেনের হ্যামিলটন স্ট্রিটে বসন্ত এসেছে। অ্যাপার্টমেন্টের সামনে সবুজ জমি রাতারাতি হলুদ ঘাসফুলে ছেয়ে গেল। মোড়েরমাথায় শীর্ণ চেহারার রেড মেপল গাছটা সবুজ, লালচে পাতায় ভরে যাচ্ছে। দীর্ঘ বেলার শেষে পুরোনো চার্চের চূড়ার ওপরে সূর্যাস্ত দেখা যায়। স্কুল আর ছোট্ট সংসারের কাজকর্মের পরে সোহিনীর পড়াশোনার সময় হয়। অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের ঘরে ঘরে যখন প্রায় সব আলো নিভে আসে, সোহিনী তখনো জেগে থাকে। পরের দিনের ক্লাসগুলোর জন্যে পড়ানোর প্রস্তুতি, ছাত্র ছাত্রীদের হোম-ওয়ার্ক আর টার্ম পেপারের গ্রেডিং- এর ফাঁকে ই-মেইল দেখতে বসে। প্রিনসিপ্যালের কথামতো ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কমিউনিকেশন বাড়ানোর জন্যে তাদের কাছে নিজের ই-মেইল অ্যাড্রেস দিতে হয়েছে। কখনও তাদের মায়েরা চিঠি দেয়। কখনও তারা নিজেরা বায়োলজি বুঝতে না পারলে হোম-ওয়ার্ক করতে বসে সোহিনীর সাহায্য চায়। প্রথম দু-তিন মাস ক্লাস ম্যানেজ করতে রীতিমতো অসুবিধে হত। না সোহিনী আমেরিকার কালো পাড়ার ছেলে মেয়েদের অদ্ভুত ইংরিজি উচ্চারণ বুঝতে পারে। না তারা ওর দিশি অ্যাক্সেন্ট বোঝে। ক্লাসে ওকে ডাকত মিস ডুটা। এখন ডাকে মিস্ ডাটা। নতুন জীবনে প্রতিপদে মানিয়ে নেওয়া। আজ রাতে জর্জ এলিয়টের পুরোনো উপন্যাস দ্বিতীয়বার পড়তে গিয়ে যেন নিজের কথাই মনে হচ্ছে....ইন সাচ্ এ সেটিং দ্য পাস্ট্ বিকাম্স ড্রিমি। বিকজ ইট্স সীম্বল্স হ্যাভ অল্ ভ্যানিশড। অ্যান্ড দ্য প্রেসেন্ট টু-উ ইজ ড্রীমি। বিকজ ইটস লিংক্ড্ উইথ নো মেমারিস্। তাই কী? স্মৃতি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়? সোহিনীর স্মৃতি থেকে কলকাতার ক'টা বছর মুছে যাবে? হয়তো কোনোদিন থিতিয়ে যেতো, যদি রিয়া না আসত। স্মৃতি যতই দুঃসহ হোক, সমীরকে ভুলে থাকা যত সহজ, ভুলে যাওয়া তার চেয়ে অনেক কঠিন। রিয়ার বেবী সিটার মিসেস প্যাটারসন একদিন বলেছিলেন—"শি ডাজনট্ লুক লাইক ইউ।"

সোহিনী হেসে উত্তর দিয়েছিল—"জানি। ওকে ওর বাবার মতো দেখতে। তাকে দেখতে ভালো ছিল।"

—"বেঁচে নেই?"

—"আছে। তবে আমার জীবনে নেই। মিসেস প্যাটারসন, আমি সিঙ্গল মাদার।"

তার অনেকদিন পরে মহিলা ভরসা দিয়েছিলেন—"চেহারার সাদৃশ্য থাকলেই যে স্বভাবের মিল হবে তা নয়। তোমার মেয়ে বড় হবে তোমার শিক্ষায়। আমার বিশ্বাস সেই ভ্যালু তুমি দিতে পারবে।"

—"মাঝে মাঝে খুব চিন্তা হয়। আমার নিজের লোকেরা এত দূরে থাকে। ফ্যামিলি সাপোর্ট বলে তো কিছু নেই।"

—"আমাদের গরীর কালো সমাজে সিঙ্গল মাদারের লড়াই তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। তাদের কলেজ এডুকেশন নেই। ভালো চাকরি পাওয়ার যোগ্যতা নেই। ড্রাগ ইনফেসটেড এরিয়া ছেড়ে ভদ্র পাড়ায় বাড়ি ভাড়া দিয়ে থাকার ক্ষমতা নেই। অর্ধেক ছেলেমেয়ে হাই স্কুলে ড্রপ-আউট। সেক্স, ড্রাগ্স, ভায়োলেন্স, একা মা তাদের কতদিক থেকে বাঁচাবে? সোহিনী, যাদের আত্মীয়স্বজনও গরীব তারা কে কাকে সার্পোট দেবে? মানি ইজ আ বিগ্ ফ্যাকটর।"

সোহিনী বুঝেছিল উনি কী বলতে চাইছেন। হয়তো টিচার হিসেবে আমেরিকানদের মতো মাইনে পাচ্ছে না। তবু অনেক সিকিওরিটি আছে। রিয়া ভদ্র পরিবেশে বড় হচ্ছে। ওদের স্কুলের সময় আলাদা। সোহিনী সকালে ওকে পাশের রাস্তায় মিসেস প্যাটারসনের বাড়িতে রেখে হাইস্কুলে চলে যায়। মহিলার রেফারেন্সও স্কুলের এক টিচার দিয়েছিলেন। উনি ন'টার সময় রিয়াকে এলিমেন্টারি স্কুলে পৌঁছে দেন। সাড়ে তিনটের সময় নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। সোহিনীকে স্কুল ছুটির পরে মাঝে মাঝে ঘণ্টাখানেক থাকতে হয়। ফেরার সময় রিয়াকে তুলে আনে। কখনেও টিচার্স কনফারেন্সে স্কুল ছুটি থাকলে রিয়া সারাদিন ওঁর কাছে থাকে। জ্বরজারি হলেও উনি ভরসা। তবে প্রথম প্রথম রিয়া খুব কান্নাকাটি করত। মহিলাকে দেখে ভয় পেত। সোহিনীরও এক অচেনা কালো পরিবারে মেয়েকে রাখতে ইচ্ছে করত না। ভেতরে ভেতরে খোঁজ নিচ্ছিল, যদি কোনো ইন্ডিয়ান বেবী সীটার পাওয়া যায়। নিজের দেশের লোকের কাছে রাখাও স্বস্তিকর। তার মুখে দুটো চেনা কথা শুনলে মেয়েটার এত অসহায় লাগবে না। ওকে এরকম ইনসিকিওরিটির মধ্যে কিছুতেই রাখা যায় না। কিন্তু ধারে কাছে কোনো ভারতীয় পরিবারের খোঁজ পেল না। ওদিকে এই সব শুনে নিউইয়র্ক থেকে সোনালী বৌদি অন্য কথা বোঝালেন—"তুমি ব্ল্যাক নেবারহুডে থাকছ। ইনার-সিটি স্কুলে পড়াচ্ছ। আর যত ভয় তোমার কালো মহিলাকে? তার সঙ্গে শুধু থাকে তো তার বোন। বলছ স্কুলে টিচার রেফারেন্স দিয়েছে। তাহলে রিলাই করতে পারছ না কেন?"

সোহিনী ইতস্তত করেছিল—"আসলে ওদের আত্মীয় স্বজনের ছেলে মেয়ে থাকতে পারে। রিয়াকে যদি মারে টারে? খারাপ কথা শেখায়?"

—"তাই তুমি রেফারেন্স ছাড়াই ইন্ডিয়ান বেবী সীটার খুঁজছ? জানো বস্টনে আর এডিসনে দুটো ইন্ডিয়ান বেবী সীটার জেলে গেছে? বাচ্চাকে মেরে মেরে শেষ করত। একবছরের বাচ্চাকে দেওয়ালে এমন আছড়ে মেরেছিল যে মারা গেল। এডিসনের পাঞ্জাবী বেবী সীটারটা বাচ্চা কাঁদলে এমন মারত যে সর্বাঙ্গে কালশিটে। মা, বাবার সন্দেহ হতে পুলিসকে জানাল। তারপর হিড্‌ন ক্যামেরা বসিয়ে মহিলার কীর্তিকলাপ ধরা পড়ল।"

সোহিনী শিউরে উঠেছিল—"কী বলছেন? ছবি তোলার জন্যে ওরা এর পরেও বাচ্চাকে তার কাছে রাখল?"

—"না হলে প্রমাণ করা যেত না। ঐ দিন যেই বাচ্চটাকে তেড়ে গেছে, পুলিস বাড়িতে ঢুকে অ্যারেস্ট করল। এতবড় শয়তান যে রোজ ক্যাসেটে পাঞ্জাবী কীর্তন চালিয়ে রাখত। পাশের অ্যাপার্টমেন্টের লোকেরা যাতে কান্না শুনতে না পায়। উঃ এরা কী মানুষ?"

সোনালী বৌদির কাছে ঘটনা দুটো শুনে সোহিনী রাতে ঘুমোতে পারছিল না। দেশেও কত মেয়েরা সারাদিন কাজের লোকের ভরসায় বাচ্চা রেখে চাকরি করতে যায়। কে জানতে

পারছে তারা মারধর করে কিনা। কথা না শেখা পর্যন্ত বলতেও তো পারে না। এর চেয়ে ডে-কেয়ার সেন্টার ভালো। সেখানে কয়েকজনের চোখের সামনে থাকে। এই সব সাত-পাঁচ ভাবনার পরে রিয়াকে মিসেস প্যাটারসনের কাছেই রেখে দিল। আজ দু' বছরের ওপর হয়ে গেল উনি তো ভালোই দেখাশোনা করছেন। ওঁদের আত্মীয়স্বজন যে আসে না তা নয়। ওঁর এক ভাইপো ছেলেমেয়ে নিয়ে আসে। তাদের ভদ্র সভ্য ব্যবহার। ক্রমশ সোহিনীর কালোদের সর্ম্পকে ভয় কেটে যাচ্ছে। পাড়াটাও যে খুব গরিব, ওয়েল ফেয়ারে থাকা লোকেদের এলাকা নয়। এজেন্সি থেকে সেসব খোঁজ খবর নিয়ে অ্যাপার্টমেন্ট-এর ব্যবস্থা করেছিল। পাড়া প্রতিবেশীদের দেখে সোহিনী নিজেও কিছুটা আন্দাজ করতে পারে। ওপরতলায় একজন লোক্যাল হসপিট্যালের নার্স। তার স্বামী অটো মেক্যানিক। নীচের ফ্লোরের মহিলা কাজ করেন লাইব্রেরিতে। শনিবারে রিয়াকে নিয়ে যেদিন চিলড্রেন্‌স বুক আনতে যায় কিংবা গরমের ছুটিতে ছোটদের "স্টোরি আওয়ার"-এ নিয়ে যায়, মহিলার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়। লাইব্রেরি থেকে যখন পুরোনো বই বিলি করে দেয়, উনি রিয়ার জন্যে নিয়ে আসেন। সোহিনীর উল্টোদিকের অ্যাপার্টমেন্টে থাকে এক স্প্যানিশ ফ্যামিলি। ছেলেটা হাইস্কুলে সোহিনীর ছাত্র। বরফের দিনে ওর গাড়ি পরিষ্কার করে দেয়। দরকার-অদরকারে নেবারদের সাহায্য পাওয়া যায়। একরাতে রিয়ার প্রচণ্ড পেট ব্যথা হতে হসপিট্যাল এমার্জেন্সিতে নিয়ে গিয়েছিল। তখন নিজের গাড়ি ছিল না। বিল্ডিং-এর ইন্ডিয়ান টিচার রাঘবনের গাড়িতে গেল। হায়দ্রাবাদের ছেলে রাঘবন সোহিনীর সময়েই টিচিং প্রোগ্রামে এসেছে। ও আগে লাইসেন্স পাশ করে গাড়ি কিনল। প্রায় একবছর সোহিনী ওর সঙ্গে স্কুলে যাতায়াত করেছে। তারপর ড্রাইভিং পাশ করে একটা পুরোনো গাড়ি কিনে বাইরের কাজকর্ম নিজেই সারতে পারছে। এদেশে স্বাবলম্বী না হলে টিকে থাকা অসম্ভব।

বই পড়তে পড়তে সোহিনীর ঘুম এসে গিয়েছিল। আলো নেভানোর সঙ্গে সঙ্গে ফোন বাজল। সোহিনী ভয় পেল এত রাতে কে ফোন করছে? রিয়ার ঘুম ভেঙে যাবে ভেবে তাড়াতাড়ি রিসিভার তুলতেই জয়ের গলা—"শুয়ে পড়েছিলে? ফোন করতে দেরি হয়ে গেল।"

—"এখনও শুইনি। কোথা থেকে কথা বলছিস? মা কেমন আছে?"

জয়ের গলায় খুশির আভাস—"মা ভালো আছে। তোমাকে দুটো গুড নিউজ দিতে তাড়াতাড়ি ফোন করলাম। আমার এইচ ওয়ান বিজনেস ভিসা হয়ে গেছে। টেক্‌সাসে অস্টিনে যাচ্ছি। ডেল্ কমপিউটারে জয়েন করব।"

সোহিনী এই খবরের আশায় ছিল—"ভিসা পেয়েছিস? কনগ্র্যাচুলেশন্‌স। কবে আসছিস রে?"

—"জুনের মিডল্-এ পৌঁছব। ডি-টেইল্ পরে জানাচ্ছি। ধরো, মার সঙ্গে কথা বলো। আচ্ছা একমিনিট। তোমাকে সেকেন্ড গুড নিউজটা দিয়ে দি। জয়ের হাসি শুনে সোহিনী জিজ্ঞেস করল—"সেটা কি রে? বনির বিয়ে ঠিক হয়েছে?"

জয় তখনো হাসছে—"আর ইউ ক্রেজি? ওর বিয়ে কে ঠিক করবে? ধরো, খবরটা মার কাছে শোনো।"

মীরা প্রথমে বললেন—"জয়ও তো চলল। এখন বলছে পাঁচ-ছ' বছর। টেক্সাস তোদের ওখান থেকে অনেক দূর?"

—"বোধহয় তিন ঘণ্টার ফ্লাইট। ও এলে বছরে অন্তত একবার দেখা হবে। এসে পর্যন্ত তোমাদের দেখতে যেতেও পারছি না।"

—"ও নিয়ে আর ভেবে কী হবে? তোরা ভালো আছিস তো?"

রিয়া জেগে উঠে লিভিং রুমে এসে দাঁড়িয়েছে। সোহিনী বলল—"উঠে পড়লি। নে দিদাকে হ্যালো বলে দে।"

রিয়া ঘুম চোখে খানিক বিড়বিড় করে ফোন রেখে দিচ্ছিল। সোহিনী রিসিভার নিয়ে ওকে সোফায় শুয়ে থাকতে বলল। মাকে জিজ্ঞেস করল—"হ্যাঁ মা, জয় বলছিল কী গুড নিউজ দেবে?"

মীরা সামান্য চুপ করে থেকে উত্তর দিলেন—"সমীর বিয়ে করেছে। সুখবর না হোক, সোয়াস্তির খবর। এর পরে হয়তো মেয়ের জন্যে টানাহেঁচড়া করবে না।"

সোহিনী শুধু জিজ্ঞেস করল—"তোমরা খবর পেলে কী করে?"

—"ঝর্ণা, পল্টুরা পুরী বেড়াতে গিয়েছিল। যেখানে ওদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। সমীর নতুন বউ নিয়ে ঐ হোটেলেই উঠেছিল। ওদের সঙ্গে নাকি গল্পটল্প করেছে।"

—"ভালো তো। এখন রাখছি মা। কাল ভোরে উঠে স্কুল আছে।"

বিছানায় শুয়ে রিয়া উশখুশ করছে। সোহিনী ওর দিকে পাশ ফিরতে জিজ্ঞেস করল—"দিদা কেন মামার সঙ্গে আসবে না মা?"

—"এখন আসবে না। হয়তো নেকস্ট্ সামারে বেড়াতে আসতে পারে।"

—"দিদা আমাদের কাছে এল না কেন? এখানে ইন্ডিয়ান নেই বলে?"

—"কে বলল ইন্ডিয়ান নেই? ফিলাডেলফিয়া, নিউ জার্সিতে কত ইন্ডিয়ান আছে।"

—"বাট উই ডোন্ট নো এনিবডি। সোনামামী বলেছিল এখানে দুর্গাপুজো হয়। দিওয়ালি হয়। আমরা কেন যাই না মা?"

সোহিনী উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছিল। ইদানীং রিয়ার মনে এ সব প্রশ্ন আসছে। সত্যিই ওরা ক্যামডেনে এসে পর্যন্ত কোনো ভারতীয়র বাড়িতে যায়নি। চেনেও বা কাকে? দিল্লির চেনাশোনার সূত্র ধরে এখানে আসার পর দু' জনকে ফোন করেছিল। তারা নর্থ জার্সিতে থাকে। যেতেও বলেছিল। ও আর যোগাযোগ করে উঠতে পারেনি। তখন তো গাড়িও ছিল না। এখানে এমন জায়গায় থাকে, ভারতীয়দের দেখা মেলে না। তারা এই মাইনরিটি সমাজ থেকে অনেক দূরে। এডুকেশন আর অ্যাফ্লুয়েন্স্-এর জোরে সমাজের ওপর তলায় মানুষ। এরা ক্লাব করে। জাঁকজমক করে দুর্গাপুজো করে। কিন্তু সোহিনীরা কাউকে না চিনলে পুজো দেখতে যাবে কোথায়? গত বছর সোনালী বউদি লং আয়ল্যান্ডের পুজোয় যেতে বলেছিলেন। একে তো পুরোনো গাড়ি। তার ওপর তেলের দাম তুঙ্গে উঠেছিল। দু'দিনের জন্যে খরচ করে ট্রেনে যাওয়াও সম্ভব হল না। রিয়ার মন খারাপ হয়েছিল। দিল্লিতে যত ছোটই থাক, পুজো, দিওয়ালির কথা ভোলেনি।

সোহিনী মেয়ের পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বলল—"দেখি, এবারে তোকে নিউ জার্সির দুর্গাপুজোয় নিয়ে যাবো।

ঠজুনের শেষে গরমের ছুটি শুরু হল। সোহিনীকে তবু সামার ক্লাস নিতে হচ্ছে। মাস খানেক পরে পুরোপুরি ছুটি পাবে। রিয়া সারাদিন মিসেস প্যাটারসনের বাড়িতে থাকতে চায় না।

মিহিরদারা এসে ওকে দু' সপ্তাহের জন্যে নিয়ে গেছেন। ওঁদের ছেলে মেয়েরা বাড়িতে এলে রিয়াকে এখানে ওখানে নিয়ে যায়। ও বেশ খুশি মনে মিহিরদার গাড়িতে উঠে চলে গেছে।

রাঘবন হায়দ্রাবাদ থেকে বিয়ে করে ফিরেছে। বউ-এর চাকরি করার পারমিট নেই। বাড়িতে সময় কাটে না বলে মাঝে মাঝে সোহিনীর কাছে আসে। সেদিন ওরা সোহিনীকে ডিনার খেতে ডাকল। সোহিনী ভেবেছিল ও একাই নিমন্ত্রিত। পৌঁছে দেখল একজন কালো পুরুষ বসে আছে। রাঘবন ওদের পরিচয় করিয়ে দিল—"প্রফেসর ডেভিড রিচার্ডসন। আমার কলিগ সোহিনী দত্তা।"

দীর্ঘদেহী পুরুষ দাঁড়িয়ে উঠে হ্যান্ডশেক করল—"আলাপ করে খুশি হলাম। আমাকে ডেভ বলে ডাকতে পারো।"

সোহিনী সোফার অন্য ধারে বসল—"আমার নামের কোনো অ্যাব্রিভিয়েশন নেই। তবে মনে হয় না উচ্চারণ করা কঠিন।"

রাঘবণ ডেভ-এর গ্লাসে ওয়াইন ঢালছিল—"সোহিনী, তুমি ডেভকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছ? ও প্রথমদিন ভিজায়ালকশ্‌মী উচ্চারণ করতে যাচ্ছিল। ভিজায়া আর ওকে যুদ্ধ করতে দেয়নি।"

ওদের হাসি গল্পের মধ্যে রাঘবনের বউ বিজয়া এক প্লেট বড়া এনে টেবিলে রাখল। ডেভিডের কথা ভেবে ও বড়ায় লংকা দেয়নি শুনে ডেভিড আফশোস করল—"তাহলে আর অথেন্‌টিক ডিশের টেস্ট পাওয়া যাবে না। আমি মেক্সিক্যান রান্না, চাইনিজ, থাই সব এন্‌জয় করি। লাল, সবুজ সব লংকা খাই।"

ওয়াইনের গ্লাস হাতে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পরে সোহিনী জিজ্ঞেস করল—"হাউ অ্যাবাউট ইন্ডিয়ান ফুড?"

—"মোস্ট্‌লি নর্থ ইন্ডিয়ান রান্না খেয়েছি। আজ রাঘবন, ভিজায়া সাউথ ইন্ডিয়ান ডিনারে ডেকেছে। আশাকরি এনজয় করব।"

ডেভিডের সঙ্গে রাঘবনের কথাবার্তা থেকে বোঝা যাচ্ছিল ফিজিক্স পড়ানো ছাড়াও ওদের রুচির ক্ষেত্রে কিছু মিল আছে। সায়েন্স কনফারেন্সে ডেভিডের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পরে সোহিনীকে ও এই প্রফেসরের কথা বলেও ছিল। এখন নামটা শুনে মনে পড়ছে। বউ আসায় রাঘবনের এখন ঘোরাঘুরির সময় কমে গেছে। আগে মাঝে মাঝে প্রিন্সটনে পোয়েট্রি ফেসটিভ্যালে যেত। নাটক দেখতে যেত। ওর উৎসাহে ডেভিড এল্‌. সুব্রামনিয়ামের বেহালা শুনতে গিয়েছিল। সাউথ এশিয়ান সিনেমা সম্পর্কে ডেভিডের আগ্রহ আছে। সত্যজিৎ রায়, শ্যাম বেনেগালের ছবি-টবি দেখেছে। ডেভিড যখন এই সব নিয়ে আলোচনা করছিল, সোহিনী সেভাবে যোগ দিতে পারছিল না। আমেরিকার জ্যাজ ফেসটিভ্যালে, নিউইয়র্কের অফ্‌-ব্রডওয়ে নাটক, ট্রাইবেল ফিল্‌ম ফেস্‌টিভ্যাল, কোনো বিষয়েই ওর কথা বলার মতো অভিজ্ঞতা নেই। এই সীমাবদ্ধতা নিয়ে নিজেরই মনে নিজে খুঁতখুঁত করে। এরা এত পড়াশোনার সময় পায় কখন? সোহিনী কোনো প্রাসঙ্গিক কথা খুঁজে না পেয়ে কিচেনে বিজয়াকে সাহায্য করতে

ঢুকল। বিজয়া সাম্‌বার গরম করছিল। ওকে দেখে বলল—"আজ রিয়াকে মিস্ করছি। ও ফিরবে কবে?"

—"দু উইক থাকার কথা। যদি আসতে চায় আগেই নিয়ে আসব। আমার কাজিনের বাড়িতে খুব অ্যাটেনশন পায়। থাক কয়েকদিন। বিজয়া, খাবারগুলো কি ডাইনিং টেব্‌লে নিয়ে যাবো?"

—"ক'টা বাজলো? ডেভ আবার ফিলাডেলফিয়া যাবে।"

—"ওখানে থাকে? আমি ভাবছিলাম প্রিনস্‌টনের ওদিক থেকে এসেছে।"

—"ওদিকেই থাকে। আজ উইক-এন্ড বলে ওর মার বাড়ি যাবে।"

সোহিনী জাগ্-এ জল ভরছিল। রাঘবন কিচেনে এল।

—"ডিনার রেডি? সোহিনী, আর একটু ওয়াইন নেবে? ভিজেয়া তো নিজের গ্লাস ওঘরেই রেখে এল।"

—"ডিনারের সঙ্গে খাবো। তুমি ডেভকে টেবিলে ডাকো। সোহিনী, ঐ চেয়ারটায় বসে যাও।"

রাতে বাড়ি ফেরার সময় সোহিনী ভেবেছিল রাঘবন ওকে পাশের বিল্ডিং-এ পৌঁছোতে যাবে। পাড়ায় পর পর দুদিন ছিনতাই হয়েছে। সস্তার অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সে সিকিওরিটি গার্ড নেই। বেশি রাত হলে লবি দিয়ে একা যেতে ভয় করে। ওর বাড়ি ফিরতে এত রাত হয় না। রাঘবনের বাড়ি গেলে ও সঙ্গে এসে এলিভেটরে পৌঁছে দিয়ে যায়। আজ রাঘবনকে জুতো পরতে দেখে ডেভিড বলল ও নিজেই সোহিনীকে ঐ বিল্ডিং-এ পৌঁছে দিতে পারে। রাঘবন এক পায়ে জুতো পরে দাঁড়িয়ে আছে দেখে সোহিনী ভদ্রতা করে ডেভিডকে জিজ্ঞেস করল—"আর ইউ শিওর? তোমার দেরি হয়ে যাবে না?"

—"নট অ্যাট্ অল। আমার মা অনেকক্ষণ শুয়ে পড়েছে। আমি তোমাকে এগিয়ে দিতে পারি।"

এলিভেটরের ভেতরে দাঁড়িয়ে ডেভিড বলল—"আজ মনে হচ্ছে তুমি বেশ বোর হয়েছ। যখন কিচেনে চলে গেলে, তখনই বুঝেছি। জানি, একেক সময় কনভারসেশনগুলো বোরিং হয়ে যায়।

আমার ছ'তলার বোতাম টিপে দিয়েছে। এলিভেটর আবার ওপরে উঠছে। ভেতরে আফটার-শেভ লোশন, অ্যালকোহলের মৃদু ঝাঁঝালো গন্ধ। সোহিনীর কাছাকাছি ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ডেভিড কি রসিকতা করছে? বউ ছেড়ে গেছে বলে দুঃখ নেই? ছ' তলায় কুকুর নিয়ে একটা মোটা লোক এলিভেটরে ঢুকল। বিশাল কুকুরটা সোহিনীর গায়ে কাছে আসতে ও দেওয়ালে পিঠ দিয়ে সিঁটিয়ে দাঁড়াল। লোকটা চেইন্ টেনে ধরে বোকার মতো হাসছে। ডেভিড সোহিনীর দিকে আরো সরে এসে ওকে আড়াল করল।

নীচের লবি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সোহিনী জিজ্ঞেস করল—"বউরা কেন ছেড়ে যায়, সত্যিই কি তোমরা বোঝার চেষ্টা করো?"

—"আমাকে তাহলে ভগবানের কাছে যেতে হয়। হাহ-ওয়েতে কিভাবে ওর গাড়িতে একটা ট্রাক্‌টর-ট্রেলার এসে মারল, বউ তো বলে যায়নি। বেঁচে থাকতে এত কথা বলত, যখন হসপিট্যালে গেলাম, একদম চুপ।"

সোহিনীর হাত ডেভিডকে স্পর্শ করল—"আয় অ্যাম সরি....কথাটা বুঝতে পারিনি।"

বাকি পথটুকু দুজনেই নীরব। সোহিনী নিজের বিল্ডিং-এ পৌঁছে ধন্যবাদ জানাল। ডেভিড হ্যান্ডশেকের জন্যে হাত বাড়াল—"আবার দেখা হলে আমরা অন্য গল্প করবো। রাঘবনকে কর্ণাটকি মিউজিকও বাজাতে দেবো না। দেখা হবে। গুড নাইট।"

অন্ধকার অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে সোহিনীর মনে হল ফোনের মেসেজ বাজছে। ধরার আগেই শেষ হয়ে গেল। আলো জ্বেলে মেসেজটা শুনল। সোনালী বৌদি জানিয়েছেন রিয়ার জন্যে ওঁরা রেডিও সিটি মিউজিক হলে "মেরী পপিনস্"-এর টিকিট কেটেছেন। রিয়া সামনের উইক-এন্ডে ফিরবে না। সোহিনী ফোন ধরেনি বলে শেষে জিজ্ঞেসা করেছেন এত রাত্তিরে তুমিই বা কোথায়? নাকি শুয়ে পড়েছ?....

এই প্রথমবার রিয়া ওখানে আছে জেনেও সোহিনী আর ফোন করল না। ও এতক্ষণ কোথায় ছিল, জানানোর কী আছে? রিয়া আনন্দে ছুটি কাটাচ্ছে সে খবর তো পেয়েই গেল।

রাতে অনেকক্ষণ ঘুম এল না। বাইরে রিম ঝিম বৃষ্টির শব্দ। আধো অন্ধকার ঘরে সোহিনী নিজের একাকীত্বের দুঃসহ ভার অনুভব করছিল। সমাজ নেই। বন্ধু নেই। ভালোবাসার মানুষের নিবিড় সান্নিধ্য নেই। রিয়ার মা আর তার স্কুলের টিচার, শুধু এই পরিচয়ের মধ্যে একত্রিশ বছরের যৌবন নিঃসঙ্গ রাত আর দিনের মধ্যে বাঁধা পড়ে।

সপ্তাহের মাঝামাঝি সামার ক্লাস শেষ হতে সোহিনী মিসেস প্যাটারসনের বাড়িতে গেল। রিয়ার রেইন্‌কোট আর লাইব্রেরি থেকে আনা দুটো গল্পের বই ওখানে পড়ে আছে। গরমের ছুটি পড়ে যেতে ওর সঙ্গে আর দেখা হয় না।

মিসেস প্যাটারসন বাড়ির সামনে বারান্দায় বসেছিলেন। সোহিনীকে দেখে খুশি হলেন—"এসো। রিয়া কোথায়? লাইব্রেরিতে রেখে এলে?"

ছোট্ট বারান্দায় প্ল্যাস্টিকের দুটো চেয়ার। সোহিনী হাতের ব্যাগ নামিয়ে রেখে চেয়ারে বসল—"রিয়া গেছে লং আয়ল্যান্ডে। আমার কাজিনের বাড়িতে। নেক্‌স্ট উইক এন্ডে ফিরবে। তারমধ্যে আমার সামার ক্লাস শেষ হয়ে যাবে।"

—"ভালো। সামারে এন্‌জয় করছে। তোমার ভাই টেকসাসে এসে গেছে?"

—"হ্যাঁ। অস্টিনে আছে। দেখি, যদি ছুটির মধ্যে ঘুরে আসতে পারি। দেশে যাওয়া হয় না। রিয়া ওদের খুব মিস্ করে।"

—"স্বাভাবিক। তোমার সমস্যাগুলো এতটুকু মেয়ে তো বুঝতে পারে না।" মহিলা বাড়ির ভেতরে গিয়ে সোহিনীর জন্যে কফি আর নিজের তৈরী ব্রাউনি নিয়ে এলেন। রিয়ার জন্যেও ফয়েলে মুড়ে রেখেছেন।

সোহিনী জিজ্ঞেস করল—"তোমার বোনকে দেখছি না। তার হাউসক্লিনিং বিজনেস কেমন চলছে?"

—"ভগবানের দয়ায় ব্যবসা ভালোই হচ্ছে। আমাদের মধ্যবিত্ত শহরে ক'জন আর বাড়িতে ক্লিনিং লেডি রাখে? জেনী দুটো অফিস বিল্ডিং আর সিনিয়র সিটিজেন হোমে রেগুলার কন্ট্র্যাক্ট পায়। এ বছর একটা হোটেলে কাজ পেয়েছে। তিনজন কিনিং লেডি দিয়ে এতদিন ম্যানেজ করছিল। এখন একজনকে হায়ার করেছে।"

—"উনি একা এই ব্যবসা দাঁড় করিয়েছেন শুনে ভালো লাগে। ছেলে মেয়েরা সাহায্য করে না?"

—"ওরা চাকরি করে। জেনী চায়ও না। এটা কি ইয়াং ছেলে মেয়েদের কাজ? কত সময় জেনীকেও তো অফিস বিল্ডিং পরিষ্কার করতে হয়। উপায় কী? ওর স্বামী স্কুল কাস্টডিয়ান ছিল। পারকিন্‌সন্‌স-এ এমন অবস্থা হল যে, তাকে দেখাশোনা করতে গেলে জেনীর ক্লিনিং বিজনেস বন্ধ করতে হয়। ছেলেটা তখন কলেজে। পড়ার খরচ চালাবে কী করে। মেয়ের বিয়ের পরে জেনী বাড়ি বিক্রি করে আমার কাছে চলে এল।

সোহিনী চলে আসার সময় মিসেস প্যাটারসন জিজ্ঞেস করলেন—"মেয়ে তো নেই। তুমি আজ সন্ধেবেলায় কী করছ?"

—"কিছুই করার নেই। টিভি দেখে, বই পড়ে শুয়ে পড়ব।"

—"তোমাকে একটা প্রশ্ন করব? খুব ব্যক্তিগত মনে হলে উত্তর দিও না।"

সোহিনী যেন প্রশ্নটা অনুমান করতে পারল—"আমি কাউকে ডেট্ করছি কিনা?"

—"হ্যাঁ। মাঝে মাঝে কথাটা ভাবি। ইউ আর সো ইয়াং। তুমি নিশ্চয় এভাবে জীবন কাটাতে চাওনা?"

সোহিনী দ্বিধগ্রস্ত হল—"জানিনা। রিয়ার জন্যে এখন নিজের কথা ভাবার সময় পাইনা।"

—"রিয়া যখন বড় হয়ে যাবে, তখন তোমার পাশে কে থাকবে? এখনও কি তোমার একা লাগেনা?"

সোহিনী মৃদু হাসল—"একা লাগলেও কি কাউকে খুঁজে পাবো?"

সোহিনী রসিকতা করছে ভেবে মহিলা বললেন—"আমার অনেক বয়স হল সোহিনী। অভিজ্ঞতা থেকে বুঝি তুমি মেয়ের কথা ভেবে নিজের সঙ্গে প্রতারণা করছ। ডিসিশন নিতে যত দেরি করবে, অনেক সময় চলে যাবে। লাইফ্ ইজ টু-উ শর্ট।"

—"কি ডিসিশন নেবো? আমার একজন কমপ্যানিয়ন দরকার বলে ইন্টারনেটে যাবো? তুমি যা বলছ, আমি নিজেও কি সে কথা বুঝি না? যদি কখনও তেমন একজন কম্‌প্যাশনেট মানুষের সঙ্গে দেখা হয়..."

ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই মিসেস প্যাটারসনের মুখে প্রসন্নতার আভাস দেখা দিল—"আ অ্যাম শিওর, ইউ আর গোইং টু ফাইন্ড দ্য রাইট পার্সন।"

অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে অবধি কথাটা কানে বাজছে। মিসেস প্যাটারসন জানেন না সোহিনীর এই রুটিন জীবনযাপনে প্রেম ভালোবাসার অবকাশ নেই। শাদী ডট কম্-এ বিজ্ঞাপন দিয়ে বর খোঁজার ইচ্ছে নেই। নিজের কমিউনিটির সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। কমপ্যাশনেট মানুষটা কি আকাশ থেকে এসে পড়বে? সোহিনীর হাসি পেল।

এমন একটা চাকরি নিয়েছে যেন স্বেচ্ছানির্বাসন। এদিকে লাইফে কতগুলো বসন্ত, বর্ষা পার হয়ে গেল। হিন্দি ছবির জীনত আমনের সেই গানটার মতো। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে নায়িকা গাইছে—দো টাকিয়োঁ কে নোকরীমে মেরী লাখোঁ কা সাওন যায়ে.....

এই সব ভাবতে ভাবতে সোহিনী যখন ই-মেইল্ দেখতে বসেছে রাঘবনের ফোন এল—"তুমি ফ্রাই-ডে নাইটে আছো? না, রিয়াকে আনতে যাচ্ছো?"

—"রিয়া তারপরে আসছে। ওরা পৌঁছে দিয়ে যাবে। কেন, তোমরা আসবে? চলে এসো।"

—"না, সেদিন ডেভিড আমাদের ডিনারে ডেকেছে। তোমাকে ইনভাইট করতে চাইছে। ফোন নাম্বার দেওয়ার আগে তোমাকে জিজ্ঞেস করে নিচ্ছি।"

সোহিনী কয়েক মুহূর্ত পরে উত্তর দিল—"এক সন্ধের আলাপে ডিনারে ডাকছে? হয়তো তোমাদের জন্যে ভদ্রতা করছে। অ্যাক্সেপ্ট করব কিনা ভেবে দেখি।"

—"দ্যাট্স্ ইয়োর ডিসিশন। তবে আমাদের কম্প্যানি দেওয়ার জন্যে তোমায় ডাকছে বলে মনে হয় না। এনি ওয়ে, নাম্বার কি দেবো? তারপর তুমি যা ডিসাইড করবে জানিয়ে দিও।"

সোহিনী উত্তর দেওয়ার আগেই ওদিকে বিজয়ার গলা শোনা গেল—"কী-হল? তুমি যাবে না নাকি? তাহলে আমি বেশ বোর হবো। শুধু সোওল্ মিউজিক আর স্যাক্সোফোন শুনতে হবে। ডেভিড আবার নিজেও বাজায়। সঙ্গে তো আর এক সঙ্গীত বিশারদ চলেছে। তুমি গেলে আমরা নিজেদের মধ্যে গল্প করতে পারি।"

সোহিনী হেসে ফেলল—"তাহলে তুমিই কি ডেভিডকে আমাকে ইনভাইট করতে বলেছ?"

—"সোহিনী প্লিজ চলো। রাঘবনকে তাহলে তোমার নাম্বারটা দিয়ে দিতে বলি?"

সোহিনী আর না বলতে পারল না। কালো মানুষের বাড়িতে গেলে যে তাদের নিজস্ব গান বাজনা, রীদ্‌ম, ব্লুজ্ শোনায়, বিজয়ার কি সেটাই বোর হওয়ার কারণ? নাকি, গৃহিনী বিহীন বাড়িতে যেতে ইচ্ছে করে না? তাহলে সোহিনীর বাড়িতেও রাঘবনের আসার আগ্রহ না থাকতে পারে। মনে তো হয় না। বিয়ের আগেও রাঘবন ফোন করে চলে আসত। হতে পারে রাঘবন আর ডেভিড মিলে শুধু নিজেদের প্রিয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করে যায়। সোহিনী নিজেও তো সেদিন বিশেষ কথা খুঁজে পায়নি। তাহলে অন্তত বিজয়াকে সঙ্গ দেওয়ার জন্যে যাওয়া যাক।

কিছুক্ষণ ডেভিডের ফোনের অপেক্ষায় থেকে সোহিনী দিল্লির নম্বরে ফোন করল। শ্রাবণী সকাল ন'টায় অফিসে বেরিয়ে যায়। তারপর মা রওনা হয়। দেরী হলে কাউকে ধরা যায় না। শ্রাবণীর সঙ্গে বছর খানেক হল এক ডাক্তারের দেখাশোনা চলছে। হরিয়ানায় বাড়ি। দিল্লিতে প্র্যাকটিস করে। শ্রাবণীকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। শ্রাবণী এখনো কথা দেয়নি। মার ইচ্ছে সোহিনী যদি ওকে একটু বোঝায়। এতদূরে থেকে সোহিনী কী বোঝাবে? বিয়ে অনেক বড় কমিটমেন্ট। তার আগে পরস্পরকে যতটুকু বুঝে নেওয়া যায়। যদিও এক ছাদের নীচে বাস না করলে মানুষকে চেনা কঠিন। সেদিক থেকে লীভ-টুগেদারের যুক্তি আছে। সোয়েটারের উল্টো পিটের অমসৃণ অসঙ্গতির মতো মানুষের জীবন যাপনের অসতর্ক মুহূর্তগুলো ধরা পড়ে। তারপর তুমি তোমার মন বুঝে নাও। শ্রাবণী একটু সময় নিক। ত্রিশ বছরও বয়স হয়নি। ভালো চাকরি করছে। ওর বিয়ের জন্যে মা এত অস্থির হচ্ছেন কেন?

আজ সোহিনীকে অবাক করে শ্রাবণী জানাল—"যদি ডিসেম্বরে বিয়ে করি আসতে পারবে? যদিও আমাদের দিক থেকে কোনো রিলিজিয়াস বা সোশ্যাল সেরিমনি হবে না। তবু, তুমি না থাকলে—"

—"কনগ্র্যাচুশেনস্ বনি! শুনে খুশি হলাম রে। কিন্তু কোনো সেরিমনি হবে না কেন? এটা নিশ্চয়ই তোর আইড়িয়া?"

—"হ্যাঁ, আমি সব কথা বলে নিয়েছি। রেজিস্ট্রির পরে অভিষেকের বাড়ি থেকে একটা রিসেপ্শন দেবে। ইন দ্যাট সেন্স, দে আর ভেরি অ্যাকমোডেটিভ।"

—"মাও তাই মেনে নিলেন? তুই কি খরচপত্রের কথা ভেবে ফ্যামিলিকে রিলিফ্ দিতে চাইছিস? তার কোনো দরকার নেই বনি। আমরা এখন অনেকটাই অ্যাফোর্ড করতে পারি।"

শ্রাবণী বাধা দিল—"তা নয় দিদি। আসলে আজকাল বিয়ের নামে এখানে তিনদিন ধরে এতরকম ইভেন্ট চলে, দেখেই টায়ার্ড হয়ে যাই। দিল্লীতে বাঙালিরাও এখন মেহেন্দি, সংগীত সব শুরু করেছে। হাউ মেনী ডেজ ক্যান ইউ অ্যাফোর্ড ফর দ্যাট্। মা প্রথমে রাজি হচ্ছিলেন না। এখন মেনে নিয়েছেন। যাই হোক, তোমরা আসবে তো?"

সোহিনী কয়েক মুহূর্ত থেমে থাকার পর উত্তর দিল—"ডিসেম্বরে এখানে খুব বেশী দিন ছুটি পাওয়াও শক্ত। জয় কী বলছে? এত তাড়াতাড়ি ছুটি নিতে পারবে?"

—"বলছে তো চলে আসবে। দিদি, প্লিজ চেষ্টা করো। তোমরা আসছ জানলে রেজিস্ট্রেশনের ডেট ঠিক করব।"

—"দেখি কী করি? তোর বিয়েতে থাকবো না ভাবতেই পারছি না। কিন্তু একটা ভয় যে থেকেই গেছে বনি"

শ্রাবণী ক্ষুব্ধ হল—"সে জন্যে তুমি কোনোদিন দেশে ফিরবে না? মাকে দেখতে আসবে না? দিদি, তুমি নিজেকে ডিপ্রাইভ করছ। আমাদেরও কষ্ট দিচ্ছ। সমীরদা রিয়ার খোঁজও নেয় না। চলে এসো। কতদিন ভয়ে ভয়ে থাকবে?"

সোহিনী বলল—"সবই বুঝি রে। এমনিও তো তিন বছরের মধ্যে ফিরে যেতে হবে। তার আগে জয় চলে এল। মাকেও নেকস্ট্ ইয়ারে টুরিস্ট ভিসায় নিয়ে আসবে বলছিল।"

শ্রাবণীর কথায় প্রচ্ছন্ন অভিমান—"শুধু আমাকেই তোমার আর দেখতে ইচ্ছে করে না। রিয়া তো বোধহয় ভুলেই গেছে।"

সোহিনী বলল—"ভুল বুঝিস না বনি। আমাদের সিচুয়েশনটা জেনেও যদি অভিমান করিস, খুব কষ্ট পাব। দেখি, হয়তো যাবো। আগে রিজার্ভেশনের খবর-টবর নিই।"

শ্রাবণীকে আশা দিলেও সোহিনীর মন স্থির করতে সময় লাগল। ট্র্যাভেল এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করার আগে নানা কথা ভাবছিল। দশ দিনের জন্যে যাওয়া যেতেই পারে। স্কুল থেকে তার বেশি ছুটি দেবে না। প্লেনের টিকিট ক্রেডিট কার্ডে কেটে নেবে। খরচের জন্যে সেরকম চিন্তা নেই। শুধু একটাই দুর্ভাবনা। ওরা দেশে আছে খবর পেলে সমীর যদি ল-ইয়ারের চিঠি টিঠি দিয়ে মেয়েকে আটকে দেওয়ার চেষ্টা করে। সোহিনী এ ব্যাপারে মিহিরদার সঙ্গে কথা বলবে। ও, রিয়া কেউ আমেরিকার সিটিজেন নয় যে, সেরকম ঝামেলায় পড়লে দিল্লিতে এম্ব্যাসীর কাছে কোনো সাহায্য পাবে। সোহিনী ভেবে দেখছিল, ডিভোর্সের সময় কাগজপত্রে ঠিক কী শর্ত ছিল। আঠার বছর না হওয়া পর্যন্ত রিয়াকে নিয়ে দেশের বাইরে চলে আসা যাবে না? চাকরি সূত্রে আমেরিকায় রয়েছে। মেয়ে যখন ওর দায়িত্বে আছে, মার সঙ্গেই

তার থাকার কথা। মিহিরদার সঙ্গে আলোচনা করে দেখতে হবে। দেশের আইন-কানুন ঠিকমতো না জানলেও খবর নিয়ে নেবেন।

পরের দিন সন্ধে নাগাদ ডেভিড যখন ওর বাড়িতে যাওয়ার জন্যে নেমন্তন্ন করল, সোহিনী ততক্ষণে উইক-এন্ডে লং আয়াল্যান্ডে যাওয়া ঠিক করে ফেলেছে। ডেভিড যেন অবাক হল—"তুমি ডেট্‌টা খালি রাখনি? রাঘবন যে বলল তোমার সঙ্গে কথা হয়েছে। ঐ দিন তুমি ফ্রী আছো?"

সোহিনী যেন মনে পড়ার ভান করল—"রাইট। রাঘবন বলেছিল। কিন্তু তুমি তো কন্ট্যাক্ট্ করোনি। ভাবলাম হয়তো ঐদিন আমাদের ডাকছ না। কিংবা আমাকে বলছো না।"

—"সেজন্যে অন্য প্রোগ্রাম নিয়ে নিলে? আমি তোমার ফোন নাম্বার হারিয়ে ফেলেছিলাম। এইমাত্র রাঘবনকে ফোন করে...."

সোহিনী হেসে উঠল—"দ্যাট্‌স্ ও.কে.। আমি কিছু মনে করিনি। আসলে মেয়েকে খুব মিস্ করছি।"

ডেভিড একটু নিরাশ হল—"তাহলে তো আর রিকোয়েস্ট করা যায় না। তুমি কি ফ্রাই-ডে নাইটে চলে যাচ্ছো?"

—"না। শনিবার সকালে ট্রেন ধরব।"

—"তাহলে আগের রাতে আমার বাড়িতে আসতে অসুবিধে কী?"

—"অনেক রাত হয়ে যাবে ডেভিড। পরদিন ভোরে উঠে বেরোনো। রাঘবনদের সঙ্গে গিয়ে আমি তো ওদের তাড়া দিতে পারি না।"

—"তুমি কখন বাড়ি ফিরতে চাও বলো। আমি তোমাকে পৌঁছে দেবো। বেশি রাত হবে না।"

সোহিনী রসিকতা করল—"তুমি হোস্ট্! ওদের বসিয়ে রেখে আমাকে পৌঁছে দিতে আসবে? তার দরকার হবে না। ওদের সঙ্গেই ফিরব। তবে দেরি করব না।"

—"থ্যাংক্ ইউ সোহিনী। তাহলে শুক্রবার দেখা হচ্ছে।"

গাড়িতে ডেভিডের বাড়ি প্রায় আধঘণ্টার পথ। ট্র্যাফিকের ভিড়ে অনেক সময় লাগল। সোহিনীরা ওর ড্রাইভ-ওয়েতে নেমে দেখল ডেভিড দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে। বিজয়াকে আল্‌গা ভাবে জড়িয়ে গালে গাল রেখে বলল—"হাই ভিজেয়া! কেমন আছো? এসো, তোমরা ভেতরে এসো।"

সোহিনীদের একই ভাবে জড়িয়ে ধরে গালে গাল ছুঁইয়ে ডেভিড একই আতিথেয়তার পুনরাবৃত্তি করল। ভেতরে ডেকে নিয়ে বলল—"এসো। অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছি।"

গলার স্বরে কী যে ছিল সোহিনী ওর দিকে চেয়ে থাকল। সুঠাম দীর্ঘ শরীর। গভীর কালো চোখে আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ। সোহিনী দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে ভদ্রতার প্রত্যুত্তর দিল—"সরি! আমাদের খুব দেরি হয়ে গেল। শুক্রবার সন্ধেয় এত ট্র্যাফিক পেলাম...."

রাঘবন সোফায় বসে পড়েছে—"একে ফ্রাইডে ইভনিং-এর জ্যাম্, তার ওপর, জায়গায় জায়গায় কন্‌স্ট্রাকশন। আজ অনেক বেশি সময় লাগল।"

—"ঠিক আছে। এবার রিল্যাক্স্ করো। কী ড্রিংক নেবে বলো।"

বিজয়া বাথরুমে যাবার সময় সোহিনীকে ডেকে ফ্যামিলি রুমের টেবিলে রাখা ছবিটা দেখাল। একটি কালো মেয়ে বিয়ের সাদা পোশাক পরে ফুলের তোড়া হাতে দাঁড়িয়ে আছে। পিয়ানোর ওপর আর একটি ছবিতে সেই তরুণীর পাশে ডেভিড দাঁড়িয়ে। বিজয়া বলল—"দ্যাখো, কিই বা বয়স ছিল। তখন বোধহয় আর্লি থার্টিস্। নিজে গেল। সঙ্গে বাচ্চাটাও শেষ।"

—"গাড়িতে বাচ্চাও ছিল? সেদিন ডেভিড শুধু ওর বউ-এর কথা বলেছিল।"

—"ওর বউ তখন প্রেগনেন্ট। অ্যাডভ্যান্সড স্টেজ। অ্যাকসিডেন্টের পরে সার্জারি করে বাচ্চাকে বের করেছিল। বউয়ের পাশেই নাকি তার ছোট্ট কবর আছে।"

ফ্যামিলি রুমের ভেতর দিয়ে ডেভিড কিচেনে আসছে দেখে ওরা চুপ করে গেল। ডেভিড জিজ্ঞেস করল—"কী হল? তোমরা লিভিং রুমে এসো। আমি ফ্রিজ থেকে আইস্ নিয়ে আসছি।"

সোহিনীরা বসার ঘরে ফিরে আসার পরেও বিজয়া ফিসফিস করে চলেছে—"এত বড় বাড়িতে লোকটা একা থাকে। বউ মারা গেছে প্রায় পাঁচ বছর। বিয়ে করছে না কেন কে জানে?"

রাঘবন ওর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে দেখে বিজয়া চট্ করে কথা ঘুরিয়ে নিল। ডেভিড প্লেটে করে চীজ, ক্রাকার, অ্যাভাক্যাডোর পেস্ট্, সান-ড্রায়েড টোম্যাটো এনে রেখেছে। রাঘবন এটা-ওটা খেতে খেতে বলে উঠল—"ডেভিড, আমাদের ভিসা বোধ হয় আর রিনিউ করা যাবে না। বোধহয় ইন্ডিয়াতেই ফিরে যেতে হবে।"

সোহিনী বলল—" আমিও তাই শুনছি। অথচ আগে বলেছিল পাঁচ বছর পড়ানোর পর গ্রীন কার্ডের জন্যে অ্যাপ্লাই করতে পারব।"

ডেভিড বলল—"সবই হচ্ছে ইক্নমিক সিচুয়েশনের জন্যে। ওয়াল স্ট্রিটের লোকেদের চাকরি নেই। তারা অন্য প্রফেশনে ঢুকছে। যাদের ছাত্র জীবনে অ্যাকাউন্টিং বা ম্যাথ মেজর ছিল, তারা বেশির ভাগ গিয়েছিল এম. বি. এ. পড়তে। ফাইন্যানশিয়াল ওয়ার্ল্ডের অত রোজগার ছেড়ে তারা টিচিং প্রফেশনে আসবে কেন? যার জন্যে ম্যাথ টিচারের শর্টেজ হচ্ছিল। সায়েন্সের ভালো ছাত্রছাত্রীরা যাচ্ছিল রিসার্চে, বড় ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির চাকরিতে। স্কুলে সায়েন্স্ টিচারের শর্টেজ হচ্ছিল। তখন তোমাদের আনার দরকার হল। তাই নিয়ে এল।"

রাঘবন বলল—"এখন আমাদের জায়গায় যারা আসবে, তাদের তো পড়ানোর এক্সপেরিয়েন্সই নেই। এম.বি.এ. তো কী?"

ডেভিড বলল—"তারা ভালো ছাত্র ছিল। একটা ফেডারেল প্রোগ্রাম থেকে তাদের তিন মাসের টিচিং কোর্স দিচ্ছে। বাজারের অবস্থা দেখে অর্ধেক মাইনে পাবে জেনেও অনেকে স্কুলে চাকরি নিচ্ছে।"

ড্রিংক-এর মাত্রা ছাড়ালে রাঘবন একটু বেসামাল হয়ে পড়ে। হঠাৎ সোহিনীকে বলতে শুরু করল—"তুমি এদেশে থাকতে চাও? দেন্ গেট ম্যারেড। ইউ.এস. সিটিজেন বর হলে এক বছরে গ্রীনকার্ড পেয়ে যাবে। আমার তো সে আশা নেই। বিজয়া অলরেডি ঘাড়ে চেপে বসে গেছে।"

বিজয়া ধমক দিল—"এত ড্রিংক করছ কেন? ডেভিড, আই ডোন্ট লাইক দিস। ওকে ড্রাইভ করে বাড়ি ফিরতে হবে।"

সোহিনীও প্রচন্ড বিরক্ত—"না, গাড়ি আমি চালাব। ওকে স্টিয়ারিং ধরতে দিলে পুলিসের হাতে পড়ব"।

ডেভিড রাঘবনকে আর ড্রিংক করতে দিল না। টেবিলে খাবার দিতে দিতে বলল—"চিন্তা কোরো না বিজয়া। সেরকম হলে তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসব। কাল ট্রেনে করে এসে রাঘবন গাড়ি নিয়ে যাবে।"

সোহিনী মাথা নাড়ল—"ডোন্ট বদার। আমি ড্রাইভ করব। এদিকটা ভালো চিনি না। তুমি এখান থেকে হাইওয়ে ধরার ডিরেকশন দিয়ে দিও।"

খেতে বসে রাঘবন বলল—"সোহিনী, তুমি এমন কথা বলছ, যেন আমি এরিয়াটা চিনি না। আমার ওপর ভরসা না থাকলে তুমি চালিও। আমি ডিরেকশন দেবো।"

বিজয়া বলে উঠল—"হ্যাঁ, সোহিনী ড্রাইভ করুক। আমরা তোমার হাতে অ্যাকসিডেন্টে মরতে চাই না।"

সোহিনীর মনে হল বিজয়া না ভেবে চিন্তে এরকম রসিকতা করল কেন? রাঘবন মনযোগ দিয়ে খেতে শুরু করেছিল। হঠাৎ মুখ তুলে বলল—"ভিজেয়া তুমি থামবে? কন্‌স্ট্যান্ট কথা বলে যাচ্ছ।"

বিজয়ার বোধহয় খেয়াল হয়েছে। রাঘবনের সঙ্গে তর্ক না করে প্লেটের ওপর খাবার নাড়াচাড়া করছিল। ডেভিড ওর দিকে একটা ডিশ এগিয়ে দিল—"এখন খাওয়ার সময় ঝগড়া কোরো না। ইন্‌ডায়জেশন হবে। হাউ ইজ দ্য ফুড?"

সোহিনী নিজে থেকেই প্রশংসা করল—"গ্রেট! তুমি এত ভালো রান্না কর।"

ডেভিড আমেরিকার দক্ষিণ অঞ্চলের লুইসিয়ানার কালোদের নিজস্ব রান্না জাম্বালায়া করেছিল। চিংড়ি, হ্যাম সসেজ দিয়ে ফ্রায়েড রাইসের সঙ্গে ঝাল মশলা দিয়ে সামান্য পোড়া পোড়া চেহারা কেজান্‌ফ। সোহিনীর কথায় ডেভিডের গলায় উচ্ছ্বাস ফিরে এল—"থ্যাংকস্ ফর দ্য কম্‌প্লিমেন্ট। এ সব আমাদের সাউথ-ওয়েস্ট অ্যালাবামা আর সাউথ-ইস্ট মিসিসিপির ক্রস্ কালচারের রান্না। যদি একদিন আমার মার বাড়িতে যাও, খুশি হয়ে রান্না করে খাওয়াবেন। ট্যাব্যাসকো সস্ দিয়ে মা যা জাম্বালায়া করেন, আমি তো প্যাক্ করে নিয়ে আসি।"

খাওয়ার আলোচনার শেষে সে রাতে আর বেশি দেরি করার সময় ছিল না। সোহিনী ওঠার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছিল। একে এতখানি পথ নিজে চালিয়ে ফিরতে হবে। ওদের দিকের পাড়াগুলো মোটামুটি নিরাপদ হলেও পথে হাই-ক্রাইম এরিয়া পড়ে। ভুল রাস্তায় ঢুকে পড়লে মুশকিল। তার ওপর কাল সকালে উঠে ট্রেন ধরা। সোহিনী রাঘবনকে তাড়া দিয়ে সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল—"থ্যাঙ্ক ইউ ডেভিড। সন্ধেটা ভালো কাটল। আতিথেয়তা আর ডিনার খাওয়ানোর জন্যে ধন্যবাদ।"

ডেভিড সুন্দর ভঙ্গিতে হাসল—"ধন্যবাদ তো আমার দেওয়ার কথা। শর্ট নোটিসে চলে এলে। আমারও সময়টা ভালো কাটল। দেখা হবে।"

গাড়ি চালানোর সময় কথাটা তুলবে ভেবেও সোহিনী চুপ করে থাকল। বিজয়া নিজেই

শুরু করল—"আমার খেয়াল ছিল না ডেভিডের বউ গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। তবে ও-ও নিশ্চয়ই বুঝেছে...."

সোহিনী হাই-ওয়ের সাইন দেখতে দেখতে ডানদিকে এক্সিট নিলো। রাঘবন বলল—"লেফ্‌ট লেনে থাকো।"

বিজয়ার কথার সূত্র ধরে সোহিনী উত্তর দিল—"কিছু করার নেই। সব সময় কি অত খেয়াল থাকে। কিন্তু রাঘবন তুমি কেন যে ঐ কথাগুলো বলছিলে? আমার এত এম্‌ব্যারাসিং লাগছিল।"

রাঘবন পাশে বসে ঢেঁকুর তুলল—"খাওয়া বেশি হয়ে গেছে। সরি, আমি আবার কী বললাম?"

—"ভিসা নিয়ে যখন কথা হচ্ছিল, কেন বললে আমেরিকায় থেকে যাওয়ার জন্যে আমাকে বিয়ে করতে হবে? প্রথমত কথাটা বেশ বাজে শোনাল। তাছাড়া ডেভিডের সামনে তুমি এমন ভাব করছিলে, যেন এদেশে থাকতে না পারলে আমাদের জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। আমার লজ্জা করছিল।"

বিজয়া পেছনের সিট থেকে সায় দিল—"হ্যাঁ আমি তো অবাক। যেন নিজে একটা আমেরিকান বিয়ে করতে পারছে না বলে বিরাট দুঃখ।"

—"আঃ তোমরা রসিকতাও বোঝো না? আমি তো মজা করছিলাম। আমরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করি না? অমুক গ্রীনকার্ডের জন্যে পয়সা দিয়ে পর্টুরিক্যান বিয়ে করল, এ সব বলি না?"

সোহিনী তর্ক করল—"অ্যামেরিকানদের সামনে বলিনা শুনলে তো, ডেভিডও বুঝিয়ে দিল ফরেন টিচারদের আর আমার দরকার নেই। আর তুমি বলে যাচ্ছ এম.বি.এ.-রা কিছু জানে না।"

—"মাস্টারীর কিছ্ছু জানে না। এটা আলাদা স্কিল। ওয়াল স্ট্রিটের বিজনেস সুট ছেড়ে যখন ক্যামডেনের স্কুলে ঢুকবে, তখন বুঝতে পারবে। কিন্তু সোহিনী, তুমি যদি বিয়ের কথায় হার্ট হয়ে থাকো, আমি সরি। আমি শিয়োর, ডেভিড মোটেই সিরিয়াসলি নেয়নি। ও নিজেই ব্ল্যাক অ্যামেরিকানদের নিয়ে কত রসিকতা করে।"

যেদিন রাতে ঘুম আসতে দেরি হয় সোহিনী বই নিয়ে জেগে থাকে। আজ সেই নিঝুম রাত। অথচ এমন নয় যে মাথায় খুব চিন্তা আছে। মিহিরদার কথার ওপর ভরসা করে লং আয়ল্যান্ড থেকে ফিরে, দিল্লির ফ্লাইট বুক করেছে। শনিবার দুপুরে রিয়া সোনালী বউদির সঙ্গে মেরী পপিন্‌স্ দেখে আসার পর রবিবার সোহিনীর সঙ্গে ফিরে এল। দীর্ঘ গ্রীষ্মের ছুটিতে মেয়েকে একটু ব্যস্ত রাখা দরকার। কমিউনিটি পুলে রিয়াকে সাঁতারে ভর্তি করেছে। একদিন ওকে নিয়ে ছোটদের খেলার রাজ্য "সেসেমী প্লেস্"-এ সারাদিন কাটিয়ে এল। সেখানে টিভির প্রোগ্রাম সেসেমী স্ট্রিটের বড় বড় মাপেট্‌দের গান বাজনা, কাণ্ডকারখানা দেখে রিয়া খুব খুশি। এবার একদিন ওকে নিয়ে পেনসিলভানিয়ার "চকলেটের শহর" হার্শি পার্কে যাবে। সোহিনীর সারাদিনের এরকম অভিযানে বিজয়াও সঙ্গে থাকে। ইচ্ছে ছিল অগাস্টে একবার টেক্‌সাসে জয়ের কাছে যাবে। দেশে যাওয়ার খরচের কথা ভেবে আপাতত আর ডোমেস্টিক ফ্লাইটেব টিকিট কাটতে চাইছে না। জয় বুঝতে পারলে হয়তো নিজেই টিকিট পাঠিয়ে দেবে। ওদের

আই.টির চাকরিতে যা রোজগার সোহিনী তার ধারে কাছেও পৌঁছোতে পারবে না। ভালো! ভাইটা মানুষ হয়ে গেল। বাবার কথা মাঝে মাঝে মনে হয়। যদি বেঁচে থাকতেন সোহিনীকে নিশ্চয়ই অত তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে চাইতেন না। ওর জীবন অন্যরকম হত। কে জানে! সবই বোধহয় ডেস্‌টিনি।

হঠাৎ খেয়াল হল ডেভিডের ই-মেইল্‌-এর উত্তর দেওয়া হয়নি। প্রিন্সটনের কবিতা উৎসবে ডেভিডের বন্ধু কালো কবি ইউসেফ কমিউনিয়্যাকা আসছেন। পুলিৎজার আওয়ার্ড পাওয়া কবি এখন নিউইয়র্কে পড়ান। ডেভিড লিখেছে ঐ উৎসবে কলকাতার দুজন তরুণ বাঙালি কবি থাকবেন। সোহিনীকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে। অথচ রাঘবনদের কিছু জানায়নি। বাঙালি কবিদের জন্যেই কি সোহিনীকে ডেকেছে? দুটো নামই সোহিনীর কাছে অপরিচিত। দিল্লিতে বড় হয়ে বাঙালী নভেলিস্ট্‌দের লেখা যাও বা কিছু কিছু পড়েছে, কবিতা-টবিতা পড়া হয়নি। তাহলেও যাওয়া যেতে পারে। অন্তত একজন পুলিৎজার পুরস্কার পাওয়া কবিকে দেখে আসবে।

সোহিনী ডেভিডকে- ই-মেইল্‌-এ জানাল—"তোমার ইনভিটেশন নিলাম। সেদিন কখন আমাকে পিক্‌ আপ করবে জানিয়ে দিও। ফিরতে কত রাত হবে তাও জানিয়ে দিও। বেবী সীটারকে তাহলে আমার অ্যাপার্টমেন্টে আসতে বলব। উইথ্‌ রিগার্ডস্‌ সোহিনী।"

ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ে সোহিনী যখন জেগে উঠল, দেখল রিয়া গুটিশুটি মেরে শুয়ে আছে।

সোহিনী কফি মেশিনে জল দিয়ে লিভিং রুমে এসে টিভি খুলল। ব্যারাক ওবামার গত সপ্তাহের "স্টেট অফ দ্যা ইউনিয়ন" মেসেজের পুনরাবৃত্তি চলছে। সাদা কালো মানুষ নির্বিশেষে তাঁর জনপ্রিয়তা এখন তুঙ্গে। টিভিতে, খবরের কাগজে জনসমীক্ষা বলছে, দেশের লোকের তাঁর সম্পর্কে বিরাট প্রত্যাশা। ভোটের রেজাল্টের পরদিন মিসেস প্যাটারসন কেঁদেছিলেন—"জীবনের এই দিনটা দেখার জন্যে বেঁচেছিলাম।" সোহিনীদের স্কুলে সেদিন কী উত্তেজনা। ও নিজে এদেশের সাদা, কালো, ইমিগ্র্যান্ট সমাজের কেউ নয়। তবু আমেরিকার ইতিহাসের এক উজ্জ্বল দিনের সাক্ষী হয়ে থাকল।

টিভির পর্দায় ওবামার মুখ মিলিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে সোহিনী আবার সেই সাদৃশ্য খুঁজল। গভীর দৃষ্টি, দৃঢ় সন্নিবদ্ধ দুই ঠোঁট, কঠিন চিবুক, কথা বলার শান্ত, সংযত ভঙ্গি। কোথায় যেন ডেভিডের সঙ্গে মিল খুঁজে পায়। নাকি দৃষ্টিবিভ্রম? সদ্য পরিচিত এক কালো মানুষের ওপর জনপ্রিয় দেশনেতা ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে চাইছে? কেন? কার এনহ্যান্সমেন্টের জন্যে? সোহিনীর মন প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত হল।

কবিতা উৎসবে যাওয়ার দিন সকাল থেকে রিয়া বায়না ধরল ও মিসেস প্যাটারসনের কাছে থাকবে না। সোহিনী বিজয়াদের কিছু জানায়নি। এখন শেষ মুহূর্তে বেবী সীটিং-এর জন্যে বলা যায় না। সোহিনী প্রথমে মেয়েকে বোঝানোর চেষ্টা কর। অবাধ্যতা করছে দেখে রাগ হল—"কেন? মিসেস প্যাটারসন তোমার কাছে এসে থাকলে কী প্রব্‌লেম? তোমাকে সারাদিন নিয়ে ঘুরছি। বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছি। আজ সন্ধেবেলায় আমি একটা প্রোগ্রামে যাবো। সেখানেও তোমাকে যেতে হবে?"

রিয়া কোমর জড়িয়ে ধরল—"নিয়ে চলো না মা?"

—"না। ওখানে ছোটদের কোনো প্রোগ্রাম নেই। শুধু বড়রা ইনভাইটেড। অনেক রাত্তিরে শেষ হবে। তুমি জেগে থাকতে পারবে না।"

রিয়া কাঁধ ঝাঁকালো—"তাহলে সোনামামীর বাড়িতে দিয়ে এসো। ওখানে থাকব।"

সোহিনীর ধৈর্য্য চলে যাচ্ছে—"লং আয়ল্যান্ড কতদূরে তুমি জানো? যেতে কত সময় লাগে দ্যাখোনি? আর ওখানেই বা কী আছে? তোমার কোনো বন্ধু আছে?"

রিয়া কাঁদতে শুরু করল—"এখানেও তো তুমি কারুর সঙ্গে খেলতে দাও না। সোনামামীদের বাড়িতে টিভিতে ইন্ডিয়ান প্রোগ্র্যাম হয়। ইন্ডিয়ান আইড বুগি উগি, রাভন্। আমরা রোজ দেখতাম। আমাদের ঐ চ্যানেলগুলো নেই কেন?"

সোহিনীর উত্তর খুঁজতে দেরি হল। সত্যিই ও রিয়াকে পাড়ায় খেলতে যেতে দেয় না। স্কুলে পড়ছে পড়ুক। কি অ্যাপার্টমেন্টের দুটো-একটা মেয়ে বাড়িতে খেলতে আসে। ঠিক আছে। তাবলে, পাড়ার কালো ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পার্কে ছেড়ে দেবে না। নিজে সঙ্গে থাকতে পারে বলে গার্লস স্কাউটে ভর্তি করেছে। তবু পাড়ায় খেলার সঙ্গী নেই। বাড়িতে ভাই বোন নেই। সেদিক থেকে মেয়েটা সত্যিই খুব একা।

সোহিনী রিয়ার জলে ভেজা গাল মুছে দিয়ে বললে—"ঐ চ্যানেলগুলো তুই দেখবি কখন? স্কুল খুললে রোজ সন্ধে বেলায় হোম ওয়ার্ক থাকবে। তুই তো তারপরেই ঘুমিয়ে পড়িস।"

রিয়া আশ্বাস দিল—"আমার আজকাল বেশি ঘুম পায় না। সোনামামীর বাড়িতে টেন থার্টি, ইলেভেন্ অবধি টিভি দেখেছি।"

সোহিনী বলল—"একেবারে স্পয়েল্ট হয়ে এসেছ! তুমি জানো স্কুল খুললে ন'টার মধ্যে ঘুমোতে হবে। ঠিক আছে। জি-টিভির ব্যাপারটা ভেবে দেখব।"

প্রিন্সটনে যাওয়ার পথে ডেভিড বলল—"ওখানে পোয়েট্রি রীডিং-এর পরে ডিনার-রিসেপ্শন আছে। তোমাকে বলেছিলাম কি?"

সোহিনী বুঝল আরও রাত হবে। এত পিছুটান নিয়ে কোথাও যাওয়ার মানে হয় না। সকাল থেকে রিয়া এমন শুরু করল, সোহিনী ভালো করে সেজেগুজে আসারও সময় পেল না। বাঙালী কবিরা আসছে শুনে একবার ভেবেছিল শাড়ি পরবে। চাকরির বাইরে কোনো জগৎ নেই। শাড়ি-টাড়িও পরা হয় না। শেষ পর্যন্ত চুড়িদার কামিজ পরে নিল। সঙ্গে কস্টিউম জুয়েলারি। গাড়িতে ওঠার সময় দরজা খুলে দিয়ে ডেভিড বলল—'ইউ লুক গর্জিয়াস্। তোমাকে ইন্ডিয়ান পোশাকে আগে দেখিনি।"

সোহিনী হাসল—"দেখেছ তো মাত্র দু'দিন! আজ ইন্ডিয়ান পোয়েটরা থাকবেন ভেবে দেশের পোশাক পরলাম।"

—"শুধু পোয়েট্রা নয়, তোমাদের কমিউনিটি থেকেও লোকজন আসবে। ইওসেফের কয়েক জন ইন্ডিয়ান বন্ধু আছে। তাদের সঙ্গে গত বছর ক্যালক্যাটা বুক ফেয়ারে গিয়েছিল। তোমার বাড়িও কি ক্যালকাটায়?"

—" না, আমি দিল্লিতে বড় হয়েছি। বিয়ের পরে ক' বছর ক্যালক্যাটায় ছিলাম। দ্যাট ওয়াজ আ ডিফিকাল্ট টাইম। ঐ সময়টা মনে রাখতে চাই না।"

ডেভিড সোহিনীর হাতের ওপর মৃদু চাপ দিল—"ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু। জীবনে এখনও দীর্ঘপথ বাকি আছে।"

একসময় সোহিনী নীরবতা ভাঙলে—"আমাদের ফ্যামিলিতে একটা ভালো খবর আছে। আমার বোন বিয়ে করছে। আমরা ডিসেম্বরে ইন্ডিয়া যাচ্ছি।"

ডেভিড উৎসাহ দেখাল—"তাই? ভালো, খুব ভালো। তোমার একটা ব্রেক্ হবে। তাহলে এবার ক্রিসমাসে থাকছ না?"

—"না। ঐ সময় ছাড়া ছুটি কোথায়?"

ব্রিজ থেকে নেমে শহরে ঢোকার মুখে ডেভিড জিজ্ঞেস করল—"তোমাদের টিচার্স্ ভিসা রিনিউয়্যালের কিছু খবর পেলে?"

—"এজেন্সি বলছে, তার চান্স্ খুব কম। না হলে দু' বছর বাদে ফিরে যাবো।"

ডেভিড হাসল—"তারমানে রাঘবনের সাজেশনটা কনসিডার করছ না?"

—"মানে?"

—"বিয়ের জন্যে কোনো আমেরিকানকে তোমার পছন্দ নয়?"

সোহিনী হেসে ফেলল—"অ্যাজ ইফ্ সাম্‌বডি ইজ রেডি উইথ্ এ রিং?"

ডেভিড গাড়ি পার্ক করার পর সকৌতুকে চেয়ে থেকে বলল—"ইউ নেভার নো!"

মুহূর্তের জন্যে সোহিনী শরীরে এক তীব্র উন্মাদনা অনুভব করল। বুকের ভেতর নিঃশ্বাস উথাল পাথাল। ডেভিড তখনো চেয়ে আছে। দীর্ঘ কালো চোখে গভীর আশ্বাসের ছায়া। সোহিনীকে কাছে টেনে ঠোঁটের ওপর ঠোঁট রাখল।

প্রিন্সটনের কবিতা উৎসবে ডেভিডের বন্ধুদের সঙ্গে সোহিনীর পরিচয় হল। ছোট আসরে সাদা, কালো, চীনে, ভারতীয় সব সমাজের লোকই আছে। আদিবাসী আমেরিকার মহিলা কবিও এসেছেন। টী-শার্ট আর জীন্‌স পরা কালো কবি ইওসেফের সঙ্গে আলাপ হতে সোহিনীর হাত ধরে হেসে বললেন—"তোমার কথা ডেভ-এর কাছে ইদানীং শুনছি। আলাপ করে খুশি হলাম।"

সাধারণ সৌজন্যতা। তবু এত বিখ্যাত একজন কবির এমন ঘরোয়া ব্যবহার। সোহিনী কবিতা শোনার আগেই অভিভূত হল। যদিও আজ ওর কোনো কিছুতে মন লাগছে না। বাঙালি কবি দুজন তাঁদের বাংলা কবিতার সঙ্গে ইংরাজী অনুবাদ পড়ছিলেন। দাড়িওলা কবির মণিপুরের মেয়েদের প্রতিবাদ বিষয়ে কবিতাটা ওকে নাড়া দিল। হয়তো পুরোনো কবিতা। ওর সঙ্গে আর বাংলা গল্প কবিতার যোগ কোথায়? অথচ এখানে এই সব জগৎ আছে। ডেভিড এই মিশ্র পরিমণ্ডলে আসে। ভারতীয়দের অনুষ্ঠানে যায়। এখনই কার কাছে শাহিদ পারভেজের সেতারের প্রোগ্রামের খোঁজ নিচ্ছিল। সোহিনী যেতে চায় কিনা জিজ্ঞেস করছিল। কালো অধ্যাপকের সামাজিক জীবনটা তবে ওর কাছে একান্ত অপরিচিত নয়?

এক অদ্ভুত মানসিক অস্থিরতায় সারা সন্ধে কেটে গেল। সোহিনী মাঝে একবার রিয়ার খোঁজ নিল। ডিভিডি-তে "হ্যারী পটার" দেখে শুয়ে পড়েছে। মিসেস প্যাটারসন বললেন—"আজ বেশ খুশি দেখলাম। নেকস্ট টাইম নাকি আমাকে ওর সঙ্গে বসে টিভিতে ইন্ডিয়ান নাচ, গান দেখতে হবে। তাই দেখব।"

সোহিনী বুঝল রিয়া ইন্ডিয়ান চ্যানেল না নিয়ে ছাড়বে না। উঃ সোনালী বউদি কী কালই করেছেন। নিজে তো ইন্ডিয়ার নিন্দে করেন। এদিকে রিয়াকে নিয়ে রাত জেগে বুগি উগি দেখছেন! এখন মাসে মাসে সোহিনীরই গর্চা যাবে।

ডিনারের পরে বাড়ি ফেরার পথে ব্রিজের ওপর গাড়ির মিছিল। ওরা অনেকটা পিছিয়ে পড়ল। আকাশে সন্ধে থেকে মেঘ ছিল। এদিকে অনেকক্ষণ বৃষ্টি হয়েছে। রাস্তা পিছল হওয়ায় ব্রিজের আগে গাড়ির স্পিড কমানোর জন্যে লাল আলোর সংকেত জ্বলছে। গাড়ির রেডিওতে জানাল হাই-ওয়ের ঐদিকে গাড়ি অ্যাকসিডেন্টের জন্যে বাঁ দিকে দুটো লেন্ বন্ধ। পাশ দিয়ে পুলিসের গাড়ি অ্যাম্বুলেন্স বেরিয়ে যেতে ডেভিড বলল—"বোধ হয় মেজর অ্যাক্সিডেন্ট। জায়গাটার কাছাকাছি পৌঁছোনো না পর্যন্ত কিছুই বুঝতে পারছি না।" সোহিনী উদবিগ্ন হল। কতরাতে অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছোবে। আবার সেই পিছুটান। এই হয়তো শুরু। শেষ কোথায় জানে না। কেন আজ বারবার মনে হচ্ছে ওকে এক অমোঘ প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। নিজের মন বোঝা যে কী কঠিন।

সোহিনী জানলার কাচ নামিয়ে সামনে যতদূর সম্ভব দেখার চেষ্টা করল। বৃষ্টির জলের ঝাট, হাওয়া এসে মুখ চেখে ভিজিয়ে দিল। কাচ নামিয়ে ঘুরে বসে বলল—"আজ এত বৃষ্টি হবে তুমি জানতে? আমি তো ওয়েদার রিপোর্টও শুনে বেরোইনি।"

ডেভিড উত্তর দিল না। সামনের কাচে জলের ধারা নামছে। ওয়াইপারের ক্লান্তিহীন ওঠা-পড়ার এক-ঘেয়ে শব্দ। দূরে অ্যাম্বুলেন্সের তীব্র সাইরেন। অন্ধকারে বিশ্ব চরাচর জুড়ে বিষণ্ণতা।

ডেভিড হঠাৎ বলল—"তুমি আজ বলেছিলে, ক্যালক্যাটার এপিসোডটা মনে রাখতে চাও না। আমার জীবনে তারও চেয়ে দুঃসময় গেছে সোহিনী। গভীর দুঃখের সময়। এই মুহূর্তে খুব বেশি করে মনে পড়ছে। একটা রোড অ্যাক্সিডেন্ট আমাদের প্রেম, ভালোবাসা, শান্তির সংসার, আসন্ন সন্তান, সব কেড়ে নিয়ে গেল। তুমি কি জীবনে তার চেয়েও বেশি কিছু হারিয়েছ?"

সোহিনীর দীর্ঘঃশ্বাস পড়ল—"না, তোমার মতো মৃত্যুশোক পাইনি। আমার দুঃখ ছিল। অশান্তি ছিল। প্রেম ছিল না। সেই অর্থে হারানোর যন্ত্রণা আমি পাইনি।"

গাড়ির দীর্ঘ মিছিল ধীরে ধীরে গতি নিয়েছে। ওরা অ্যাকসিডেন্টের জায়গাটা পার হয়ে গেল। ডেভিড সোহিনীর কথার উত্তরে বলল—"আমার মার কথা হয়তো তোমাকে বলেছি। তাঁর প্রগাঢ় ঈশ্বর বিশ্বাস। ঐ ঘটনার পরে আমাকে বোঝাতেন ঈশ্বর নিয়তি নন। মনে সংশয় এনো না সোহিনী! আই সী সায়েন্স অ্যান্ড রিলিজিয়ন অ্যাজ দ্য সেম্ থিং। দুটিই ঈশ্বরকে জানার জন্যে মানুষের আগ্রহের অভিপ্রকাশ। রিলিজিয়ন সেভর্স্ দ্য কোয়েশ্চেন্স্ হোয়াইল সায়েন্স সেভর্স্ দ্য কোয়েস্ট্ ফর অ্যান্সারস্। আমি মাকে বলতাম, আমি নিয়তির কথাই ভাবি। তোমার ঈশ্বরের করুণা পাওয়ার মতো ভাগ্যবান আমি নই।"

সোহিনী জিজ্ঞেস করল—"তুমি নিজে কী বিশ্বাস করো ডেভিড? ধর্ম জানো? চার্চে যাও?"

—"মাঝে মাঝে সান-ডে চার্চে যাই। ইউনিটেরিয়ান চার্চেও গেছি। হাউ অ্যাবাউট ইউ? তোমাদের ওদিকে বোধহয় কোনো টেম্পলও নেই?"

—"জানি না। হয়তো নিউ জার্সির অন্য দিকে আছে। আসলে, নিজের রুটিনের বাইরে যাওয়ার সময় পাই না। তার মানে এই নয় যে আমি এথিস্ট্। আসলে রিচুয়্যালস-এর ব্যাপারটা ফ্যামিলিতে খুব বেশি ছিল না। আমরা মার প্রেয়ারের ওপর ছেড়ে দিতাম। এখনও সেই ভরসায় চলছে।"

ডেভিড সোহিনীর হাসিতে যোগ দিল। বাড়ির কাছাকাছি এসে ডেভিড বলল—"আজ আমরা শুধু নিজেদের ব্যক্তিগত দুঃখের কথা বললাম। তোমার কি মনে হয় না, আমরা অন্য রকম একটা সন্ধেবেলা ডিজার্ভ করি?"

সোহিনী ওর ইঙ্গিতের প্রত্যুত্তর দিল না। ডেভিড নিষ্পলক চেয়ে আছে। ঠোঁট প্রত্যাশায় উন্মুখ। সোহিনী কাছে এল। দীর্ঘদিনের তৃষ্ণার্ত দেহ মনে এক আশ্চর্য উত্তপ্ত স্পর্শের শিহরণ। সোহিনী অনুভব করছিল বুকের গভীরে নিঃশব্দ কান্নাধারার মতো জল ঝরে পড়ছে। তার মনে হল, হয়তো যুদ্ধ শেষ হয়ে এল। হয়তো এখনও বাকি। তবু আমার বিধ্বস্ত অতীত, ব্যর্থ বিবাহিত জীবনের দুঃস্বপ্নের স্মৃতি, সব আমি মহাসমুদ্রের ওপারে রেখে এলাম।